www.banglainternet.com

represents

COSMOS

by

Carl Sagan

Bangla Translation by

Asad Iqbal Mamun

Pdf Part 01

banglainternet

সূচিপত্র

উপক্রমণিকা	১১
মহাজাগতিক সমুদ্রের বেলাভূমি	১৯
মহাজাগতিক সংগীতের মাঝে একটি কণ্ঠস্বর	৩৬
জগৎসমূহের ঐকতান	৫৭
স্বর্গ এবং নরক	৮৯
এক লোহিত গ্রহের জন্য নীল	১১৭
মহাজাগতিক পথিকের গল্প	১৪৭
রাত্রির শিরদাঁড়া	১৭৩
স্থান-কালে পরিভ্রমণ	২০৬
নক্ষত্রদের জীবন	২২৭
চিরন্তনের সীমা	২৫১
স্মৃতির নির্বন্ধ	২৭৭
এনসাইক্লোপিডিয়া গ্যালাক্টিকা	২৯৭
কে পৃথিবীর হয়ে কথা বলে ?	৩২১
পরিশিষ্ট-১	৩৪৭
পরিশিষ্ট-২	৩৪৯

'আমার জন্য এগুলো কী ? শুক্‌নো ডুমুর
এবং এপ্রিকট !
আমাকে উপরে তোল, এবং বাস করতে দাও
দাঁত এবং মাড়ির মাঝে !...'
ওহে পোকা, যেহেতু তুমি এই কথা বললে,
তাই, ইয়া হয়ত তোমাকে আঘাত করবে
তার হাতের প্রবল শক্তিতে !
(দন্তশূলের বিরুদ্ধে মন্ত্র)

চিকিৎসা : অনুগ্র বিয়ার ...এবং তেলকে একত্রে মেশাও ; এর উপর মন্ত্রটি পাঠ কর তিনবার এবং ঔষধটিকে লাগিয়ে দাও দাঁতে।

আমাদের পূর্বপুরুষেরা জগৎকে অনুধাবন করতে আগ্রহী ছিল কিন্তু তারা কাঙ্ক্ষিত পদ্ধতিটি দৈবাৎ পেয়ে উঠেনি। তারা একটি ক্ষুদ্র, অদ্ভুত কিন্তু আকর্ষক ও পরিপাটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকেই কল্পনা করত যেখানে প্রধান শক্তি ছিল আণু, ইয়া, এবং শামাশের মতো দেবতাবৃন্দ। সেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মানবজাতি কেন্দ্রীয় চরিত্র না হলেও, তারা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। আমরা প্রকৃতির অবশিষ্ট অংশের সাথে খুবই ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। অনুগ্র বিয়ারের মাধ্যমে চিকিৎসার বিষয়টি সৃষ্টিতত্ত্বের গভীরতম রহস্যগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট।

আজ আমরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে উপলব্ধি করার জন্য এক শক্তিশালী এবং অভিজাত পদ্ধতি আবিষ্কার করেছি, এই পদ্ধতিকে বলা হয় বিজ্ঞান ; এটি আমাদের সামনে উন্মোচিত করেছে এমন এক প্রাচীন এবং বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে যে এর সামনে মানবীয় ক্রিয়াকর্মকে প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় অতি নগণ্য। আমরা বেড়ে উঠেছি মহাবিশ্ব থেকে অনেক দূরত্বে। নৈমিত্তিক বিষয়সমূহের সাথে একে মনে হয়েছে সুদূর এবং অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু বিজ্ঞান উদ্ভাবন করেছে শুধুই এটিই নয় যে এর রয়েছে এক স্পন্দনসঞ্চারী এবং পরমানন্দদায়ক মহিমা, শুধু এটিই নয় যে এটি মানবীয় উপলব্ধির জগতে অভিগম্য, কিন্তু এটিও যে, এক অতি বাস্তব ও গভীর দৃষ্টিকোণে, আমরা নিজেরাও সেই মহাবিশ্বের অংশ বিশেষ, আমরা এটি থেকেই জাত, আমাদের নিয়তি গভীরভাবে এর সাথে জড়িত। সবচেয়ে মৌলিক মানবীয় ঘটনাসমূহ এবং সবচেয়ে অকিঞ্চিৎকর বিষয়সমূহও পিছু ফিরে যায় মহাবিশ্ব এবং এর উৎসসমূহে। এই গ্রন্থটি সেই মহাজাগতিক দৃষ্টিভঙ্গির উদ্‌ঘাটনের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত।

১৯৭৬ সনের গ্রীষ্মে, মঙ্গলগ্রহের অভিযানে, 'Viking Lander Imaging Flight Team' এর সদস্য হিসেবে আমি কাজ করেছিলাম আমার একশত বৈজ্ঞানিক সহকর্মীর সাথে। মানব জাতির ইতিহাসে আমরা প্রথমবারের মতো অন্য কোনো গ্রহে অবতরণ করালাম দুটি মহাকাশযান। এর ফলাফলসমূহ, যেগুলো

আরো বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে পঞ্চম অধ্যায়ে, ছিল অতি চমৎকার, এই অভিযানের ঐতিহাসিক তাৎপর্য ছিল সুস্পষ্ট। তবুও সাধারণ মানুষেরা এই সকল অসাধারণ ঘটনাসমূহ সম্বন্ধে কিছুই জানল না। সংবাদ মাধ্যমগুলো ছিল চরমভাবে অমনোযোগী ; অভিযানের ঘটনাটিকে টেলিভিশনও উপেক্ষা করল পুরোপুরি। যখন এটি স্পষ্ট হয়ে গেল যে, মঙ্গলগ্রহে প্রাণ আছে কিনা তার কোনো সুনির্দিষ্ট উত্তর পাওয়া আসন্ন নয়, তখন তাদের আগ্রহ আরো হ্রাস পেল। অনিশ্চয়তার ব্যাপারে তাদের সহনশীলতা ছিল যৎসামান্য। যখন আমরা উপলব্ধি করলাম যে, মঙ্গল গ্রহের আকাশটি হবে কিছুটা গোলাপি-হলুদ বর্ণের, প্রথমবার ভুলক্রমে যাকে নীল বলে উল্লেখ করা হয়েছিল, উপস্থিত রিপোর্টারগণ একে স্বাগত জানালেন ভদ্রভাষার এক অবজ্ঞাসূচক কোরাস ধ্বনির মাধ্যমে—তারা এমনকি এই অবস্থাতেও মঙ্গল গ্রহকে প্রত্যাশা করছিলেন, পৃথিবীর মতো করে। তারা বিশ্বাস করতেন যে, মঙ্গল গ্রহ যতই অধিক থেকে অধিকতরভাবে পৃথিবীর সাথে বিসদৃশ রূপে উপস্থাপিত হবে, সকলেই তত দ্রুত এর প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে। এবং তবুও, মঙ্গলের প্রাকৃতিক ভূ-দৃশ্যাবলি হতবুদ্ধি করে দেয়ার মতো, দৃশ্য পরম্পরাসমূহ শ্বাসরুদ্ধকর। আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আশাবাদী ছিলাম যে, গ্রহসমূহের অভিযানে এবং এই সম্পর্কিত অনেক বৈজ্ঞানিক বিষয়—যেমন প্রাণের উৎস, পৃথিবী, এবং মহাবিশ্ব, বহির্জাগতিক বুদ্ধি-সত্তা, মহাবিশ্বের সাথে আমাদের সম্পর্ক ইত্যাদির সাথে অস্তিত্ব জড়িয়ে রয়েছে পৃথিবীর চরম স্বার্থের। এবং আমি নিশ্চিত ছিলাম যে সেই স্বার্থটিকে প্রকাশ করা যেতে পারে সবচেয়ে শক্তিশালী গণমাধ্যম টেলিভিশনের মাধ্যমে।

আমার উপলব্ধির অংশীদার ছিলেন বি. গেন্ট্রি লি, যিনি ছিলেন 'Viking Data Analysis and Mission Planning Director'. আমরা, আমাদের সমস্যাগুলো নিয়ে কিছু একটা করার সিদ্ধান্ত নিলাম। লি প্রস্তাব করলেন যে, আমরা এমন একটি প্রোডাক্‌শন কোম্পানি গঠন করতে পারি যা বিজ্ঞানের গণ-যোগাযোগের জন্য একটি অভিগম্য ও সহজ মাধ্যম হিসেবে কাজ করতে পারবে। পরবর্তী মাসগুলোতে আমাদেরকে বেশ কয়েকটি প্রকল্পে আহ্বান জানানো হল। তবে এদের মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল লস এঞ্জেলেসের Public Broadcasting Service, KCET এর আহ্বানকৃত একটি অনুসন্ধান। শেষ পর্যন্ত, আমরা দুজনেই একটি তেরো পর্বের টেলিভিশন ধারাবাহিক তৈরি করতে রাজি হলাম, যা আবর্তিত হবে জ্যোতির্বিদ্যা নিয়ে, কিন্তু যার থাকবে অতি উচ্চ মানবিক আবেদন। এটি নির্মিত হবে সাধারণ মানুষকে উদ্দেশ্য করে, একে হতে হবে দৃষ্টিনন্দন ও সুরমূর্ছনায় অনন্য, এবং এটি যেন মন ও চিত্ত উভয়কে একত্রে গ্রন্থিত করতে পারে। আমরা কথা বললাম অব-লেখকদের সাথে, ব্যবস্থা করলাম একজন নির্বাহী প্রযোজকের এবং আমরা নিজেদেরকে আবিষ্কার করলাম 'কসমস' নামে একটি তিন বছর মেয়াদি প্রকল্পে। এই লেখাটির সময় বিশ্বব্যাপী এর দর্শক সংখ্যা ২০০ মিলিয়নের

banglainternet.com

অধিক, বা পৃথিবী নামক গ্রহটির মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৫ ভাগ। এটিকে উৎসর্গ করা হয়েছে এই বিষয়টির উদ্দেশ্যে যে, সাধারণ জনগণকে সচরাচর যতটুকু বুদ্ধিমান বলে ভাবা হয় তারা আসলে তার চাইতে অনেক বেশি বুদ্ধিমান ; কারণ প্রকৃতি এবং বিশ্বসৃষ্টি নিয়ে গভীরতম বৈজ্ঞানিক প্রশ্নসমূহ জাগিয়ে তোলে অসংখ্য মানুষের আগ্রহ ও আবেগকে। বর্তমান ক্রান্তিকালটি আমাদের সভ্যতা এবং হয়ত আমাদের প্রজাতির জন্য পথের এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোগস্থল। যে পথটিই আমরা নির্বাচন করি না কেন, আমাদের নিয়তিটি বিজ্ঞানের সাথে এক অমোঘ বন্ধনে আবদ্ধ। বিজ্ঞানকে অনুধাবন করাটা এখন আমাদের জন্য অস্তিত্বের প্রশ্নের মতোই গুরুত্বপূর্ণ। উপরন্তু, বিজ্ঞান এক আনন্দ—বিবর্তন প্রক্রিয়ায় আজ আমরা অনুধাবনের মধ্য দিয়ে পাই আনন্দ—যারা অনুধাবন করতে পারে তাদেরই টিকে থাকার সম্ভাবনা বেশি। টেলিভিশন ধারাবাহিক 'কসমস' এবং এই গ্রন্থটি বিজ্ঞানের কিছু ধারণা, পদ্ধতি ও আনন্দের সাথে সংযোগ সাধনের জন্য এক আশাবাদী পরীক্ষণকে উপস্থাপন করে।

গ্রন্থটি এবং টেলিভিশন ধারাবাহিকটি বিবর্তিত হয়েছে একই সাথে। কিছু বিশেষ বিবেচনায় এদের প্রত্যেকেই একে অপরের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু বইয়ের পাঠক এবং টেলিভিশন ধারাবাহিকের দর্শকের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে, আর বই এবং টেলিভিশনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের পদ্ধতিও ভিন্নতর। বইয়ের একটি অন্যতম গুণ হল এই যে, পাঠকের পক্ষে কোনো অস্পষ্ট বা কঠিন অংশে বারবার ফিরে আসা সম্ভব ; টেলিভিশনের পক্ষে এটি সম্ভব হতে কেবলমাত্র শুরু হয়েছে ভিডিও-টেপ এবং ভিডিও-ডিস্ক প্রযুক্তি আবির্ভাবের মাধ্যমে। টেলিভিশনের একটি অবাণিজ্যিক অনুষ্ঠানের বরাদ্দকৃত আটান্ন মিনিট ত্রিশ সেকেন্ডের চাইতে, একটি বইয়ের কোনো অধ্যায়ের কোনো বিষয়ের ব্যাপ্তি ও গভীরতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে একজন লেখকের রয়েছে অনেক বেশি স্বাধীনতা। অনেক বিষয়ে এই বইটি টেলিভিশন ধারাবাহিকের তুলনায় অনেক বেশি গভীরে প্রবেশ করতে পেরেছে। এমন অনেক বিষয় রয়েছে যেগুলো বইটিতে আলোচিত হলেও টেলিভিশনের ক্ষেত্রে সেগুলো বিবেচিত হয়নি এবং এর বিপরীত ব্যাপারটিও সত্য। উদাহরণ স্বরূপ, টেলিভিশন ধারাবাহিকে প্রদর্শিত 'কসমিক ক্যালেন্ডার' অংশটি এই গ্রন্থে স্থান পায়নি—কারণ 'কসমিক ক্যালেন্ডার' অংশটি আলোচিত হয়েছে আমার 'ড্রাগন্‌স অব ইডেন' গ্রন্থে ; একই কারণে আমি সবিস্তারে আলোচনা করিনি রবার্ট গডার্ডের জীবনী, কারণ "ব্রোকা'স ব্রেইন"-এ একটি অধ্যায় তার জন্য উৎসর্গ করা হয়েছে। কিন্তু টেলিভিশন ধারাবাহিকটির প্রতিটি পর্ব এই গ্রন্থটির সংশ্লিষ্ট প্রতিটি অধ্যায়ের প্রায় অনুরূপ ; এবং আমার ভাবতে ভালো লাগে যে, প্রতিটির আনন্দ অন্যটির উন্মেষের মাধ্যমে ত্বরান্বিত হবে। ২৫০টির অধিক সম্পূর্ণ রঙিন চিত্রের মধ্যে কেবল অল্প কিছু স্থান পেয়েছে 'কসমস'-এর হার্ডবাউন্ড এবং পেপার ব্যাক সংস্করণটিতে। কিন্তু কোনো বিশেষ বিষয়কে উপলব্ধি করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল চিত্রই সংযুক্ত করা হয়েছে।

স্পষ্টতার উদ্দেশ্যে, আমি বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে একটি ধারণা একাধিকবার অবতারণা করেছি—প্রথমবার হালকাভাবে, এবং পরবর্তী পর্যায়ে আরো গভীরভাবে। উদাহরণ স্বরূপ, এটি ঘটেছে প্রথম অধ্যায়ে মহাজাগতিক বিষয়সমূহের সূচনাতে, যেগুলো পরবর্তীতে আরো বিস্তারিতভাবে পরীক্ষিত হয়েছে ; অথবা দ্বিতীয় অধ্যায়ে মিউটেশন, এনজাইম এবং নিউক্লিক এসিডের আলোচনাতে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ধারণাসমূহকে উপস্থাপন করা হয়েছে ঐতিহাসিক ক্রম রক্ষা না করে। উদাহরণ স্বরূপ, তৃতীয় অধ্যায়ে জোহানেস কেপলারকে নিয়ে আলোচনার অনেক পরে, সপ্তম অধ্যায়ে উপস্থাপন করা হয়েছে প্রাচীন গ্রিক বৈজ্ঞানিকদের ধারণাসমূহকে। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, গ্রিকদের কৃতিত্ব সবচেয়ে ভালোভাবে উপলব্ধি করা যায় যখন আমরা দেখি, তারা কী সামান্যের জন্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছিল।

যেহেতু মানুষের প্রচেষ্টার অবশিষ্ট অংশ থেকে বিজ্ঞানকে বিচ্ছিন্ন করা অসম্ভব, তাই বেশ কিছু সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় এবং দার্শনিক বিষয়ের সাথে এর সংস্পর্শ ব্যতীত এটি নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব নয়, আর এই সংস্পর্শটি ঘটবে কখনো দ্রুত দৃষ্টি নিক্ষেপের মাধ্যমে, কখনো বা তা হবে সরাসরি। এমনকি বিজ্ঞানের উপর একটি টেলিভিশন ধারাবাহিকের চিত্রায়ণের সময়ও, সামরিক ক্রিয়াকর্মের প্রতি বিশ্বব্যাপী আগ্রহটি প্রকাশ পায় অবাঞ্ছিতরূপে।

ভাইকিং ল্যান্ডারের একটি পূর্ণ-স্কেল ভার্সনের মাধ্যমে মোহেভ মরুভূমিতে মঙ্গল গ্রহে অভিযানের সিমুলেশন সম্পন্ন করার সময়, আমরা অনবরত বিঘ্নগ্রস্ত হচ্ছিলাম যুক্তরাষ্ট্রের বিমান বাহিনী কর্তৃক, যারা তখন নিকটবর্তী এক পরীক্ষণ অঞ্চলে বোমা নিক্ষেপ করার দক্ষতার পরীক্ষা চালাচ্ছিল। মিশরের আলেকজান্দ্রিয়াতে, প্রতিদিন সকাল ৯ টা থেকে ১১ টা পর্যন্ত, আমাদের হোটেলটি ছিল মিশরের বিমানবাহিনীর বোমাবর্ষণ অনুশীলনের ক্ষেত্র। গ্রিসের স্যামোসে, কোথাও চলচ্চিত্রায়ণের অনুমতি শেষমুহূর্ত পর্যন্ত স্থগিত ছিল ন্যাটো (NATO)-এর কৌশলী পরিচালনার কারণে এবং যা স্পষ্টতই ছিল গোলন্দাজ ও ট্যাংক বাহিনীর জন্য ভূ-নিম্নস্থ ও পাহাড়-সন্নিকটবর্তী কামানস্থাপনের মঞ্চের মধ্যে একটি পথ নির্মাণের জন্য। চেকোস্লোভাকিয়াতে এক গ্রাম্যসড়কে চলচ্চিত্রায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় সরবরাহের জন্য যানবাহনে ওয়াকিটকির ব্যবহার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল চেক বিমান বাহিনীর এক যুদ্ধ বিমানকে, যা মাথার উপর চক্কর দিতে থাকল যতক্ষণ না চেকরা আশ্বস্ত হল যে এটি জাতীয় নিরাপত্তার প্রতি কোনো হুমকি সৃষ্টি করছিল না। গ্রিস, মিশর এবং চেকোস্লোভাকিয়াতে আমাদের চলচ্চিত্র কলাকুশলীদেরকে সর্বত্র নজরদারি করত রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা দলের এজেন্টবৃন্দ। রুশ নভশ্চরণ বিজ্ঞানের পথিকৃৎ কনস্টান্টিন সিলকোভস্কির জীবনের উপর এক প্রস্তাবিত আলোচনানুষ্ঠানের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের কালুগাতে চলচ্চিত্রের স্বার্থে প্রাথমিক অনুসন্ধানকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছিল—কারণ, আমরা পরে যা

banglainternet.com

জেনেছিলাম, সেখানে ভিন্নমতাবলম্বীদের বিচার সম্পন্ন হওয়ার কথা ছিল। আমাদের ভ্রমণকৃত প্রতিটি দেশেই আমাদের ক্যামেরা-কুশলীরা পরম সহমর্মিতা পেয়েছিল ; কিন্তু সর্বত্রই ছিল সামরিক উপস্থিতি, জাতিসমূহের ভিতর ছিল এক প্রচ্ছন্ন ভয়। প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে, ধারাবাহিক এবং বই উভয়টিতেই এই অভিজ্ঞতাসমূহ আমাকে আরো দৃঢ়সংকল্প করে তোলে।

বিজ্ঞান এক নিরন্তর প্রক্রিয়া। এর কোনো শেষ নেই। অর্জনযোগ্য এমন কোনো চূড়ান্ত সত্য নেই, যার জন্য সকল বিজ্ঞানীরা আজীবন ব্যাপৃত থাকবেন। এবং এই কারণে, বিশ্বটি আরো বেশি চমকপ্রদ, বিজ্ঞানীদের জন্য এবং প্রতিটি জাতির লক্ষ লক্ষ মানুষের জন্য, যারা পেশাদার বিজ্ঞানী না হয়েও বিজ্ঞানের পদ্ধতি ও অর্জনসমূহের ব্যাপারে গভীর আগ্রহ পোষণ করেন। কাজেই 'কসমস' গ্রন্থটিতে এমন সামান্য কিছুই আছে যেগুলো এর প্রথম প্রকাশের পর থেকে বাতিল হয়ে গেছে, এরপর অর্জিত হয়েছে নূতন আরো অনেক কিছু।

ভয়েজার ১ এবং ২ মহাকাশযান প্রবেশ করেছে শনিগ্রহের ব্যবস্থায় এবং উন্মোচিত করেছে এই গ্রহ সম্বন্ধে অনেক বিস্ময়, এর জটিল বলয় ব্যবস্থা, এবং এর প্রচুর সংখ্যক উপগ্রহ। হয়ত এদের মধ্যে সবচেয়ে চমকপ্রদ হল 'টাইটান', এখন জানা গেছে যে, যার বায়ুমণ্ডল অনেকটা পৃথিবীর আদি অবস্থার মতো, জটিল জৈব অণুতে তৈরি এক ঘন কুয়াশার স্তর, এবং সম্ভবত, তরল হাইড্রোকার্বনের এক পৃষ্ঠীয় সমুদ্র। নবীন নক্ষত্রসমূহের চারপাশের ভগ্নাবশেষের বলয়গুলোর উপর সম্প্রতি চালানো হয়েছে বেশকিছু পর্যবেক্ষণ। সম্ভবত এই বলয়সমূহ ঘনীভূত হয়ে নূতন গ্রহমণ্ডলে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াতে রয়েছে, এবং এটি থেকে মনে হয় যে, 'মিল্কি ওয়ে' গ্যালাক্সির নক্ষত্রসমূহে আছে অভাবিত সংখ্যক গ্রহ। পৃথিবীর সমুদ্রের তলদেশের উষ্ণ তাপমাত্রার রন্ধ্রসমূহে সালফার যৌগসমূহে প্রাণের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে প্রত্যাশিতরকমের মৃদু সাড়াসম্পন্ন। নূতন সাক্ষ্যসমূহ সামষ্টিকভাবে এই সিদ্ধান্তের দিকে ধাবিত হয় যে, ধূমকেতুসমূহ অন্তঃসৌরমণ্ডলে বর্ষিত হয় পর্যায়-ব্যবধি মেনে পৃথিবীতে অনেক প্রজাতির বিলুপ্তির সূত্রপাত ঘটিয়ে। আন্তঃগ্যালাক্টিক স্থানে বিশাল সব অঞ্চল উদ্‌ঘাটিত হয়েছে যেগুলো আপাতদৃষ্টিতে গ্যালাক্সিসমূহে নিঃশেষ হয়ে গেছে। মহাবিশ্বের নূতন এবং গুরুত্বপূর্ণ উপাদানসমূহ এর চূড়ান্ত পরিণতির প্রশ্নটিকেই জাগিয়ে তুলছে।

এবং আবিষ্কারের গতি পূর্ণোদ্যমে ক্রিয়াশীল। জাপান, ইয়োরোপীয় স্পেস এজেন্সি এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের মহাকাশযান ১৯৮৬ সনে হ্যালির ধূমকেতুকে ধরে ফেলার কথা। U. S. Space Telescope, যা যে কোনো কালের উদ্যোগ নেয়া কক্ষপথে পরিভ্রমণশীল সর্ববৃহৎ বীক্ষণ-যন্ত্র, এই দশক শেষ হওয়ার পূর্বেই নিক্ষিপ্ত হওয়ার কথা। মঙ্গলগ্রহে, অন্যান্য ধূমকেতুসমূহে, গ্রহানুপুঞ্জে এবং টাইটানে মহাকাশযান মিশনের গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ আসন্ন প্রায়। U. S. Galileo মহাকাশযান বৃহস্পতিমণ্ডলে পৌঁছবে ১৯৮৮ সনে। এটি তৈরি হয়েছে অন্যতম বৃহৎ গ্রহটির

আবহমণ্ডল গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করার প্রথম প্রচেষ্টা হিসেবে। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলোর গতির একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকও আছে : সাম্প্রতিক গবেষণা মতে, এটি পারমাণবিক যুদ্ধের পরিণতিতে উৎপন্ন ধোঁয়ার কালির গুঁড়া ও ধুলো বায়ুমণ্ডলের অনেক উপর পর্যন্ত পৌঁছে গিয়ে পৃথিবীকে অন্ধকারাচ্ছন্ন ও হিমায়িত করে তুলবে, যা সৃষ্টি করবে এক নজিরবিহীন বিপর্যয়, এমনকি সেইসব জাতির জন্যও যাদের উপর একটি বোমাও নিক্ষিপ্ত হয়নি। আমাদের প্রযুক্তি ক্রমবর্ধমানভাবে আমাদেরকে সমর্থ করে তুলছে মহাবিশ্বের বিস্ময়সমূহকে উদ্‌ঘাটন করার জন্য এবং পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা কমিয়ে আনার জন্য, আমরা বাস করছি, এবং আমরা প্রভাবিত করছি মানবজাতির ইতিহাসে অন্যতম জটিল ঘটনাবহুল সময়টিকে।

এই বিশাল মাত্রার কোনো প্রকল্পে যারা সাহায্য করেছেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানানো অসম্ভব। তবুও, আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি বি. গেস্ট্রি লি ; কসমস প্রোডাক্শন স্টাফ-এর সিনিয়র প্রযোজকগণ, জেওফ্রি হেইনেস-স্টাইল্স এবং ডেভিড কেনার্ড এবং নির্বাহী প্রযোজক অ্যাড্রিয়ান ম্যালোন ; কলাকুশলিগণ জন লম্বার্গ (যিনি 'কসমস' ধারাবাহিকের এর মূল ডিজাইন এবং সংগঠনে এক জটিল চরিত্রে রূপদান করেন), জন অ্যালিসন, এডল্‌ফ স্ক্যালার, রিক স্টার্নব্যাক, ডন ডেভিস, ব্রাউন, এবং আনা নর্সিয়া ; উপদেষ্টা ডোনাল্ড গোল্ডস্মিথ, ওয়েন গিনগেরিচ, পল ফক্স, এবং ডায়ান অ্যাক্কারম্যান ; ক্যামেরন বেক, KCET ব্যবস্থাপনা, বিশেষত গ্রেগ অ্যান্ডোরফার, যিনি প্রথম আমাদের কাছে নিয়ে আসেন KCET-এর প্রস্তাব, চাক্ অ্যালেন, উইলিয়াম ল্যাম্ব, এবং জেমস লোপার ; 'কসমস' টেলিভিশন ধারাবাহিকের অব-লেখক এবং সহ-প্রযোজকগণ, সাথে আটলান্টিক রিচ্‌ফিল্ড কোম্পানি, দ্য করপোরেশন ফর পাবলিক ব্রডকাস্টিং, দ্য আর্থার ভাইনিং ডেভিস ফাউন্ডেশন্‌স, দ্য আলফ্রেড পি স্লোয়ান ফাউন্ডেশন, দ্য ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং করপোরেশন, এবং পলিটেল ইন্টারন্যাশনাল। অন্যারা যারা ঘটনার সত্যতা বা দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট করার ক্ষেত্রে সাহায্য করেছেন তাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে গ্রন্থটির শেষে। তবুও গ্রন্থটির চূড়ান্ত দায়-দায়িত্ব অবশ্যই আমার। আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি 'র‍্যান্ডম হাউস'-এর স্টাফদেরকে বিশেষত আমার সম্পাদক, আন্না ফ্রিডগুডকে, যখন টেলিভিশন ধারাবাহিকটির সময়সীমা বেঁধে দেয়া হল এবং গ্রন্থটিকে মনে হল বিপন্ন, তখন তাদের আপ্রাণ প্রচেষ্টা এবং ধৈর্যের জন্য। আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতার ঋণ বোধ করছি আমার নির্বাহী সহকারী, শার্লি আর্ডেনের প্রতি, এই গ্রন্থটির প্রাথমিক খসড়া মুদ্রণ করার জন্য এবং তার স্বাভাবিক প্রাণচঞ্চল সামর্থ্য দিয়ে প্রোডাক্শনটির সকল পর্যায়ের মধ্য দিয়ে পরবর্তী খসড়াসমূহকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। 'কসমস' প্রকল্পটি যতভাবে তার প্রতি গভীর ঋণে আবদ্ধ এটি কেবল তাদের একটি মাত্র। আমি যতটুকু প্রকাশ করতে পারি তার চাইতেও অধিক কৃতজ্ঞ 'কর্নেল ইউনিভার্সিটি'-র প্রশাসনের প্রতি,এই প্রকল্প সম্পন্ন

banglainternet.com

করার জন্য আমাকে দুই বছরের ছুটি প্রদান করায়, সেখানে আমার সহকর্মী ও ছাত্রদের প্রতি, এবং নাসা, জেপিএল এবং ভয়েজার ইমেজিং টিমের সহকর্মীদের প্রতি।

'কসমস' গ্রন্থটি রচনার ক্ষেত্রে আমার সবচেয়ে বেশি ঋণ অ্যান ড্রুয়ান এবং স্টিভেন সোটারের প্রতি, যারা টেলিভিশন ধারাবাহিকটিতে ছিলেন আমার সহ-লেখক। মৌলিক ধারণাসমূহ এবং তাদের সমন্বয়ের প্রতি, পর্বসমূহের সার্বিক বৌদ্ধিক কাঠামো এবং রচনা শৈলীর উৎকর্ষের প্রতি তাদের অবদান অসামান্য। আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ এই গ্রন্থের প্রাথমিক বর্ণনাসমূহ নিয়ে তাদের শ্রমসাপেক্ষ জটিল পাঠগুলোর জন্য, অনেক খসড়ার মধ্য দিয়ে পুনঃপঠনের জন্য তাদের গঠনমূলক এবং সৃজনশীল পরামর্শগুলোর জন্য, টেলিভিশন পাণ্ডুলিপির ক্ষেত্রে তাদের বড়ো রকমের অবদানের জন্য, যেগুলো বিভিন্নভাবে এই গ্রন্থের বিষয়বস্তুতে প্রভাব বিস্তার করেছে। আমাদের বিভিন্ন আলোচনার মধ্য দিয়ে আমি যে আনন্দ পেয়েছি, তা 'কসমস' প্রকল্প থেকে আমার অন্যতম প্রধান প্রাপ্তি।

ইথাকা এবং লস এঞ্জেলেস, মে ১৯৮০ এবং জুলাই ১৯৮৪

প্রথম অধ্যায়
মহাজাগতিক সমুদ্রের বেলাভূমি

প্রথম সৃষ্ট এবং অবয়বপ্রাপ্ত মানবদেরকে সম্বোধন করা হত ভয়ংকর হাসির জাদুকর, রাত্রির জাদুকর, অবিন্যস্ত, এবং কৃষ্ণ জাদুকর রূপে...। তারা বুদ্ধিবৃত্তির অধিকারী ছিল, পৃথিবীতে যা কিছু ছিল তারা তার সবকিছুই জানতে সক্ষম হয়েছিল। যখন তারা তাকাত তখন তারা তাৎক্ষণিকভাবে তাদের চারপাশের সবকিছুই দেখতে পারত, এর ফলে তারা গভীরভাবে চিন্তা করত স্বর্গের খিলান এবং মর্তের গোলীয় পৃষ্ঠ নিয়ে... [তখন সৃষ্টিকর্তা বললেন] : তারা সবকিছুই জানে ... আমরা এখন তাদেরকে নিয়ে কী করবো ? এমন কিছু করতে হবে যেন তাদের দৃষ্টি কেবল নিকটের বস্তুগুলোই দেখতে পায় ; যেন তারা পৃথিবীর পৃষ্ঠের ছোটো একটি অংশই দেখতে পায় !... তারা কি স্বাভাবিকভাবেই আমাদের সৃষ্টির সাধারণ ফলাফল নয় ? তাদেরকে কি দেবতাও হতে হবে ?

—দ্য পোপল ভুহ্ অব দ্য কীশ্ মায়া

জ্ঞাত হচ্ছে সসীম, অজ্ঞাত হচ্ছে অসীম ; বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে আমরা দাঁড়িয়ে আছি ব্যাখ্যার অতীত অবস্থার এক অসীম মহাসমুদ্রের মাঝে এক ক্ষুদ্র দ্বীপের উপর। প্রত্যেক প্রজন্মে আমাদের কাজ হল আরো কিছুটা ভূমি পুনঃদখল করা।

— টি. এইচ. হাক্সলি, ১৮৮৭

মহাবিশ্ব হল যা কিছু আছে বা যা কিছু সর্বদাই ছিল বা যা কিছু সর্বদাই থাকবে। মহাবিশ্ব নিয়ে আমাদের ক্ষীণতম চিন্তাটিও চিরকাল আমাদেরকে আলোড়িত করে—মেরুদণ্ড শিরশির করে উঠে, কণ্ঠস্বর জড়িয়ে আসে, এক নিস্তেজ অনুভূতি যেন এক সুদূর স্মৃতি, কোনো উঁচু স্থান থেকে পড়ে যাবার। আমরা জানি যে, আমরা এগিয়ে যাচ্ছি সবচেয়ে রহস্যময় জগতের দিকে।

মহাবিশ্বের আকৃতি এবং বয়স সাধারণ মানবীয় বোধগম্যতার অতীত। বিশালতা এবং চিরন্তনতার মাঝে কোথাও হারিয়ে যাওয়া আমাদের এই ছোটো গ্রহ-আবাস। মহাজাগতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে, সকল মানবীয় বিষয় ও ক্রিয়া-কর্মকে মনে হয় অতি নগণ্য, এমনকি অতি ক্ষুদ্র। এবং তবুও আমাদের প্রজাতিটি নবীন, উৎসাহী, সাহসী এবং অধিকতর সম্ভাবনাময়। বিগত কয়েক সহস্রাব্দে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এবং এর মাঝে আমাদের অবস্থান নিয়ে আমরা সম্পন্ন করেছি অতি বিস্ময়কর ও অপ্রত্যাশিত আবিষ্কার সমূহ, অভিযানসমূহ বিবেচনা করলে তা-ও উৎসাহব্যঞ্জক। এগুলো

banglainternet.com

আমাদেরকে মনে করিয়ে দেয় যে, মানবজাতি বিকশিত হয়েছে বিস্ময়ের ভিতর দিয়ে, আর অনুধাবন হল এক আনন্দ, জ্ঞান হল অস্তিত্বের পূর্বশর্ত। আমি বিশ্বাস করি, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে আমরা কত ভালোভাবে জানতে পারব তার উপর নির্ভর করছে আমাদের ভবিষ্যৎ, যে মহাবিশ্বে আমরা ভেসে আছি ভোরের আকাশে ধূলিকণার মতো।

সেইসব অভিযানে প্রয়োজন ছিল সংশয় এবং কল্পনা উভয়েরই। কল্পনা প্রায়শই আমাদেরকে নিয়ে যায় এমন সব জগতে যেগুলো কখনই অস্তিত্বশীল ছিল না। কিন্তু এটি ছাড়া আমরা কোথাও পৌঁছতে পারি না। সংশয় আমাদেরকে সক্ষম করে সত্য থেকে অলীক কল্পনাকে পৃথক করতে, আমাদের ধারণাসমূহকে পরীক্ষণ করার সময়। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ঐশ্বর্য অপরিমাপযোগ্য—অভিজাত ঘটনায়, অপরূপ সুন্দর সব আন্তঃসম্পর্কের মাঝে, আকস্মিক বিস্ময়মিশ্রিত ভয়ের মাঝে।

পৃথিবীর পৃষ্ঠটি হচ্ছে মহাজাগতিক সমুদ্রের বেলাভূমি। আমরা যা জানি তার বেশির ভাগই জেনেছি এটি থেকে। সম্প্রতি, আমরা সমুদ্রটির দিকে অতিকষ্টে অগ্রসর হয়েছি কিছুদূর, যা আমাদের পদাঙ্গুলিকে ঈষৎ আর্দ্র করার জন্য যথেষ্ট অথবা, তা সর্বোচ্চ আমাদের গোঁড়ালি পর্যন্ত সিক্ত করতে পারে। জলরাশি যেন আমাদেরকে কেবলি আহ্বান করছে। ডেকে ফিরছে সেই মহাসমুদ্র। আমাদের মাঝে কেউ কেউ জানে যে, এটিই সেই স্থান যেখান থেকে আমরা এসেছি। আমরা প্রতীক্ষা করছি ফিরে যাওয়ার জন্য। আমি মনে করি, এই আকাঙ্ক্ষাগুলো ধর্মীয় অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাহীন নয়, যদিও দেবতারা যা-ই হয়ে থাকুক না কেন, এগুলো তাদেরকে অস্বস্তিতে ফেলতে পারে।

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মাত্রাসমূহ এত বিশাল যে, পৃথিবীতে দূরত্বের পরিমাপে যে সকল একক ব্যবহৃত হয়, যেমন মিটার বা মাইল, এর খুব সামান্যই ধারণা দিতে পারবে। এগুলোর পরিবর্তে, আমরা দূরত্ব পরিমাপ করি আলোর বেগের সাহায্যে। একটি আলোকরশ্মি এক সেকেন্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল, প্রায় ৩০০,০০০ কিলোমিটার বা পৃথিবীর চারদিকে সাতবার ভ্রমণ সম্পন্ন করে। সূর্য থেকে এটি পৃথিবীতে পৌঁছায় আট মিনিটে। আমরা বলতে পারি যে পৃথিবী থেকে সূর্য আট আলোক-মিনিট দূরে। এক বৎসরে এটি শূন্যস্থানে প্রায় দশ ট্রিলিয়ন কিলোমিটার, প্রায় ছয় ট্রিলিয়ন মাইল দূরত্ব অতিক্রম করে। দূরত্বের এই এককটিকে, অর্থাৎ আলো এক বছর সময়ে যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে এক আলোক-বর্ষ বলে। এটি সময় নয়, দূরত্ব পরিমাপ করে—বিশাল দূরত্ব।

পৃথিবী হল একটি স্থান। কোনক্রমেই এটি একমাত্র স্থান নয়। এটি এমনকি কোনো বিশেষ স্থানও নয়। কোনো গ্রহ, বা নক্ষত্র বা গ্যালাক্সি সবিশেষ হতে পারে না, কারণ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মূলত শূন্য। বিশাল, শীতল, চিরন্তন শূন্য স্থানটির ভিতর একমাত্র বিশেষ স্থান হল আন্তঃগ্যালাক্টিক স্থানের চিরন্তন রাত, এমন এক অদ্ভুত ও নিঃসঙ্গ স্থান যে, তুলনায়, গ্রহ ও নক্ষত্র এবং গ্যালাক্সিগুলোকে মনে হয় বেদনাতুরভাবে

বিরল এবং মনোরম। যদি আমরা বিক্ষিপ্তভাবে প্রবিষ্ট হতাম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ভিতর, তবে আমরা আমাদেরকে কোনো গ্রহে বা গ্রহের নিকটে আবিষ্কার করতাম তার সম্ভাবনা হত এক বিলিয়ন ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়নের* (১০^{৩৩}, একটি একের পর ৩৩টি শূন্য) এক ভাগ। প্রাত্যহিক জীবনে এরূপ ঘটার সম্ভাবনাকে বলা হয় জোর করে ঘটানো। প্রকৃতই গ্রহসমূহ মূল্যবান।

আন্তঃগ্যালাক্টিক কোনো সুবিধাজনক স্থান থেকে আমরা দেখতে পাব যে, মহাশূন্যের তরঙ্গের উপর সমুদ্রের ফেনার মতো ছড়িয়ে আছে, আলোর অসংখ্য অস্পষ্ট গুচ্ছাকার কুণ্ডলী। এগুলোই গ্যালাক্সি। এদের কিছু হল নিঃসঙ্গ ভ্রমণকারী, বেশির ভাগই একত্রে দলবদ্ধ ঝাঁক, পরস্পরের সাথে গাদাগাদি করে, বিশাল মহাজাগতিক অন্ধকারে অনন্ত সঞ্চরণে ব্যস্ত। আমাদের সম্মুখে রয়েছে আমাদের জ্ঞাত সবচাইতে বৃহৎ মাত্রার বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটি। আমরা এখন নীহারিকার জগতে, পৃথিবী থেকে আট বিলিয়ন আলোক-বর্ষ দূরে, আমাদের জ্ঞাত মহাবিশ্বের সীমার অর্ধ পথে।

একটি গ্যালাক্সি গঠিত হয় গ্যাস, ধুলো এবং নক্ষত্র দ্বারা—বিলিয়নের পর বিলিয়ন সংখ্যক নক্ষত্র দ্বারা। প্রতিটি নক্ষত্র হতে পারে কারো কারো একটি সূর্য। গ্যালাক্সির ভিতর আছে নক্ষত্র এবং গ্রহমঞ্জরী, এবং এটি হতে পারে, প্রাণশীল বস্তু এবং বুদ্ধিমান প্রাণী এবং সুদূর সভ্যতার বিস্তার। কিন্তু দূর থেকে, একটি গ্যালাক্সি আমাকে মনে করিয়ে দেয় কিছু মনোরম বস্তুর সমাহারকে—হয়ত সামুদ্রিক প্রাণীর খোলস, অথবা প্রবাল, মহাজাগতিক সমুদ্রে অপরিমেয় কাল ধরে 'প্রকৃতি'-র শ্রমের ফসল।

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে রয়েছে প্রায় একশত বিলিয়ন (১০^{১১}) গ্যালাক্সি, গড়ে, এদের প্রতিটির রয়েছে একশত বিলিয়ন নক্ষত্র। সবগুলো গ্যালাক্সিতে হয়ত রয়েছে নক্ষত্রের মতো বিপুল সংখ্যক গ্রহ, ১০^{১১} × ১০^{১১} = ১০^{২২} টি, দশ বিলিয়ন ট্রিলিয়ন সংখ্যক। এত বিশাল সংখ্যার বিপরীতে, এর কতটুকু সম্ভাব্যতা যে, কেবল একটি সাধারণ নক্ষত্র, সূর্যেরই থাকবে প্রাণপ্রাচুর্যময় গ্রহ? কেন আমরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এক বিস্মৃত প্রান্তে স্থান পেয়ে এতটা সৌভাগ্য অর্জন করব? আমার কাছে এটিই বেশি মনে হয় যে, এই বিশ্বজগৎ প্রাণে প্রাণে ভরপুর হয়ে উঠছে। কিন্তু, আমরা মানুষেরা এখনও তা জানি না। আমরা আমাদের অনুসন্ধান কেবল শুরু করেছি। আট বিলিয়ন আলোক-বর্ষ দূরত্ব থেকে আমাদের পক্ষে সেই গুচ্ছটি খুঁজে পাওয়াও কঠিন যার উপর আমাদের 'মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সি'টি স্থাপিত, নিদেনপক্ষে সূর্য বা পৃথিবী। একমাত্র যে গ্রহটি বসতিময় বলে আমরা নিশ্চিত, তাহল শিলাখণ্ড ও ধাতুর ক্ষুদ্র দাগ, প্রতিফলিত আলোতে যা বিনম্রভাবে জ্বলজ্বল করছে, এবং এরূপ দূরত্বে যা চরমভাবে বিলীন।

* বৃহৎ সংখ্যার ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করি আমেরিকান বৈজ্ঞানিক রীতি : এক বিলিয়ন = ১,০০০,০০০,০০০ = ১০^{৯}, এক ট্রিলিয়ন = ১,০০০,০০০,০০০,০০০ = ১০^{১২}, ইত্যাদি। ঘাতটি একের পর শূন্যের সংখ্যা নির্দেশ করে।

banglainternet.com

কিন্তু এখন আমাদের যাত্রার উদ্দেশ্য হল সেটি যাকে পৃথিবীর জ্যোতির্বিদরা সম্বোধন করেন গ্যালাক্সির 'স্থানীয় দল' বলে। কয়েক মিলিয়ন আলোক-বর্ষ দূরে, এটি প্রায় বাইশটি গ্যালাক্সি দ্বারা গঠিত। এটি একটি হালকাভাবে ছড়ানো এবং তমসাচ্ছন্ন ঝাঁক। এই গ্যালাক্সিগুলোর অন্যতম হল M31, যা পৃথিবী থেকে দৃষ্ট অ্যান্ড্রোমিডা নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে। অন্যান্য সর্পিলাকার গ্যালাক্সির মতো এটি নক্ষত্রসমূহের গ্যাস এবং ধুলোর এক বিশাল সূচিচক্র। M31-এর আছে দুটি ছোটো উপগ্রহ, ক্ষুদ্র উপবৃত্তাকার গ্যালাক্সি যেগুলো এর সাথে আবদ্ধ আছে মহাকর্ষ বল দ্বারা, পদার্থবিদ্যার সেই একই সূত্র দ্বারা যা আমাকে চেয়ারে ধরে রাখতে প্রয়াস পায়। প্রাকৃতিক বিধিসমূহ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র একইরকম। এখন আমরা আমাদের গৃহ থেকে দুই মিলিয়ন আলোক-বর্ষ দূরে।

M31 এর সীমা ছাড়িয়ে রয়েছে আরো একটি, অতি ক্ষুদ্রকার গ্যালাক্সি, আমাদের নিজস্বটি, এর সর্পিলাকার বাহুসমূহ ঘুরছে ধীরলয়ে, প্রতি বিলিয়ন বছরের এক-চতুর্থাংশ সময়ে একবার। এখন, আমাদের বাসভূমি থেকে চল্লিশ হাজার আলোক-বর্ষ দূরে, আমরা আমাদেরকে আবিষ্কার করছি 'মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সি'-র গুরুভার কেন্দ্রে পতনশীলরূপে। কিন্তু যদি আমরা পৃথিবীকে খুঁজে পেতে চাই, তবে অবশ্যই আমাদের গতি পুনঃনির্ধারিত করতে হবে 'গ্যালাক্সিটি'-র অতিদূর প্রান্তদেশের দিকে, এক সুদূর সর্পিলাকার বাহুর প্রান্তের নিকটবর্তী এক তমসাচ্ছন্ন দৃশ্যপটে।

বিস্ময়ভরে আমরা দেখব যে, এমনকি সর্পিলাকার বাহুগুলোর মাঝেও, আমাদের পাশে বহমান কত না নক্ষত্র—অপরূপ সুন্দর ও স্ব-আলোকিত নক্ষত্ররাজির এক বিশাল দল, এর কিছু হল সাবানের বুদবুদের মতোই হালকা ও পাতলা এবং এতটাই বৃহৎ যে এরা ধারণ করতে পারত দশ সহস্র সূর্য অথবা এক ট্রিলিয়ন পৃথিবী ; অন্যগুলো একটি ছোটো শহরের মতো আকৃতিসম্পন্ন এবং যাদের ঘনত্ব সীসার তুলনায় একশত ট্রিলিয়ন গুণ। কিছু নক্ষত্র সূর্যের মতো নিঃসঙ্গ। অধিকাংশেরই আছে সহচর। ব্যবস্থাসমূহ সাধারণত দ্বৈত, দুটি নক্ষত্রের একটি অপরটির চারদিকে আবর্তনশীল। কিন্তু কয়েক ডজন নক্ষত্রের শিথিল গুচ্ছের মাধ্যমে ত্রয়ী ব্যবস্থা থেকে এক মিলিয়ন সূর্যের ঔজ্জ্বল্য সম্পন্ন বিশাল বটিকাকার গুচ্ছে রূপান্তরে রয়েছে এক ধারাবাহিক পর্যায়-বিন্যাস। কিছু দ্বৈত নক্ষত্র এতটা নিকটবর্তী যে তারা পরস্পরকে স্পর্শ করে ফেলে, এবং তাদের মাঝ দিয়ে প্রবাহিত হয় নক্ষত্র-উপাদান। বেশির ভাগের মধ্যবর্তী দূরত্ব বৃহস্পতি গ্রহ ও সূর্যের মধ্যবর্তী দূরত্বের কাছাকাছি। কিছু নক্ষত্র, সুপারনোভাসমূহ, তাদেরকে যে গ্যালাক্সিটি ধারণ করে তার সমান উজ্জ্বল ; অন্যগুলো, কৃষ্ণবিবরসমূহ, কয়েক কিলোমিটার দূর থেকেও দৃশ্যমান নয়। কতকগুলো আলো ছড়ায় ধ্রুব উজ্জ্বলতায় ; অন্যগুলো মিটমিট করে অনিশ্চিতভাবে অথবা মিটমিট করে এক সুনিপুণ শৃঙ্খলায়। কতকগুলো আবর্তিত হয় রাজসিক আভিজাত্য নিয়ে, অন্যগুলো এতটাই ব্যাকুলভাবে যে, তারা নিজেদেরকে পরিণত করে কমলালেবুর মতো আকৃতিতে। অধিকাংশই বিকিরণ করে দৃশ্যমান ও

অবলোহিত আলো, অন্যগুলো এক্স রশ্মি বা বেতার তরঙ্গের চমৎকার উৎস। নীল তারকাগুলো উত্তপ্ত এবং নবীন ; হলুদ তারকাগুলো, প্রথাগত এবং মধ্যবয়সী ; লোহিত তারকাগুলো, প্রায়শই বয়োজ্যেষ্ঠ এবং ক্ষয়িষ্ণু ; এবং ক্ষুদ্র সাদা বা কালো তারকাগুলো মৃত্যুর চূড়ান্ত ও তীব্রতম যন্ত্রণার মাঝে। 'মিল্কি ওয়ে' ধারণ করে প্রায় চারশত বিলিয়ন তারকা যাদের রয়েছে একটি জটিল ও সুবিন্যস্ত সৌষ্ঠব। এখন পর্যন্ত এসব তারকার মাঝে পৃথিবীবাসীরা নিবিড়ভাবে কেবল মাত্র একটিকেই জানতে পেরেছে।

প্রতিটি নক্ষত্র-ব্যবস্থা মহাশূন্যে এক দ্বীপের মতো, এর প্রতিবেশী হতে অনেক আলোক-বর্ষের দূরত্বে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। আমি কল্পনা করি, অসংখ্য জগতে রয়েছে সেই সব সৃষ্টি যারা জ্ঞানের ক্ষীণ আলোর মাঝে বিবর্তনের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে, এদের প্রত্যেকেই প্রথমে অনুমান করছে কেবল তাদের ক্ষুদ্র গ্রহটি এবং কয়েকটি সূর্য নিয়ে। আমরা বেড়ে উঠি নিঃসঙ্গতার মাঝে। খুব ধীরে ধীরে আমরা আমাদেরকে শেখাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিয়ে।

কিছু নক্ষত্রকে ঘিরে থাকতে পারে লক্ষ লক্ষ প্রাণহীন ও প্রস্তরময় ক্ষুদ্র গ্রহ যেগুলো বিবর্তনের কোনো এক আদি পর্যায়ে স্থিমায়িত গ্রহ-ব্যবস্থা। হয়ত অনেক নক্ষত্রের রয়েছে উপরন্তু আমাদের নিজেদেরটির মতো গ্রহ-ব্যবস্থা : পরিধিতে গ্যাসপূর্ণ ও বলয়যুক্ত বিশাল গ্রহগুলো এবং বরফময় উপগ্রহসমূহ, এবং কেন্দ্রের কাছাকাছি রয়েছে ক্ষুদ্র, উষ্ণ, নীল-সাদা, মেঘাচ্ছাদিত গ্রহসমূহ। এদের কোনোটিতে হয়ত বিকাশ ঘটেছে বুদ্ধিমান প্রাণীর, যারা গ্রহটির পৃষ্ঠদেশকে পরিণত করেছে কোনো এক বিশাল প্রকৌশল-প্রকল্পে। যারা হল মহাবিশ্বে আমাদের ভাই-বোন। তারা কি আমাদের থেকে খুব ভিন্নতর ? তাদের আকৃতি ; প্রাণ-রসায়ন, স্নায়ু-জীববিদ্যা, ইতিহাস, রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, শিল্পকলা, সংগীত, ধর্ম, দর্শন কিরূপ ? হয়ত কোনো একদিন আমরা তাদেরকে জানতে পারব।

এখন আমরা পৌঁছে গেছি আমাদের নিজ আঙিনায়, পৃথিবী হতে এক আলোকবর্ষ দূরে। আমাদের সূর্যকে ঘিরে রয়েছে বরফ, পাথর এবং জৈব অণুসমূহ দ্বারা গঠিত বিশাল তুষার-বলগুলোর এক গোলকীয় ঝাঁক ঃ যেগুলো হল ধূমকেতুর কেন্দ্রীয় অংশ। প্রতিবারই কোনো অতিক্রমশীল নক্ষত্র সামান্য মহাকর্ষীয় বল প্রয়োগ করে, এবং এদের কোনো একটি বাধ্য হয়ে সৌর জগতের অন্তর্ভাগের দিকে ঝুঁকে পড়ে। সেখানে সূর্য একে উত্তপ্ত করে তোলে, বরফ হয়ে যায় বাষ্পীভূত, এবং একটি চমৎকার ধূমকেতু-লেজ উৎপন্ন হয়।

আমরা এখন এগিয়ে যাচ্ছি আমাদের সৌর জগতের গ্রহসমূহের দিকে, মোটামুটিভাবে বড়ো জগৎসমূহের দিকে, যারা সূর্যের বন্দি, যারা মহাকর্ষের প্রভাবে বাধ্য হয়ে অনুসরণ করে প্রায় বৃত্তাকার কক্ষপথ, উত্তপ্ত হয় মূলত সূর্য দ্বারা। প্লুটো, যা মিথেন-বরফে আচ্ছাদিত এবং এর সহচর হল একমাত্র ও বিশাল উপগ্রহ ক্যারন, আলোকিত হয় দূরের এক নক্ষত্র দ্বারা, যাকে পিচের মতো কালো এক আকাশে

banglainternet.com

একটি উজ্জ্বল বিন্দুর চাইতে অধিক কিছু মনে হয় না। বিশাল গ্যাসীয় জগৎসমূহ, নেপচুন, ইউরেনাস, শনি—সৌরজগতের রত্নসম—এবং বৃহস্পতি, সকলের সাহচর্যে রয়েছে বরফময় উপগ্রহগুলো। গ্যাসপূর্ণ গ্রহ এবং ঘূর্ণায়মান হিমশৈলগুলোর অন্তর্ভাগের অঞ্চলসমূহ উষ্ণ, যেগুলো হল সৌরজগতের অন্তঃস্থ অংশের প্রস্তরময় প্রদেশ। উদাহরণস্বরূপ, লোহিত গ্রহ মঙ্গল, যার রয়েছে উদ্‌গীরনশীল আগ্নেয়গিরিসমূহ, ফাটলের ফলে সৃষ্ট বিশাল উপত্যকাসমূহ, গ্রহময় প্রবল ধূলিঝড়, এবং, খুব সম্ভবত, প্রাণের কিছু সরল রূপ। সবগুলো গ্রহ আবর্তন করে নিকটতম নক্ষত্র সূর্যের চারদিকে, থার্মো-নিউক্লিয় বিক্রিয়ায় রত হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাসের এক অগ্নিকুণ্ড, যা সৌরজগৎকে ভাসিয়ে দিচ্ছে আলোর বন্যায়।

অবশেষে, আমাদের বিক্ষিপ্ত ভ্রমণের শেষপর্যায়ে, আমরা ফিরে যাচ্ছি আমাদের ক্ষুদ্র, ভঙ্গুর, নীলাভ সাদা পৃথিবীর দিকে, যা আমাদের সবচেয়ে সাহসী কল্পনারও অধিক এক বিশাল মহাজাগতিক সমুদ্রের মাঝে হারিয়ে গেছে। এটি অন্য সব কিছুর বিশালতার মাঝে এক জগৎ। এটি কেবল আমাদেরই জন্য তাৎপর্যময়। পৃথিবীই আমাদের আবাসস্থল, আমাদের মাতা-পিতা। আমাদের জীবনের রূপটি এখানেই সৃষ্ট এবং বিবর্তিত। এখানেই বয়োপ্রাপ্ত হচ্ছে মানবপ্রজাতি। এটিই সেই জগৎ যেখানে আমরা আমাদের আবেগকে বিকশিত করেছি মহাবিশ্বকে জানার জন্য, এবং এটিই সেই স্থান, যেখানে আমরা কিছুটা যন্ত্রণাসহ ও কোনো নিশ্চয়তা ছাড়াই, খুঁজে বেড়াচ্ছি আমাদের নিয়তিকে।

স্বাগতম পৃথিবী নামক গ্রহে—নীল নাইট্রোজেন আকাশ, তরল পানির মহাসমুদ্র, শীতল বনভূমি এবং কোমল তৃণভূমিময় এক স্থান, এমন এক জগৎ যা প্রাণের কলতানে মুখরিত। আমি বলেছি যে, মহাজাগতিক দৃষ্টিকোণে, এটি পরম সুন্দর ও বিরল ; কিন্তু এটি, আপতত অনন্যও। স্থান ও কালে আমাদের সকল ভ্রমণে এখন পর্যন্ত, নিশ্চিতভাবে আমরা জানতে পারি যে, 'এটিই একমাত্র জগৎ যেখানে 'মহাবিশ্ব'-এর বস্তুকণা প্রাণশীল ও সচেতন হয়ে উঠেছে। মহাশূন্যে ছড়িয়ে থাকতে পারে এমন অনেক জগৎ, কিন্তু তাদের জন্য আমাদের অনুসন্ধানের শুরু এখানেই, মানব-মানবীর সামগ্রিক জ্ঞানের মাধ্যমে, এক মিলিয়নের অধিক বছর ধরে যা সঞ্চিত হয়েছে। আমরা সুবিধা পেয়েছি মেধাবী ও আবেগপ্রভাবে কৌতূহলী ব্যক্তিদের মাঝে থাকার এবং এমন একটি সময়ে যখন জ্ঞানের জন্য অনুসন্ধান সাধারণত পুরস্কৃত হয়। মানবজাতি নক্ষত্র থেকেই জাত এবং এখন কিছুকাল ধরে পৃথিবী নামক এক জগতে বসবাস করছে, শুরু করেছে তাদের দীর্ঘ অভিযাত্রার আবাস-জীবন।

মানুষের অনেক গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের মতো, পৃথিবী যে এক 'ক্ষুদ্র' জগৎ, এই আবিষ্কারটিও সম্পন্ন হয়, প্রাচীন 'নিকট-প্রাচ্য'তে অনেকের মতে যা, খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের সময়ে, সেই কালের শ্রেষ্ঠতম নগরী, মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া নগরীতে। এখানে বাস করতেন এরাটোস্‌থেনেস নামক এক ব্যক্তি। তাঁর এক পরশ্রীকাতর

সমসাময়িক ব্যক্তিত্ব তাকে সম্বোধন করতেন 'বিটা' (β) বলে, যা গ্রিক বর্ণমালার দ্বিতীয় বর্ণ, কারণ, তিনি বলেছিলেন, এরাটোস্‌থেনেস পৃথিবীতে সকল বিষয়ে ছিলেন দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এটি পরিষ্কার মনে হয় যে, এরাটোস্‌থেনেস প্রায় সবকিছুতেই ছিলেন 'আলফা' (α)। তিনি ছিলেন জ্যোতির্বিদ, ইতিহাসবেত্তা, ভূগোলবিদ, দার্শনিক, কবি, নাট্য-সমালোচক এবং গণিতজ্ঞ। তার রচিত গ্রন্থগুলোর শিরোনাম 'Astronomy' এবং 'Pain' হতে 'On Freedom' পর্যন্ত বিস্তৃত। তিনি আলেকজান্দ্রিয়ার বিখ্যাত গ্রন্থাগারটির পরিচালকও ছিলেন, যেখানে একদিন তিনি একটি প্যাপিরাসের পুস্তকে পড়লেন যে, 'সায়েন'-এর দক্ষিণাঞ্চলীয় সীমান্তের বসতিতে, নীল নদের প্রথম খাড়া জলপ্রপাতের নিকটে, ২১ জুনের এক মধ্যদুপুরে একটি উল্লম্ব লাঠির কোনো ছায়া পাওয়া যায় না। উত্তরায়নের দিনে, যা বছরের দীর্ঘতম দিন, যখন সময় নিঃশব্দে এগিয়ে যায় মধ্য দিবসের দিকে, মন্দিরের ছায়াসমূহ হয়ে আসে হ্রস্ব। মধ্যদুপুরে এরা সম্পূর্ণভাবে মিলিয়ে যায়। তখন প্রতিফলিত সূর্যকে দেখা যেত এটি গভীর কূপের তলদেশে। সূর্য তখন থাকত মাথার খাড়া উপরে।

এটি ছিল এমন একটি পর্যবেক্ষণ যা অন্যকেউ হলে সহজেই উপেক্ষা করত। লাঠি, ছায়া, কূপের মধ্যে প্রতিফলন, সূর্যের অবস্থান—এমন দৈনন্দিন সাধারণ বিষয়ের কী সম্ভাব্য গুরুত্ব থাকতে পারত ? কিন্তু এরাটোস্‌থেনেস ছিলেন একজন বৈজ্ঞানিক, এবং এসব সাধারণ স্থানের উপর তার গভীর ভাবনা পাল্টে দিল পৃথিবীকে ; অন্যকথায় এরা তৈরি করল পৃথিবীকে। এরাটোস্‌থেনেস প্রকৃতপক্ষে একটি পরীক্ষণ করে জানতে চেয়েছিলেন যে, আলেকজান্দ্রিয়াতে ২১ জুনের মধ্য দুপুরের দিকে কোনো উল্লম্ব লাঠি ছায়া প্রদান করে কিনা। এবং তিনি, আবিষ্কার করলেন যে, লাঠিগুলো ছায়া দিচ্ছে।

এরাটোস্‌থেনেস নিজেকে প্রশ্ন করলেন কীভাবে, একই সময়ে, সায়েনের একটি লাঠি কোনো ছায়া প্রক্ষিপ্ত করছে না এবং অনেক উত্তরের দিকে অবস্থিত আলেকজান্দ্রিয়াতে, একটি লাঠি প্রক্ষিপ্ত করছে একটি সুস্পষ্ট ছায়া। প্রাচীন মিশরের একটি মানচিত্র বিবেচনা করুন, যেখানে থাকবে দুটি সমদৈর্ঘ্যের উল্লম্ব লাঠি, একটি স্থাপিত হল আলেকজান্দ্রিয়াতে, অন্যটি সায়েনে। মনে করুন, কোনো একটি বিশেষ মুহূর্তে, কোনো লাঠিই কোনো ছায়া প্রক্ষিপ্ত করছে না। এটি সহজেই বোধগম্য হত—যদি ভূপৃষ্ঠ সমতল হত। তখন সূর্য থাকত খাড়া মাথার উপরে। যদি দুটি লাঠিই সমদৈর্ঘ্যের ছায়া প্রদান করত, সেটিও একটি সমতল ভূ-পৃষ্ঠের ধারণাকে প্রকাশ করত : তখন সূর্য-রশ্মি দুটি লাঠিতেই আনত থাকত সমান কোণে। কিন্তু এটি কী করে ঘটল যে, একই সময়ে সায়েনে কোনো ছায়া পাওয়া গেল না অথচ আলেকজান্দ্রিয়াতে পাওয়া গেল যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য ছায়া ?

তিনি বুঝলেন, এর একমাত্র সম্ভাব্য উত্তর হল, এই যে পৃথিবী-পৃষ্ঠটি বক্র। শুধু তা-ই নয় : বক্রতা যত বেশি হবে, ছায়ার দৈর্ঘ্যের পার্থক্য তত বেশি হবে। সূর্য এতটাই দূরে যে যখন এর রশ্মিসমূহ ভূ-পৃষ্ঠে পৌঁছায় তখন এরা সমান্তরালে থাকে।

banglainternet.com

সূর্যের রশ্মির সাথে বিভিন্ন কোণে স্থাপিত লাঠিসমূহ বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের ছায়া প্রক্ষিপ্ত করে। ছায়ার দৈর্ঘ্যে পর্যবেক্ষণকৃত পার্থক্যের জন্য, ভূপৃষ্ঠ বরাবর আলেকজান্দ্রিয়া ও সায়েনের মধ্যে কৌণিক দূরত্ব সাত ডিগ্রি হতে হবে ; অর্থাৎ আপনি যদি লাঠি সমূহকে ভূ-কেন্দ্র পর্যন্ত বিস্তৃত বলে কল্পনা করেন, তবে তারা সেখানে সাত ডিগ্রি কোণে পরস্পরকে ছেদ করবে।

সাত ডিগ্রি, পৃথিবীর পরিধি, তিনশত ষাট ডিগ্রি-এর মোটামুটিভাবে এক-পঞ্চাশাংশ। এরাটোস্থেনেস জানতেন যে আলেকজান্দ্রিয়া ও সায়েনের মধ্যে দূরত্ব প্রায় ৮০০ কিলোমিটার, কারণ তিনি এটি পরিমাপের জন্য একজন লোক নিয়োগ করেছিলেন। আটশত কিলোমিটারকে ৫০ দ্বারা গুণ করলে ৪০,০০০ কিলোমিটার হয় : সুতরাং অবশ্যই এটি হবে পৃথিবীর পরিধি।*

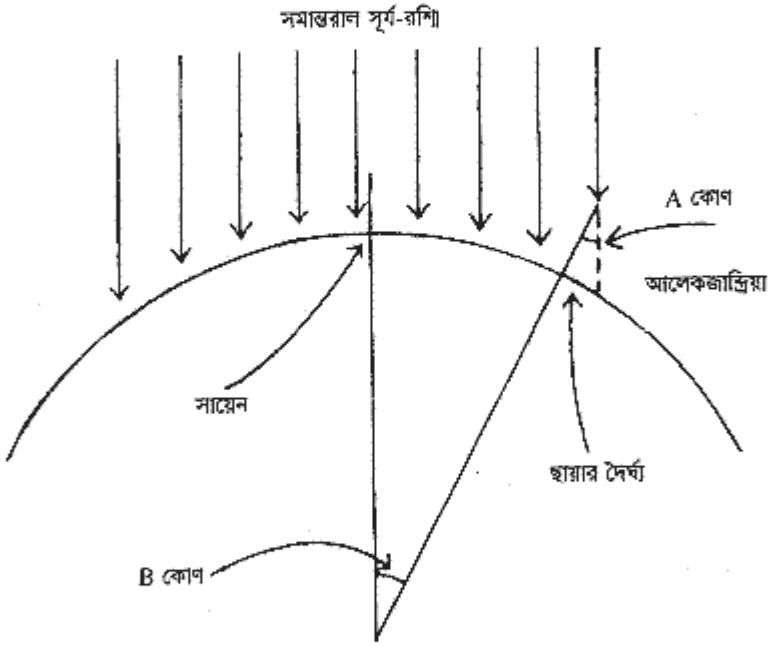

আলেকজান্দ্রিয়াতে ছায়ার দৈর্ঘ্য থেকে, A কোণের মান নির্ণয় করা যায়। কিন্তু সাধারণ জ্যামিতি অনুযায়ী ('দুটি সমান্তরাল সরলরেখাকে যদি কোনো তৃতীয় রেখা ছেদ করে তবে একান্তর কোণসমূহ পরস্পর সমান'), B কোণ A কোণের সমান। তাই আলেকজান্দ্রিয়াতে ছায়ার দৈর্ঘ্য পরিমাপ করে এরাটোস্থেনেস সিদ্ধান্ত নিলেন যে, পৃথিবীর পরিধিতে সায়েন ছিল $A = B = 9^0$ দূরে।

* অথবা যদি আপনি এগুলোকে মাইলে পরিমাপ করতে চান, আলেকজান্দ্রিয়া এবং সায়েনের মধ্যবর্তী দূরত্ব প্রায় ৫০০ মাইল, এবং ৫০০ মাইল × ৫০ = ২৫,০০০ মাইল।

এটিই সঠিক উত্তর। এরাটোস্থেনেসের একমাত্র যন্ত্র ছিল লাঠিসমূহ, তার চোখ, পা এবং মস্তিষ্ক, সাথে ছিল পরীক্ষণের প্রতি আগ্রহ। এগুলোর মাধ্যমে তিনি পৃথিবীর যেই পরিধি বের করলেন তাতে ত্রুটির পরিমাণ ছিল মাত্র কয়েক শতাংশ ; ২২০০ বছর পূর্বে যা ছিল এক উল্লেখযোগ্য অর্জন। কোনো গ্রহের আকৃতি সঠিকভাবে পরিমাপ করার ক্ষেত্রে তিনিই ছিলেন প্রথম ব্যক্তি।

তখনকার দিনে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলটি সমুদ্র যাত্রার জন্য ছিল বিখ্যাত। আলেকজান্দ্রিয়া ছিল এই গ্রহের বৃহত্তম সমুদ্র বন্দর। একবার আপনি যদি জেনে যান যে, পৃথিবী একটি অনতিদীর্ঘ ব্যাসের গোলক, তবে আপনি কি এর অনুসন্ধানে কোনো অভিযাত্রায় প্রলুব্ধ হবেন না, অনাবিষ্কৃত ভূমিসমূহ খুঁজে বের করার জন্য, এমনকি হয়ত গ্রহটির চারদিকে নৌযাত্রার প্রচেষ্টায় ? এরাটোস্থেনেসের চারশত বছর পূর্বে, মিশরীয় ফারাও নেকোহ্-এর অধীনে এক ফিনিশীয় নৌবহর আফ্রিকা প্রদক্ষিণ করে। তারা যাত্রা শুরু করেন সম্ভবত হালকা নৌকায় করে, লোহিত সাগর থেকে, আফ্রিকার পূর্ব উপকূল থেকে আটলান্টিক পর্যন্ত, ফিরে আসেন ভূমধ্যসাগর হয়ে। এই মহাকাব্যিক ভ্রমণটি শেষ হতে প্রায় তিন বছর সময় লাগে, একটি আধুনিক 'ভয়েজার' মহাকাশ যানের পৃথিবী হতে শনিগ্রহে যেতে যেই সময় লাগে প্রায় তার সমান।

এরাটোস্থেনেসের আবিষ্কারের পর, সাহসী ও অভিযানপ্রিয় নাবিকেরা অনেক অভিযাত্রার চেষ্টা করেছে। তাদের জাহাজগুলো ছিল ক্ষুদ্র। তাদের ছিল নৌচালনার কেবলমাত্র অতি সাধারণ কিছু যন্ত্রপাতি। তারা গণনার মাধ্যমে কাজ করত এবং যতদূর সম্ভব উপকূল রেখাসমূহকে অনুসরণ করত। কোনো অজানা সমুদ্রে তারা তাদের অক্ষাংশ স্থির করতে পারত কিন্তু তাদের দ্রাঘিমাংশ নয় এবং তা সম্পন্ন হত রাতের পর রাত ধরে দিগন্তের সাপেক্ষে নক্ষত্র রাজির অবস্থান পর্যবেক্ষণ করে। পরিচিত নক্ষত্রগুলো কোনো অচেনা সমুদ্রের মাঝে ছিল আস্থার উৎস। নক্ষত্ররা হল অভিযাত্রীদের জন্য পরম বন্ধু, তখনকার দিনে পৃথিবীতে সমুদ্রগামী জাহাজগুলোর জন্য এবং আজকের দিনে অন্তরীক্ষের নভোযান সমূহের জন্য। এরাটোস্থেনেসের পর, হয়ত অনেকেই চেষ্টা করেছে, কিন্তু নৌপথে পৃথিবীকে পূর্ণ প্রদক্ষিণের ক্ষেত্রে ম্যাগেলানের পূর্বে কেউ সফলকাম হয়নি। আলেকজান্দ্রিয়ার এক বিজ্ঞানীর গণিতের উপর নির্ভর করে নাবিক ও নৌযাত্রীদেরকে শুনতে হয়েছে কত কী বিপদজনক ও দুঃসাহসী গল্পের বিবরণ, পৃথিবীর মানুষকে নিতে হয়েছে জীবনের কতটা ঝুঁকি ?

এরাটোস্থেনেসের কালে, ভূগোলক নির্মিত হত শূন্য থেকে দৃষ্ট পৃথিবীর চিত্র ব্যবহার করে ; এগুলো যথেষ্টভাবে সঠিক ছিল তাদের সুপরিচিত ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে কিন্তু এ অঞ্চল থেকে দূরে সরে গেলে তা হয়ে উঠত অকার্যকর। 'বিশ্বব্রহ্মাণ্ড' সম্বন্ধে আমাদের বর্তমান জ্ঞানও এই না মেনে নেয়ার মতো কিন্তু অনিবার্য বিষয়টিকে উপলব্ধি করতে পারে। প্রথম শতকে, আলেকজান্দ্রীয় ভূগোলবিদ স্ট্র্যাবো লিখলেন :

banglainternet.com

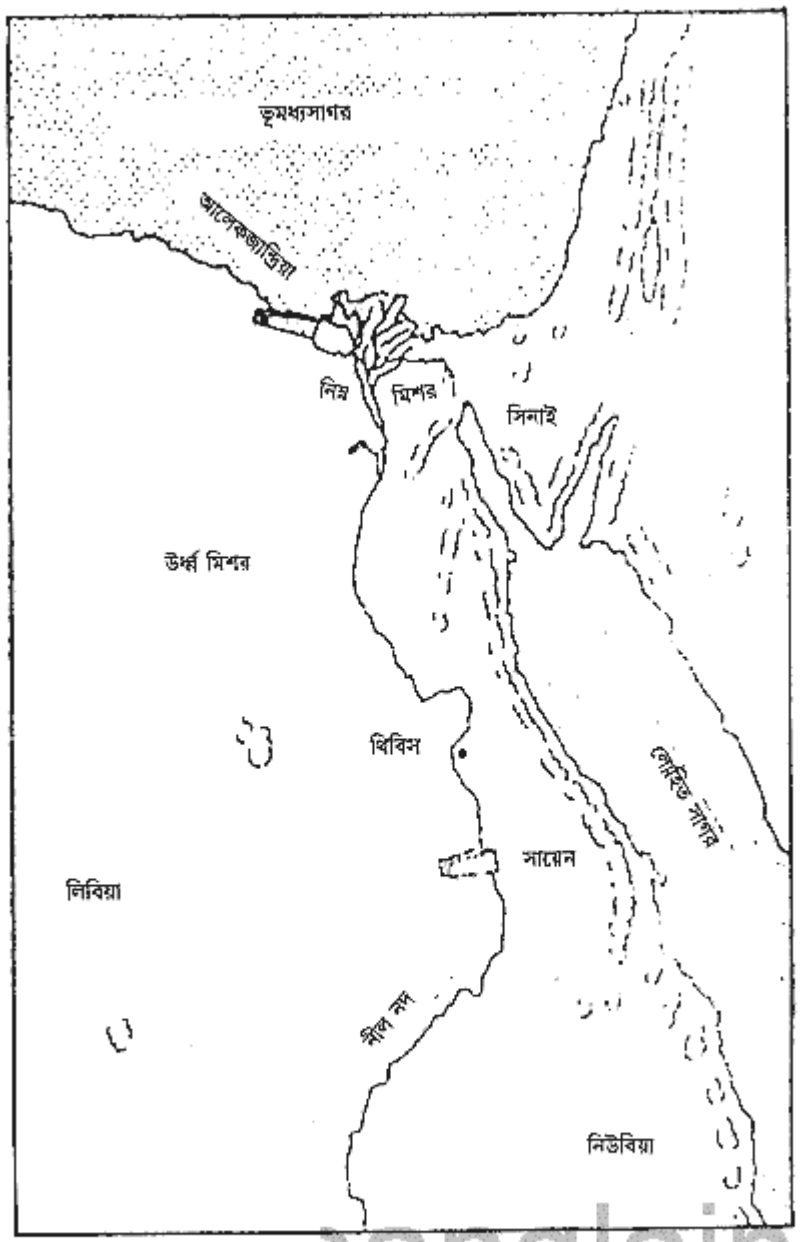

প্রাচীন মিশরের একটি সাধারণ মানচিত্র ; যখন সূর্যটি মাথার খাড়া উপরে, উল্লম্ব পিলারটির কোনো ছায়া প্রক্ষিপ্ত হয় না আলেকজান্দ্রিয়া বা সায়েনে।

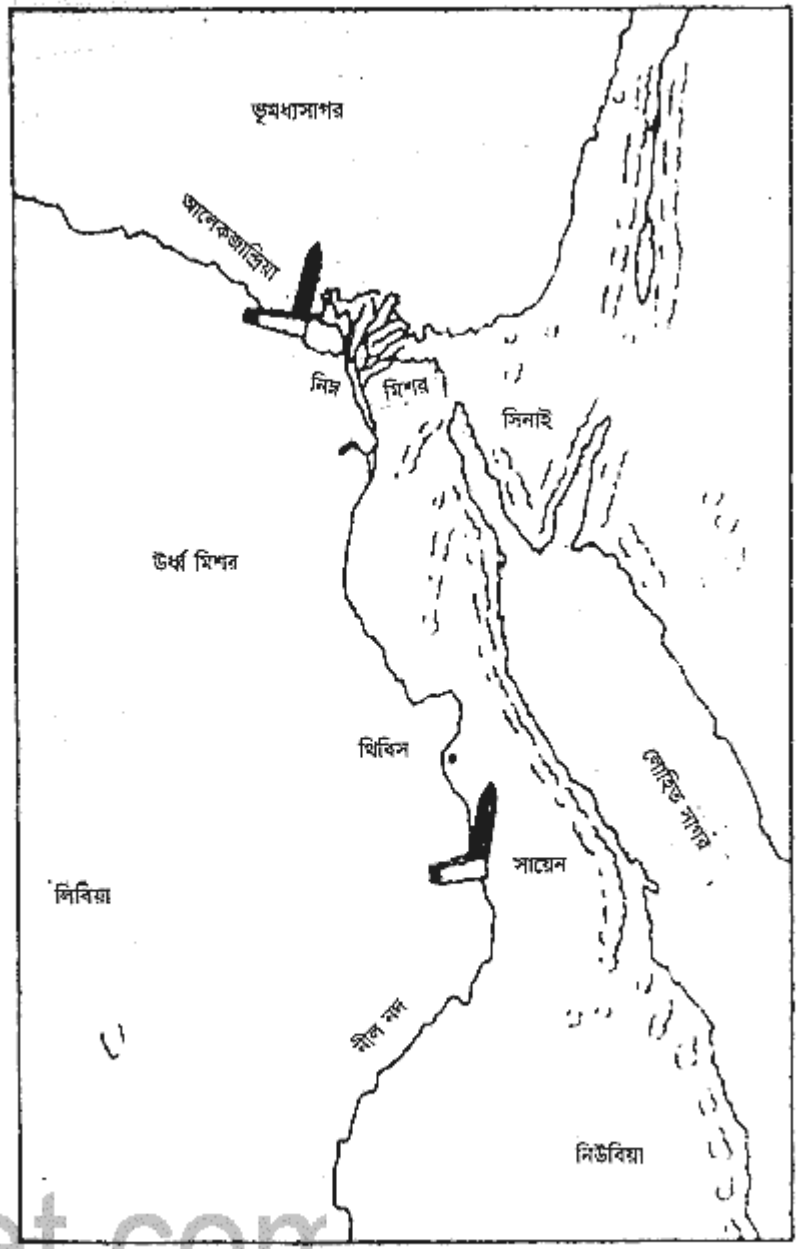

যখন সূর্যটি খাড়া উপরে নয়, প্রক্ষিপ্ত হয় সমান দৈর্ঘ্যের ছায়া।

banglainternet.com

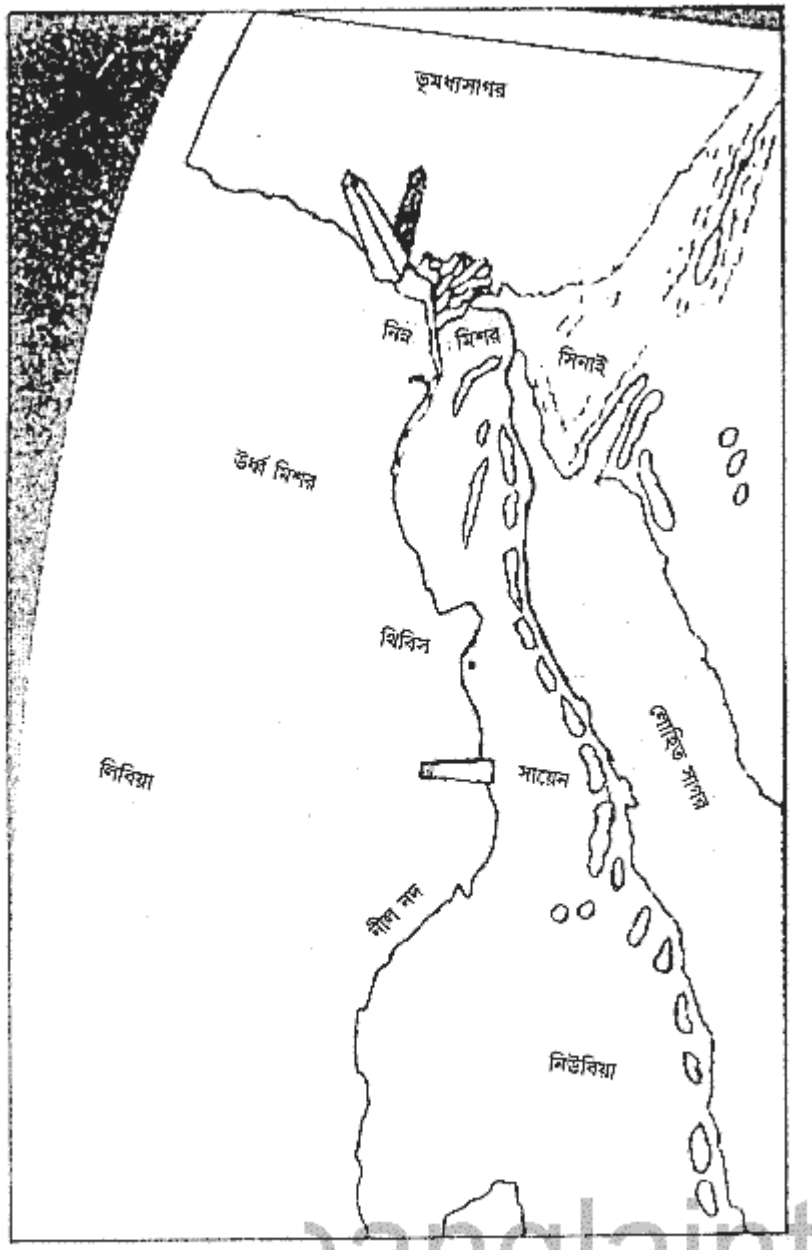

যখন মানচিত্রটিকে বাঁকা করা হল, সূর্যটি সায়েনে খাড়া মাথার উপরে, কিন্তু আলেকজান্দ্রিয়াতে নয়; তখন সায়েনে কোনো ছায়া প্রক্ষিপ্ত হয় না, তবে আলেকজান্দ্রিয়াতে প্রক্ষিপ্ত হয় একটি বড়ো ছায়া।

> যারা নৌপথে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণের প্রচেষ্টা থেকে ফিরে এসেছেন তারা বলেন না যে, তারা কোনো বিরুদ্ধ মহাদেশ দ্বারা বাধাগ্রস্ত হয়েছিলেন, কারণ সমুদ্র থাকত যথার্থভাবে উন্মুক্ত, উপরন্তু তাদের ছিল দৃঢ় প্রতিজ্ঞার অভাব ও সঞ্চয়ের ঘাটতি।... এরাটোস্থেনেস বলেন যে, আটলান্টিক সাগরের সীমা যদি কোনো প্রতিবন্ধক না হত, আমরা অনায়াসে সমুদ্রপথে আইবেরিয়া থেকে ভারতে যেতে পারতাম...। এটি খুবই সম্ভব যে, নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে একটি বা দুটি বাসযোগ্য পৃথিবী থেকে যেতে পারে।...প্রকৃতই, যদি [পৃথিবীর এই অংশটি] বসতিময় হয়ে থাকে তবে, তবে তা আমাদের অংশে যেরকম মানুষের বসতি রয়েছে সেরকম কোনো মানুষ দ্বারা সম্পন্ন হয়নি এবং আমাদেরকে আর একটি বসতিময় পৃথিবী বলে বিবেচনা করতে হবে।

মানবজাতি যখন অভিযান শুরু করল, তখন সকল অর্থেই, তার উদ্দেশ্য ছিল অন্যকোনো পৃথিবী।

পৃথিবীর পরবর্তী অভিযানসমূহ ছিল এক বিশ্বব্যাপী প্রচেষ্টা, এমনকি চীন এবং পলিনেশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত। এর চূড়ান্ত প্রাপ্তি ছিল, অবশ্যই, ক্রিস্টোফার কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কার এবং পরবর্তী কয়েক শতাব্দী ধরে অভিযানসমূহ যা পৃথিবীর ভৌগলিক অনুসন্ধান সম্পন্ন করে। কলম্বাসের প্রথম অভিযাত্রাটি সরাসরিভাবে সম্পর্কিত ছিল এরাটোস্থেনের হিসেবের সাথে। কলম্বাসের আগ্রহ ছিল "ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অভিযানসমূহ"-এর প্রতি, জাপান, চীন ও ভারতে পৌঁছানোর এক প্রকল্প, আফ্রিকার উপকূল রেখা অনুসরণ করে এবং পূর্বদিকে পাল তুলে নয়, অজানা 'পশ্চিমা' সমুদ্রে সাহসী অভিযান চালিয়ে—অথবা বিস্ময়কর পূর্বজ্ঞান সম্পন্ন এরাটোস্থেনেসের কথায়, 'সমুদ্র পথে আইবেরিয়া থেকে ভারতে যাওয়া।'

কলম্বাস ছিলেন প্রাচীন মানচিত্রের এক স্থান হতে অন্যস্থানে পর্যটনশীল যেন এক অবিশ্রান্ত পথিক এবং প্রাচীন ভূগোলবিদদের দ্বারা বা তাদেরকে নিয়ে রচিত বইসমূহের এক একনিষ্ঠ পাঠক, যাদের মধ্যে ছিলেন এরাটোস্থেনেস, স্ট্যাবো এবং টলেমি। কিন্তু 'ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অভিযান' বাস্তবায়িত করতে, এই দীর্ঘ অভিযাত্রায় জাহাজ এবং নাবিকদেরকে টিকে থাকতে হলে, এরাটোস্থেনেসের পরিমাপের চাইতে পৃথিবীটির ক্ষুদ্রতর হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল। তাই কলম্বাস তার হিসেবে প্রতারণার আশ্রয় নিলেন, যা সালামাংকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষণ বিভাগ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে। তিনি ব্যবহার করেন পৃথিবীর সম্ভাব্য ক্ষুদ্রতম পরিধি এবং তার সংগৃহীত সকল পুস্তকে উল্লেখিত এশিয়ার বৃহত্তম পূর্বমুখী বিস্তৃতি, এবং এরপর এমনকি এগুলোকেও অতিরঞ্জিত করেন। যদি তার পথিমধ্যে আমেরিকা না পড়ত, তবে কলম্বাসের অভিযান হয়ত চরমভাবে ব্যর্থ হত।

এখন পৃথিবীব্যাপী অনুসন্ধানী অভিযান সুসম্পন্ন হয়েছে। এতে আর কোনো নূতন মহাদেশ বা হারানো ভূখণ্ড থাকার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু যে প্রযুক্তি আমাদেরকে পৃথিবীর দূরতম অঞ্চলে অভিযান চালাতে এবং বসতি স্থাপনে সমর্থ করে তুলেছে তা এখন আমাদেরকে আমাদের এই গ্রহের বাইরে যাওয়ার, মহাশূন্যে অভিযান

banglainternet.com

চালানোর, অন্য গ্রহে অনুসন্ধান চালানোর ক্ষমতা দিচ্ছে। পৃথিবী ছেড়ে আমরা এখন একে উপর থেকে দেখতে সমর্থ হচ্ছি, দেখতে পাচ্ছি এরাটোস্‌থেনীয় মাত্রায় এর দৃঢ় গোলকীয় আকৃতি এবং এর মহাদেশসমূহের সীমানা এবং এটি নিশ্চিত করছে যে, প্রাচীন মানচিত্র অংকনকারীদের অনেকেই ছিলেন যথেষ্ট দক্ষ। এমন একটি দৃশ্য এরোটোস্‌থেনেস এবং অন্যান্য আলেকজান্দ্রীয় ভূগোলবিদদেরকে কত আনন্দই না দিতে পারত।

খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০ সনের দিকে শুরু হয়ে ছয়শত বছর ধরে এক গুরুত্বপূর্ণ অর্থে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক যে উৎকর্ষের সূত্রপাত ঘটেছিল এবং যা আজকে আমাদেরকে পরিচালিত করেছে মহাশূন্যের বেলাভূমিতে, তা সূচিত হয়েছিল আলেকজান্দ্রিয়াতে। কিন্তু বিস্ময়কর সেই মর্মরপ্রস্তরের নগরীর রূপ ও গৌরবের কিছুই এখন আর অবশিষ্ট নেই। অত্যাচার ও জ্ঞানের প্রতি আতংকের কারণে সেই প্রাচীন আলেকজান্দ্রিয়ার প্রায় সব স্মৃতি আজ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এর জনসংখ্যায় ছিল চমৎকার বৈচিত্র্য। ম্যাসেডোনীয় এবং পরবর্তীতে রোমান সৈন্যগণ, মিশরীয় ধর্মযাজকগণ, গ্রিক সম্ভ্রান্তগণ, ফিনিশীয় নাবিকগণ, ইহুদি বনিকগণ, ভারত এবং সাব-সাহারা অঞ্চলের ভ্রমণকারিগণ—সকলেই, কেবলমাত্র বিশাল ক্রীতদাস শ্রেণী ব্যতীত, আলেকজান্দ্রিয়ার মহান কালের প্রায় বেশির ভাগ সময় ধরে—একত্রে বাস করতেন সম্প্রীতি ও পারস্পারিক সম্মানের মাঝে।

নগরীটির প্রতিষ্ঠাতা হলেন মহামতি আলেকজান্ডার এবং এটি নির্মিত হয়েছিল তার প্রাক্তন দেহরক্ষী কর্তৃক। আলেকজান্ডার উৎসাহিত করলেন ভিনদেশী সংস্কৃতির প্রতি সম্মান দেখানোকে এবং জ্ঞানের উন্মুক্ত-মন অনুসন্ধানকে। ঐতিহ্য অনুযায়ী—এবং এটি প্রকৃতই ঘটেছিল কিনা তাতে তেমন কিছু যায় আসে না— পৃথিবীর প্রথম ডাইভিং বেল-এ তিনি অবতরণ করেন লোহিত সাগরের নিচে। তিনি তার সেনাপতি এবং সৈন্যদেরকে উৎসাহিত করেন পারস্যদেশীয় এবং ভারতীয় নারীদেরকে বিয়ে করার জন্য। তিনি সম্মান দেখালেন অন্যান্য জাতির দেবতাদের প্রতি। তিনি সংগ্রহ করেন ভিনদেশী প্রাণী, তার শিক্ষক এরিস্টটলের জন্য একটি হাতিসহ। তার নগরীটি নির্মিত হল এক অমিত মাত্রায়, জগতের সকল ব্যবসা, সংস্কৃতি ও শিক্ষার কেন্দ্র রূপে। এটি সুষমামণ্ডিত হল ত্রিশ মিটার চওড়া মহাসড়ক, অভিজাত স্থাপত্য এবং ভাস্কর্য, আলেকজান্ডারের স্মারক সমাধি, এবং প্রাচীন পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্যের অন্যতম, ফ্যারোস নামে এক বিশাল আলোক-ঘর দ্বারা।

কিন্তু আলেকজান্দ্রিয়ার শ্রেষ্ঠতম বিস্ময় ছিল এর লাইব্রেরি এবং এর সংলগ্ন জাদুঘর (আক্ষরিক অর্থেই এমন এক প্রতিষ্ঠান, যা নয়জন মিউজের বিশেষত্বের প্রতি উৎসর্গীকৃত)। সেই প্রবাদপ্রতিম লাইব্রেরির, সর্বোচ্চ যা কিছু আজ টিকে আছে তা সেরাপিউমের এক স্যাঁতসেঁতে ও বিস্মৃত প্রায় ভূগর্ভস্থ ঘর, লাইব্রেরির সংলগ্ন অংশ, একদা ছিল এক মন্দির এবং পরবর্তীতে জ্ঞানের প্রতি উৎসর্গীকৃত। কিছু ক্ষয়িষ্ণু তাক হয়ত এর একমাত্র ভৌত অবশিষ্ট। তথাপি এই স্থানটি ছিল এই গ্রহের

সর্বশ্রেষ্ঠ নগরীর মস্তিষ্ক ও গৌরব, পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম প্রকৃত গবেষণা প্রতিষ্ঠান। এই লাইব্রেরির বিদ্বজ্জনেরা জ্ঞানার্জন করেন পুরো 'কসমস' নিয়ে। 'কসমস' একটি গ্রিক শব্দ যা ব্যবহৃত হয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে বোঝাতে। এক অর্থে এটি হল 'ক্যাওস'-এর বিপরীত। এটি সূচিত করে সকল বস্তুর গভীর আন্তঃসংযোগকে। মহাবিশ্বটি যে জটিল ও সূক্ষ্ম উপায়ে একত্রে গ্রন্থিত আছে এটি তার প্রতি জ্ঞাপন করে ভয় ও শ্রদ্ধামিশ্রিত সম্মানবোধ। এখানে ছিলেন বিদ্বজ্জনদের এক সম্প্রদায়, যারা চর্চা করতেন পদার্থ বিজ্ঞান,সাহিত্য, চিকিৎসা বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা এবং প্রকৌশল। বিজ্ঞান ও মনীষার উদ্ভব ঘটল যুগপৎ। সেখানে বিকাশ ঘটল প্রতিভার। আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরি হল সেই স্থান যেখানে মানুষ প্রথমবারের মতো গুরুত্বের সাথে ও সুশৃঙ্খলভাবে সংগ্রহ করল বিশ্বের জ্ঞান।

এরাটোস্‌থেনেস ব্যতীত, ছিলেন জ্যোতির্বিদ হিপ্পারেকাস, যিনি নক্ষত্রলোকের মানচিত্র অংকন করেন এবং নক্ষত্ররাজির উজ্জ্বলতা পরিমাপ করেন ; ছিলেন ইউক্লিড, যিনি চমৎকারভাবে বিধিবদ্ধ করেন জ্যামিতিকে এবং একটি কঠিন জ্যামিতিক সমস্যায় পড়ে তার রাজাকে বললেন, 'জ্যামিতিতে প্রবেশের কোনো রাজকীয় রাস্তা নেই' ; থ্রেসের ডিয়োনিসাস, যিনি সংজ্ঞায়িত করেন পদ এবং ভাষার পাঠের ক্ষেত্রে তা-ই সম্পন্ন করেন যা, ইউক্লিড করেছিলেন জ্যামিতির ক্ষেত্রে ; শারীরবৃত্তবিদ হেরোফিলাস, যিনি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করেন যে, মন নয়, মস্তিষ্কই হল বুদ্ধিমত্তার কেন্দ্র ; আলেকজান্দ্রিয়ার হেরণ, যিনি ছিলেন গিয়ার ট্রেন ও স্টিম ইঞ্জিনের উদ্ভাবক এবং 'Automato'-র লেখক, যা রোবটের উপর প্রথম গ্রন্থ ; পার্গার অ্যাপোলোনিয়াস, যিনি সেই গণিতবিদ যিনি কোনকাকৃতি* (cone) ছেদসমূহ ব্যাখ্যা করেন—উপবৃত্ত, পরাবৃত্ত এবং অধিবৃত্ত—সেইসব বক্ররেখা, এখন আমরা জানি, যেগুলো বরাবর আবর্তিত হয় গ্রহ, ধূমকেতু ও নক্ষত্রসমূহ ; আর্কিমিডিস, লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির পূর্ব পর্যন্ত যন্ত্র কৌশলে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভা ; জ্যোতির্বিদ ও ভূগোলবিদ টলেমি, যিনি আজকের যুগের জ্যোতিষ-তত্ত্বের অপবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিকেই প্রকাশ করেন : তার পৃথিবী-কেন্দ্রিক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ধারণাটি সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করল ১৫০০ বৎসর ধরে, এটি তা-ই, মনে করিয়ে দেয় যে, চরম ভুলের বিরুদ্ধে বুদ্ধিবৃত্তিক দক্ষতা কোনো নিশ্চয়তাই নয়। সেইসব মহান মানবদের মাঝে ছিলেন হাইপেশিয়া নামে এক মহান মানবী, গণিতবিদ ও জ্যোতির্বিদ, লাইব্রেরিটির শেষ আলোক বর্তৃকা, যার আত্মাহুতি সম্পন্ন হয়েছিল লাইব্রেরিটির ধ্বংসের সাথে, এর প্রতিষ্ঠার সাত শতাব্দী পরে, যে কাহিনীটিতে পরে আমরা আবার ফিরে আসব।

* এরূপ বলা হয়ে থাকে এ কারণে যে, কোনো কোনককে বিভিন্ন কোণে টুকরা করে এদেরকে তৈরি করা যায়। প্রথমবারের মতো গ্রহসমূহের গতি অনুধাবনের জন্য আঠারো শতাব্দী পর, কোনকাকৃতি ছেদসমূহের উপর অ্যাপোলোনিয়াসের রচনাসমূহকে প্রয়োগ করলেন জোহানেস কেপলার।

banglainternet.com

মিশরের গ্রিক রাজাগণ, যারা ছিলেন আলেকজান্ডারের উত্তরাধিকারী, তারা জ্ঞান সম্বন্ধে ছিলেন অত্যুৎসাহী। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তারা সমর্থন জোগালেন গবেষণা কর্মের প্রতি এবং কালের শ্রেষ্ঠ চিন্তা-নায়কদের জন্য লাইব্রেরিটিতে ব্যবস্থা করলেন এক চমৎকার ও অনুকূল পরিবেশের। এর ভেতর ছিল দশটি বিশাল গবেষণাগার, যাদের প্রতিটি নিবেদিত ছিল একটি স্বতন্ত্র বিষয়ের জন্য ; ঝরনা ও সারিবদ্ধ স্তম্ভ ; বোটানিক্যাল গার্ডেন, একটি চিড়িয়াখানা; ব্যবচ্ছেদ কক্ষসমূহ ; একটি মানমন্দির ; এবং একটি বিশাল ভোজকক্ষ, অবসরে যেখানে বিভিন্ন ধারণার উপর অনুষ্ঠিত হত জটিল আলোচনা।

লাইব্রেরিটির প্রাণকেন্দ্র ছিল এর গ্রন্থের বিশাল সংগ্রহ। এর সংগঠকগণ অনুসন্ধান করে বেড়ালেন পৃথিবীর সকল সংস্কৃতি ও ভাষাকে। তারা তাদের এজেন্টদেরকে বিদেশে পাঠালেন বিভিন্ন লাইব্রেরি ক্রয় করার জন্য। আলেকজান্দ্রিয়াতে যে সকল বাণিজ্যিক জাহাজ ভিড়ত সেগুলোতে অনুসন্ধান চালাত পুলিশ—কোনো নিষিদ্ধ বস্তুর জন্য নয়, বইয়ের জন্য। ধার করে নিয়ে আসা হত লেখার চামড়ার ফালিসমূহ, এবং অনুলিপি সম্পন্ন করে এগুলোকে ফিরিয়ে দেয়া হত এদের স্বত্বাধিকারীদের কাছে। সঠিক সংখ্যাটি অনুমান করা কঠিন, তবে সম্ভবত লাইব্রেরিটিতে ছিল প্রায় অর্ধ মিলিয়ন গ্রন্থের ভলিয়্যম, যাদের প্রতিটি ছিল এক একটি হস্ত লিখিত প্যাপিরাসের পাণ্ডুলিপি। কী ঘটল সেসকল গ্রন্থের ? যে ক্ল্যাসিক্যাল সভ্যতা এগুলোকে সৃষ্টি করেছিল তা ভেঙে পড়ল, এবং লাইব্রেরিটিকে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে ধ্বংস করে ফেলা হল। এর কাজসমূহের কেবল এক ক্ষুদ্র খণ্ডাংশই টিকে থাকল, এর অতি স্বল্পসংখ্যক বেদনাময় বিচ্ছিন্ন অংশসহ। এবং সেই ক্ষুদ্র অংশসমূহ কতটা বিস্ময়কর ! উদাহরণ স্বরূপ, আমরা জানি যে, লাইব্রেরির তাকে স্যামোসের জ্যোতির্বিদ অ্যারিস্টার্কাসের একটি গ্রন্থ ছিল, যিনি বলেন যে, পৃথিবীটি সেই গ্রহসমূহের অন্যতম যারা সূর্যের চারদিকে আবর্তনরত, এবং নক্ষত্রসমূহ অতি দূরে অবস্থিত। এই উপসংহারগুলোর প্রতিটিই পুরোপুরি সঠিক, কিন্তু এর পুনঃআবিষ্কারের জন্য আমাদেরকে অপেক্ষা করতে হয়েছে প্রায় দু হাজার বছর। অ্যারিস্টার্কাসের এই কাজের ধ্বংসের জন্য আমাদের বোধকে আমরা যদি শত হাজার গুণ বৃদ্ধি করি, তখন আমরা ক্ল্যাসিক্যাল সভ্যতার অর্জনের মহিমা ও এর ধ্বংসের ট্র্যাজেডিকে উপলব্ধি করতে শুরু করি।

প্রাচীন পৃথিবীর কাছে পরিচিত বিজ্ঞানকে আমরা অতিক্রম করে এসেছি অনেক দূরে। কিন্তু আমাদের ঐতিহাসিক জ্ঞানে রয়েছে অপূরণীয় শূন্যস্থান। ভেবে দেখুন আমাদের অতীত নিয়ে কত রহস্যকেই সমাধান করা যেত আলেকজান্দ্রীয় লাইব্রেরির কোনো কার্ডধারীর মাধ্যমে। আমরা জানতে পারি তিন খণ্ডে রচিত পৃথিবীর ইতিহাস সংক্রান্ত একটি গ্রন্থকে, যা এখন হারিয়ে গেছে, এবং যা রচিত হয়েছিল এক ব্যাবলনীয় পুরোহিত কর্তৃক। প্রথম খণ্ডটি সৃষ্টি হতে মহাপ্লাবন পর্যন্ত সময় ব্যবধি সম্পর্কিত, যাকে তিনি ৪৩২,০০০ বৎসরের এক ব্যাপ্তিকাল বলে

বিবেচনা করেছিলেন অথবা 'ওল্ড টেস্টামেন্ট'-এর কালানুক্রম অপেক্ষা একশত গুণ দীর্ঘতর। আমি বিস্মিত হই এর মাঝে কী ছিল তা ভেবে।

প্রাচীন কালের মানুষেরা জানত যে, পৃথিবী খুবই প্রাচীন। তারা অনুসন্ধানী দৃষ্টি দিতে চেয়েছিল দূর অতীতে। এখন আমরা জানি যে, তারা যতটুকু ভেবেছিল 'মহাবিশ্ব'টি তার চাইতে অনেক বেশি প্রাচীন। আমরা মহাশূন্যে পরীক্ষা করেছি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে এবং দেখেছি যে, আমরা বাস করি ধূলিকণার মাঝে যেগুলো এক তমসাচ্ছন্ন গ্যালাক্সির দূরতম প্রান্তে ঘিরে আছে এক গতানুগতিক নক্ষত্রকে। এবং মহাশূন্যের বিশালতার মাঝে আমরা যদি হই এক ক্ষুদ্র কণা, কালের বিস্মৃত ব্যাপ্তিতে আমরা কেবল একটি মুহূর্তকেই ধারণ করি। এখন আমরা জানি যে, আমাদের বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অথবা কমপক্ষে এর অতি সাম্প্রতিক অবয়বটি—প্রায় পনেরো বা বিশ বিলিয়ন বছরের পুরনো। এই সময়টি এক বিস্ময়কর বিস্ফোরণের ঘটনা 'বিগ ব্যাং' এর পর হতে বিবেচিত। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সূচনালগ্নে ছিল না কোনো গ্যালাক্সি, নক্ষত্র বা গ্রহ, কোনো প্রাণ বা সভ্যতা, বড়জোড় এক সুষম, বিকিরণশীল অগ্নিপিণ্ড যা পরিপূর্ণ ছিল শূন্যে। 'বিগ ব্যাং'-এর 'ক্যাওস' হতে 'মহাবিশ্ব' পর্যন্ত পথটি, যাকে আমরা জানতে শুরু করেছি তা পদার্থ ও শক্তির ভয়ংকরতম রূপান্তর, যেগুলোর প্রতি আমরা দৃষ্টি নিক্ষেপের সুযোগ পেয়েছি। এবং যতদিন না অন্যত্র আমরা খুঁজে পাচ্ছি অধিকতর বুদ্ধিমান প্রাণী, সকল রূপান্তরের মধ্যে আমরা নিজেরাই সবচেয়ে চমৎকার রূপান্তর—'বিগ ব্যাং'-এর সুদূর উত্তরাধিকারী, যারা উৎসর্গীকৃত হয়েছি অনুধাবনের উদ্দেশ্যে এবং আরো রূপান্তর ঘটাচ্ছি মহাবিশ্বটির, যা থেকে আমরা জাত।

banglainternet.com

দ্বিতীয় অধ্যায়
মহাজাগতিক সংগীতের মাঝে একটি কণ্ঠস্বর

> এই পৃথিবীতে কখনো বাস করেছিল সম্ভবত এমন সকল প্রাণশীল সৃষ্টি এসেছে কোনো এক আদি রূপ থেকে, যার মধ্যে প্রথম সঞ্চারিত হয়েছিল প্রাণ...। প্রাণের এই দৃষ্টিভঙ্গিতে রয়েছে এক মহিমা... যে, যখন এই গ্রহটি মহাকর্ষের নির্দিষ্ট সূত্র মেনে আবর্তিত হতে থাকল, অতি সাধারণ সূচনা থেকে অতি চমৎকার ও বিস্ময়কর রূপসমূহ বিবর্তিত হতে লাগল।
>
> চার্লস ডারউইন, দ্য অরিজিন অব স্পিসিস, ১৮৫৯।

আমার সারাটি জীবন ধরে আমি বিস্ময়ে ভেবেছি অন্য কোথাও প্রাণের অস্তিত্বের সম্ভাবনা নিয়ে। এটি কিরূপ হবে ? এটি কী দ্বারা গঠিত হবে ? আমাদের গ্রহে সকল প্রাণশীল বস্তু গঠিত হয় জৈব অণু দ্বারা—জটিল আণুবীক্ষণিক কাঠামো যাতে কার্বন অণু পালন করে কেন্দ্রীয় ভূমিকা। প্রাণের আবির্ভাবের পূর্বে একদা এমন একটি সময় ছিল, যখন পৃথিবী ছিল শূন্য ও একাকী। এখন আমাদের পৃথিবী প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরপুর। এটি কীভাবে শুরু হল ? প্রাণের অনুপস্থিতিতে কার্বন ভিত্তিক মৌলসমূহ কীভাবে তৈরি হল ? কীভাবে প্রথম প্রাণশীল বস্তুসমূহ জেগে উঠল ? কীভাবে প্রাণ বিবর্তিত হয়ে সৃষ্টি করল আমাদের মতো ব্যাপ্ত ও জটিল প্রাণরূপ, যারা নিজেদের আদি অবস্থার রহস্য উদ্‌ঘাটনে সচেষ্ট হল ? এবং অন্য সব অসংখ্য গ্রহে, যারা অন্যান্য নক্ষত্রকে আবর্তন করছে তাদের রয়েছে কি প্রাণ ? যদি বহির্জাগতিক প্রাণ থেকেই থাকে তবে, তা পৃথিবীর প্রাণ যে সকল জৈব অণু দ্বারা গঠিত, সেগুলো দ্বারাই কি গঠিত ? অথবা তারা কি বিস্ময়করভাবে ভিন্নতর—অন্যরকম পরিবেশে অন্যরকম অভিযোজনের মাধ্যমে। পৃথিবীতে প্রাণের প্রকৃতি এবং অন্য কোথাও প্রাণের অনুসন্ধান একই প্রশ্নের দুটো ভিন্ন দিক—আমাদের আত্ম-পরিচয়ের অনুসন্ধান।

নক্ষত্রসমূহের মধ্যবর্তী বিস্তৃত অন্ধকারের মাঝে রয়েছে গ্যাস, ধূলিকণা ও জৈব পদার্থসমূহের মেঘাবরণ। বেতার দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে সেখানে সন্ধান পাওয়া গেছে ডজন ডজন বিভিন্ন জৈব অণুর। এই অণুসমূহের প্রাচুর্য এটিই নির্দেশ করে যে, সর্বত্রই বিরাজ করছে প্রাণের উপাদান। সম্ভবত প্রাণের উৎপত্তি ও বিবর্তন হল এক মহাজাগতিক অনিবার্যতা। 'মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সি'-র বিলিয়ন বিলিয়ন গ্রহের

মাঝে কতকগুলোতে হয়ত কখনোই বিকশিত হবে না প্রাণ। অন্যগুলোতে, এটি হয়ত বিকশিত হয় এবং ধ্বংস হয়ে যায়, অথবা এর সরলতম রূপ হতে কখনোই বিবর্তিত হয় না। এবং গ্রহসমূহের অতি অল্প কিছু ভগ্নাংশে হয়ত উদ্ভব ঘটেছে এমন সব বুদ্ধিমান সত্তা ও সভ্যতার, যেগুলো আমাদেরটির তুলনায় উন্নততর।

মাঝে মাঝে অনেকেই মন্তব্য করেন যে, এটি কত সৌভাগ্যপ্রসূত মিল যে পৃথিবী প্রাণের জন্য যথার্থই উপযোগী—সহনীয় তাপমাত্রা, তরল পানি, অক্সিজেনের বায়ুমণ্ডল, এবং এরকম আরো অনেক কিছু। কিন্তু এটি, কমপক্ষে আংশিক হলেও, কারণ ও ফলাফলের এক অনিশ্চয়তা। আমরা পৃথিবীবাসীরা পৃথিবীর পরিবেশের সাথে চমৎকারভাবে অভিযোজিত, কারণ এখানেই আমরা বেড়ে উঠেছি। প্রাণের যে সকল আদি রূপ ঠিক মতো অভিযোজিত হতে পারেনি তারা ধ্বংস হয়ে গেছে। আমরা সেই সকল প্রাণ-সত্তা থেকে উদ্ভূত যারা সুনিপুণভাবে এটি করতে পেরেছিল। সম্পূর্ণ ভিন্নতর জগতে যে সকল প্রাণ-সত্তা বিবর্তিত হয় তাদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

পৃথিবীর সকল প্রাণই নিবিড়ভাবে পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত। আমাদের রয়েছে এক সাধারণ জৈব রসায়ন এবং এক সাধারণ বিবর্তনের উত্তরাধিকার। এ কারণে, আমাদের জীববিজ্ঞানীরা চরমভাবে সীমাবদ্ধ। তারা কেবল এক প্রকারের জীববিজ্ঞানই পাঠ করেন, প্রাণের সুরের কেবল একটিমাত্র বিষয় বস্তু। এই বিষণ্ন ও কর্কশ সুরটিই হাজার হাজার আলোক-বর্ষের মাঝে একমাত্র কণ্ঠস্বর ? অথবা রয়েছে কী এক মহাজাগতিক সংগীত, যাতে রয়েছে বিচিত্র বিষয়বস্তু ও শ্রুতিমধুর সুরের মিশ্রণ, সুরের অনৈক্য ও ঐকতান, নাকি গ্যালাক্সির প্রাণ-সংগীতে সুর তুলছে কোটি কোটি ভিন্ন ভিন্ন কণ্ঠস্বর ?

পৃথিবীতে প্রাণ-সংগীতের একটি ক্ষুদ্র ছত্র সম্বন্ধে আমাকে বলতে হচ্ছে একটি কাহিনী। ১১৮৫ সনের কথা, তখন জাপানের সম্রাট ছিলেন অ্যানটকু নামের সাত বছর বয়সের এক বালক। তিনি ছিলেন এক সামুরাই গোত্র, হেইকির নামমাত্র নেতা, যারা অপর এক সামুরাই গোত্র, জেন্‌জির সাথে এক দীর্ঘস্থায়ী ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। প্রত্যেক গোত্রই রাজ সিংহাসনের জন্য দাবি করল নিজেদের এক অধিকতর যোগ্য উত্তরাধিকার। তাদের মধ্যে চূড়ান্ত নৌ যুদ্ধটি, যেখানে সম্রাট ছিলেন জাহাজে, সংঘটিত হয়েছিল জাপানের ইনল্যান্ড সমুদ্রের দ্যানো-ইউরাতে, ১১৮৫ সনের ২৪ এপ্রিল। হেইকিরা সংখ্যায় এবং কৌশলে পরাস্ত হল। মারা গেল অনেকেই। যারা বেঁচে থাকল প্রচুর সংখ্যায় ঝাঁপিয়ে পড়ল সমুদ্রে এবং ডুবে মারা গেল। সম্রাটের পিতামহী, লেডি নায়ি স্থির সংকল্প হলেন যে, তিনি এবং অ্যানটকু যেন শত্রুর হাতে ধরা না পড়েন। এরপর কী ঘটল তা বর্ণিত আছে 'দ্য টেল অব দ্য হেইকি'-তে :

banglainternet.com

তখন সম্রাটের বয়স সাত বছর হলেও তাকে দেখাত অপেক্ষাকৃত বয়স্ক। তিনি এতটাই সুন্দর ছিলেন যে, তার শরীর থেকে যেন বিকীর্ণ হত এক ঔজ্জ্বল্য এবং তার দীর্ঘ কালো চুল তার পৃষ্ঠদেশের নিচে নেমে থাকত। চোখে এক বিস্ময় এবং চেহারায় উদ্বেগের চিহ্ন নিয়ে তিনি লেডি নায়িকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি আমাকে কোথায় নিয়ে যেতে চান?'

তিনি ফিরে তাকালেন তরুণ সম্রাটের দিকে। তখন তার গাল বেয়ে অঝোর ধারায় নেমে আসছিল অশ্রুরাশি, এবং... তাকে সান্ত্বনা দিলেন, তার দীর্ঘ চুল তার ছাই-রং পোশাকে বেঁধে দিয়ে। দুচোখ ছাপানো অশ্রুতে ভেসে, শিশু সম্রাট তার সুন্দর, ছোটো হাতদুটো একত্রিত করলেন। আইসের দেবতার কাছ থেকে বিদায় নেয়ার জন্য তিনি প্রথমে ফিরলেন পূর্ব দিকে এবং অতঃপর নেমবাটসু [অ্যামিডা বুদ্ধের কাছে এক প্রার্থনা']-টি পুনরাবৃত্তি করার জন্য ফিরলেন পশ্চিমে। লেডি নায়ি তাকে দৃঢ়ভাবে নিলেন তার বাহু বন্ধনে এবং 'মহাসাগরের গভীরতার মাঝেই আমাদের মুক্তি',—এই কথা বলে তাকে নিয়ে অবশেষে ডুবে গেলেন তরঙ্গমালার তলদেশে।

সম্পূর্ণ হেইকি নৌবহরটি ধ্বংস হয়ে গেল। কেবল তেতাল্লিশ জন নারী বেঁচে গেল। রাজপ্রাসাদের এই রাজ-সহচরী নারীদেরকে যুদ্ধক্ষেত্রের অদূরে জেলেদের কাছে ফুল ও অন্যান্য সুগন্ধি সামগ্রী বিক্রয় করতে বাধ্য করা হল। হেইকিরা ইতিহাস হতে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। কিন্তু প্রাক্তন রাজ-সহচারীদের একটি উগ্র দল ও জেলে সম্প্রদায়ের ঔরসে তাদের সন্তান সন্ততিরা যুদ্ধটির স্মরণে একটি উৎসবের প্রচলন করে। এটি প্রতি বছর ২৪ এপ্রিলে অনুষ্ঠিত হয়। যে সকল জেলে হেইকিদের উত্তরাধিকারী তারা পরিধান করে শন এবং কালো পাগড়ি এবং এগিয়ে যায় অ্যাকামা তীর্থস্থানে যা ধারণ করে মৃত সম্রাটের সমাধিকে। সেখানে তারা উপভোগ করে একটি নাটক, যা দ্যানো-ইউরা যুদ্ধের অব্যবহিত পরের ঘটনাসমূহকে চিত্রায়িত করে। এরপর শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে, জনগণ কল্পনা করত যে, তারা উপলব্ধি করতে পারত প্রেতরূপী সামুরাই সৈন্যদেরকে যারা বৃথা চেষ্টা করছিল সমুদ্র সেচে ফেলার জন্য, একে রক্ত, পরাজয় ও অপমানের যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে।

জেলেরা বলে যে, হেইকি সামুরাইরা এখনো ইতস্তত ঘুরে বেড়ায় ইনল্যান্ড সমুদ্রের তলদেশে—কাঁকড়া রূপে। এখানে পাওয়া যায় এমন সব কাঁকড়া যাদের পৃষ্ঠদেশে রয়েছে কৌতূহলোদ্দীপক চিহ্ন, নকশা ও খাঁজ যেগুলো এক সামুরাইয়ের মুখাবয়বের সাথে অদ্ভুত সাদৃশ্য বহন করে। যখন ধরা পড়ে, এসব কাঁকড়াকে ভক্ষণ করা হয় না, উপরন্তু এদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হয় সমুদ্রে, দ্যানো-ইউরার শোকাবহ ঘটনার স্মৃতির স্মরণে।

এই লৌকিক উপাখ্যানটি জাগিয়ে তোলে একটি আশ্চর্য সমস্যা। এটি কী করে ঘটল যে একজন যোদ্ধার মুখাবয়ব খোদিত হল একটি কাঁকড়ার খোলসে? উত্তরটি মনে হয় এই যে, মানুষেরাই মুখাবয়বটি তৈরি করেছিল। কাঁকড়ার খোলসের উপর নকশাগুলো উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। কিন্তু মানুষের মতো, কাঁকড়াতেও রয়েছে

বিভিন্ন উত্তরাধিকার রেখা। মনে করুন, দৈবাৎ এই কাঁকড়াটির সুদূর কোনো প্রজন্মে কোনো একটি জেগে উঠল, এমন এক সজ্ঞাসহ যা কিছুটা হলেও মানুষের মুখাকৃতি সম্পন্ন। এমনকি দ্যানো-ইউরার যুদ্ধের পূর্বেও জেলেরা হয়ত এরূপ কাঁকড়া খেতে অনীহা পোষণ করত। একে পুনরায় সমুদ্রে ফেলে দিয়ে তারা এক বিবর্তন প্রক্রিয়ার গতি অব্যাহত রাখল : যদি তুমি কোনো কাঁকড়া হও এবং তোমার বাহ্যিক অবয়ব হয় সাধারণ, মানুষেরা তোমাকে খেয়ে ফেলবে। তোমার রেখা থেকে জাত হবে অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যক উত্তরাধিকারী। যদি তোমার খোলস কিছুটা দেখায় মানুষের মুখমণ্ডলের মতো, তারা তোমাকে আবার, ছুঁড়ে ফেলবে সমুদ্রে। তোমার হবে অনেক বেশি উত্তরাধিকার। কাঁকড়াগুলোর নকশার কাজে যথেষ্ট অর্থেরও প্রয়োজন পড়ত। প্রজন্মান্তরে, কাঁকড়া ও জেলেদের ক্ষেত্রে সমভাবে, যেসকল কাঁকড়া কোনো সামুরাই মুখাকৃতির সাদৃশ্য সম্পন্ন হল তারা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে টিকে থাকল যতদিন না শুধু এক মানুষের মুখাকৃতি নয়, শুধু এক জাপানি মুখাকৃতি নয়, জন্ম নিল এক ভয়ংকর ও ক্রুদ্ধ সামুরাইয়ের মুখাকৃতি। কাঁকড়াগুলো কী চায় তার সাথে এসব কিছুর কোনো সম্পর্ক নেই। নির্বাচনটি আরোপিত হয় বাইরে থেকে। তুমি যতটা একজন সামুরাইয়ের মতো, তোমার টিকে থাকার সম্ভাবনা তত বেশি। শেষ পর্যন্ত, প্রচুর সংখ্যক সামুরাই কাঁকড়া বেঁচে থাকল।

একে কৃত্রিম নির্বাচন বলে। হেইকি কাঁকড়াদের ক্ষেত্রে জেলেদের দ্বারা এটি কম-বেশি বাস্তবায়িত হয়েছিল অসচেতনভাবে এবং নিশ্চিতভাবেই কাঁকড়াগুলো এই অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল কোনো সুদূর পরিকল্পনা ছাড়াই। কিন্তু মানবজাতি উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবেই নির্বাচন করল কোন উদ্ভিদ বা প্রাণীসমূহের বেঁচে থাকা উচিত এবং কোনগুলোকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে হবে হাজার হাজার বছরের জন্য। আমরা শৈশব থেকে বেড়ে উঠি পরিচিত কিছু কৃষি ও গৃহপালিত পশু, ফলমূল, গাছপালার মাঝে। এরা কোত্থেকে এল? একদা কি এরা বনের মুক্ত জীবনে অভ্যস্ত ছিল এবং অতঃপর অপেক্ষাকৃত কম শ্রমনির্ভর কৃষিজ জীবনে অভিযোজিত হতে বাধ্য হল? না, সত্যটি একেবারে ভিন্নরকম। এরা, এদের বেশিরভাগ, আমাদের হাতে সৃষ্ট।

দশ হাজার বছর পূর্বে ছিল না কোনো দুগ্ধবতী গাভী, বা শিকারি শূকর বা শস্যের বিশাল ছড়ি। যখন আমরা এই সকল উদ্ভিদ এবং প্রাণীর পূর্বসূরিদেরকে গৃহপালিত করলাম—কখনো যেসব সৃষ্টি ছিল যথেষ্ট ভিন্ন প্রকৃতির—আমরা তাদের উৎপাদনকে নিয়ন্ত্রিত করলাম। আমরা নিশ্চিত করলাম যে, কিছু সুনির্দিষ্ট জীবের, আমাদের বিবেচনায় যাদের রয়েছে কাঙ্ক্ষিত গুণাবলি, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তাদের পুনঃ-উৎপাদন বজায় রাখা হল। যখন আমরা ভেড়ার প্রতিপালনে সাহায্যের জন্য কোনো কুকুর চাইলাম, আমরা সেইসব প্রজাতিকে নির্বাচন করলাম যেগুলো ছিল বুদ্ধিমান, অনুগত এবং দলবদ্ধ পশুর ক্ষেত্রে যেগুলোর ছিল কিছু বাড়তি সুবিধা যা সেসব পশুদের ক্ষেত্রে উপযোগী যারা দলবদ্ধভাবে শিকার করে। দুগ্ধবতী গাভীর বিশাল

banglainternet.com

ক্ষীত ওলানটি দুধ ও পনিরের প্রতি মানুষের আগ্রহের ফলাফল। আমাদের শস্যদানা, অথবা ভুট্টা, উৎপাদিত হচ্ছে দশ হাজার প্রজন্ম যাবৎ, এর পূর্বপ্রজন্মের তুলনায় অধিকতর সুস্বাদু ও পুষ্টিকর করে তোলার জন্য ; এটি এতটাই পরিবর্তিত হয়ে গেছে যে, এটি এখন মানুষের ভূমিকা ব্যতীত পুনরুৎপাদনও সম্পন্ন করতে পারে না।

একটি হেইকি কাঁকড়া, একটি কুকুর, একটি গাভী বা একটি শস্যদানার জন্য কৃত্রিম নির্বাচনের সারাংশ হল—এই গাছপালা এবং প্রাণীদের অনেক শারীরিক ও আচরণগত বৈশিষ্ট্য প্রজন্ম পরম্পরায় প্রাপ্ত। তারা সত্যিই উৎপাদন ঘটায়। যে কোনো কারণেই, মানুষ কিছু প্রজাতির পুনরুৎপাদনকে উৎসাহিত করে এবং অন্যগুলোর পুনরুৎপাদনকে নিরুৎসাহিত করে। নির্বাচিত প্রজাতিটি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পুনরুৎপাদিত হয় ; এর ফলে এটির প্রাচুর্য দেখা দেয় ; নির্বাচনটি যে প্রজাতিটির বিপক্ষে গেল তা ক্রমশ বিরল এবং অতঃপর বিলুপ্ত হয়ে যায়।

কিন্তু মানুষ যদি গাছপালা এবং প্রাণীদের নতুন প্রজাতি সংরক্ষণ করতে পারে, প্রকৃতি কি অবশ্যই তা করবে না ? এই সম্পর্কিত প্রক্রিয়াকে প্রাকৃতিক নির্বাচন বলে। অপরিমেয় কাল ধরে জীবের যে মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে, জীবাশ্মের সাক্ষ্য এবং পৃথিবীতে মানুষ তার ক্ষমতার সংক্ষিপ্ত কালে প্রাণী ও উদ্ভিদে যে পরিবর্তন সাধন করেছে তা থেকে পরিষ্কার হয়ে উঠে। জীবাশ্মের উপাত্তসমূহ দ্ব্যর্থহীনভাবে আমাদের কাছে প্রকাশ করে সেই সব প্রাণীর কথা যারা একদা প্রচুর সংখ্যায় বিদ্যমান ছিল এবং যেগুলো এখন পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।* এখন যত সংখ্যক প্রজাতি পৃথিবীতে টিকে আছে তার চাইতে অনেক বেশি বিলুপ্ত হয়ে গেছে ; এরা হল বিবর্তনের সমাপ্তিসূচক পরীক্ষণ।

গৃহ প্রতিপালনের মাধ্যমে আরোপিত বংশানুগতিক পরিবর্তনসমূহ সম্পন্ন হয়েছে অতি দ্রুত গতিতে। খরগোশ গৃহপালিত হয়নি মধ্যযুগের প্রথম দিকের পূর্ব পর্যন্ত (এটির পুনঃপ্রজনন সম্পন্ন হয়েছিল ফরাসি সন্ন্যাসিগণ কর্তৃক, এই বিশ্বাসে যে, নবজাতক খরগোশগুলো ছিল মাছ এবং তাই গির্জার ক্যালেন্ডারের নির্দিষ্ট কিছু দিনে মাংস খাওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা হতে অব্যাহতি পাওয়া যেত) ; কফি পঞ্চদশ শতাব্দীতে ; চিনির বিট ঊনবিংশ শতাব্দীতে ; এবং মিঙ্ক (বেজি জাতীয় প্রাণী) এখনো রয়েছে গৃহপালিত হওয়ার প্রাথমিক পর্যায়ে। দশ হাজার বছরের কম সময়ে গৃহপ্রতিপালন ভেড়ার পশমের এক কিলোগ্রামের কম ওজনের এক অমসৃণ অবস্থা থেকে দশ বা বিশ কিলোগ্রামের মসৃণ ও সুষম অবস্থায় নিয়ে এসেছে ; অথবা একটি গাভী কর্তৃক এক দোহন ঋতুতে প্রদত্ত দুধের পরিমাণকে কয়েক শত হতে নিয়ে এসেছে এক মিলিয়ন ঘন সেন্টিমিটারে। এত অল্প সময়ে কৃত্রিম নির্বাচন যদি এতটা পরিবর্তন সাধন করতে পারে, তবে বিলিয়ন বছরের অধিক কাল ধরে ক্রিয়াশীল

* যদিও সনাতন পাশ্চাত্য ধর্মীয় মতামত দৃঢ়ভাবে বজায় রাখল এর বিপরীত অবস্থান, উদাহরণ স্বরূপ, জন ওয়েসলির ১৭৭০ এর মতামত : '[এমনকি] সবচেয়ে নগণ্য প্রজাতিটিকেও ধ্বংস করার জন্য কখনো অনুমতি দেয়া হয় না মৃত্যুকে।'

প্রাকৃতিক নির্বাচন কি করার সামর্থ্য রাখে ? এর উত্তর হল জীববিজ্ঞানের জগতের সকল সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্য। বিবর্তন হল এক সত্য, কোনো তত্ত্ব নয়।

আর বিবর্তনের কার্যসাধন পদ্ধতি হল প্রাকৃতিক নির্বাচন যা চার্লস ডারউইন ও আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেসের নামের সাথে জড়িত এক বিখ্যাত আবিষ্কার। এক শতাব্দীরও অধিক পূর্বে, তারা জোর দিয়ে বললেন যে, প্রকৃতি হল অতিউর্বর, সম্ভবত যতগুলো টিকে থাকে তার চাইতে অনেক বেশি প্রাণী ও উদ্ভিদ জন্ম নেয় এবং পরিবেশ সেইসব প্রজাতিকেই নির্বাচন করে যেগুলো, দৈবক্রমে, টিকে থাকার জন্য যোগ্যতর। পরিব্যক্তি (mutation)—বংশগতির হঠাৎ পরিবর্তন—একটির বৈশিষ্ট্যকে অপরটিতে সঞ্চারিত করে। এরা প্রদান করে বিবর্তনের কাঁচামাল। পরিবেশ নির্বাচন করে সেইসব পরিব্যক্তিকেই যেগুলো বাড়িয়ে দেয় অস্তিত্বের সম্ভাবনাকে, যার ফলে একটি প্রাণ-রূপ থেকে অন্য একটি প্রাণ-রূপে ধীর রূপান্তরের মাধ্যমে সম্পন্ন হয় নতুন প্রজাতির* উদ্ভব।

'দ্য অরিজিন অব স্পিসিস'-এ ডারউইনের বর্ণনা ছিল :

> প্রকৃতপক্ষে মানুষ সৃষ্টি করে না জীব-বৈচিত্র্য ; সে কেবল অনিচ্ছাকৃতভাবে জৈব বস্তুসমূহকে উদ্‌ঘাটিত করে প্রাণের নতুন অবস্থাগুলোর কাছে, এবং এর প্রকৃতি কাজ করে জৈব গঠনটির উপর, এবং সৃষ্টি করে বৈচিত্র্যের। কিন্তু মানুষ তার কাছে প্রকৃতি কর্তৃক প্রদত্ত বৈচিত্র্যসমূহের মাঝ থেকে নির্বাচন করতে পারে এবং করে, এবং এভাবে এদেরকে একত্রিত করে যে কোনো কাঙ্ক্ষিত রূপে। এভাবে সে তার সুবিধা বা আনন্দের জন্য অভিযোজিত করে পশুপাখি ও গাছপালাকে। এটি সে হয়ত করে পদ্ধতিসিদ্ধ উপায়ে বা সে এটি করে তার নিজের জন্য সবচেয়ে উপকারীটিকে সচেতনভাবে সংরক্ষণ করে, প্রজাতিটিতে কোনো আংশিক পরিবর্তন সাধন ছাড়াই...। গৃহপালনের ক্ষেত্রে যে নীতিগুলো এত কার্যকরভাবে প্রযোজ্য, সেগুলো কেন প্রকৃতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না, তার কোনো সুস্পষ্ট কারণ নেই... ; যতগুলো টিকে থাকতে পারে তার চাইতে অনেক বেশি সংখ্যক জন্ম ধ্বংস করে...। কোনো বয়সের বা কোনো ঋতুতে কোনো একটি প্রাণীর সামান্যতম সুবিধা, সেগুলোর উপর, যেগুলোর সাথে এটি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়, বা পরিপার্শ্বের ভৌত অবস্থাসমূহের সাথে ক্ষুদ্রমাত্রায় হলেও এর অপেক্ষাকৃত ভালো অভিযোজনটি, নিয়ামক হয়ে দাঁড়াবে।

* মায়ান পবিত্র গ্রন্থ 'পোপল ভুহ্' তে প্রাণের বিভিন্ন রূপ বর্ণিত হয়েছে মানুষ সৃষ্টি করার পথে পরীক্ষণের জন্য ঈশ্বরের পূর্বানুরাগের ব্যর্থ প্রয়াস রূপে। প্রথম প্রচেষ্টাগুলো লক্ষ্য থেকে অনেক বিচ্যুত ছিল, সৃষ্টি করলেন ইতর প্রাণীকুল ; লক্ষ্যটি অর্জনের পূর্ববর্তী প্রচেষ্টায় সৃষ্টি করলেন বানর। চীনা পুরাণ অনুযায়ী, পা' উন কু নামে এক দেবতার শরীরের উকুন থেকে জন্ম নিল মানুষ। অষ্টাদশ শতাব্দীতে দ্য বাফন প্রস্তাব করলেন যে, বাইবেল যা বলে পৃথিবী তার চাইতে প্রাচীনতর, অর্থাৎ প্রাণের বিভিন্ন রূপসমূহ হাজার হাজার বছর ধরে বিবর্তিত হয়েছিল, কিন্তু বানরজাতীয় প্রাণীরা ছিল মানুষের হতভাগ্য পূর্বসূরি। যদিও এই সকল মতামত ডারউইন এবং ওয়ালেস কর্তৃক বর্ণিত বিবর্তন প্রক্রিয়াকে সূক্ষ্মভাবে প্রতিফলিত করে না, এগুলো এক অনুমান করতে পেরেছিল—যেমন, ডেমোক্রিটাস, এম্পিডোক্লিস এবং অন্যান্য আদি আয়োনীয় বিজ্ঞানীরা, যাদেরকে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে সপ্তম অধ্যায়ে।

banglainternet.com

বিবর্তন তত্ত্বের পক্ষচারণ ও জনপ্রিয়করণের ক্ষেত্রে ঊনবিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে প্রভাবশালী বিজ্ঞানী টি. এইচ. হাক্সলি লিখলেন যে, ডারউইন ও ওয়ালেসের প্রকাশনাগুলো ছিল এক 'আলোর ঝলক, যেগুলো অন্ধকার রাতে নিজেকে হারিয়ে ফেলা কোনো মানুষের সামনে, হঠাৎ উন্মোচিত করে এমন এক পথ যা, তাকে সোজা তার বাড়িতে পৌঁছে দেবে কি না জানা নেই, তবে নিশ্চিতভাবেই এটি তাকে সঠিক পথেই রাখবে...। আমি যখন প্রথম 'দ্য অরিজিন অব স্পিসিস'-এর মূল ধারণাটি অনুধাবন করলাম তখন আমার প্রথম অনুভূতি ছিল, 'এরকম ভাবনা না আসাটা কি নির্বুদ্ধিতাই না প্রকাশ করে !' আমার মনে হয় যে, কলম্বাসের সঙ্গীরাও এরকমই বলেছিল...। বৈচিত্র্য, অস্তিত্বের সংগ্রাম এবং পারিপার্শ্বিকের সাথে অভিযোজনের সত্যতাসমূহ ছিল যথেষ্ট অযাচিত ; কিন্তু আমাদের কেউই ভাবল না যে, এদের ভেতর দিয়েই প্রজাতি সমস্যার পথটি চলে গেছে, যতদিন না ডারউইন এবং ওয়ালেস সেই অন্ধকারটি দূর করলেন।'

অনেকেই মর্মাহত হলেন—কেউ কেউ এখনো—বিবর্তন ও প্রাকৃতিক নির্বাচন, উভয় ধারণা দ্বারাই। আমাদের পূর্বপুরুষেরা দৃষ্টিপাত করেছিল পৃথিবীতে প্রাণের আভিজাত্যের দিকে, প্রাণীসত্তাসমূহের গঠন এদের ক্রিয়াকর্মের সাথে সাযুজ্য রেখে কত যথাযথভাবে বিদ্যমান তার দিকে এবং দেখতে পেল এক 'মহান ডিজাইনার'-এর সাক্ষ্য। সরলতম এককোষী প্রাণীসত্তাটিও সূক্ষ্ম পকেট ঘড়িটির তুলনায় অধিকতর জটিল এক যন্ত্র। এবং তথাপি পকেট ঘড়িসমূহ তাৎক্ষণিকভাবে স্ব-গঠিত বা বিবর্তিত হতে পারে না, ধীর ধাপের ভিতর দিয়ে, যেমন, পিতামহদের ঘড়ি থেকে। একটি ঘড়ি একজন ঘড়ি-প্রস্তুতকারককেই সূচিত করে। এমন মনে হত যে, অণু-পরমাণুসমূহের পক্ষে কোনোভাবে পরস্পরের সাথে তাৎক্ষণিক-একীভূতকরণের মাধ্যমে এই অসম্ভব জটিল প্রাণীসত্তা সৃষ্টি ও পৃথিবীময় তা কার্যকর হয়ে উঠার কোনো উপায় ছিল না। অর্থাৎ, প্রতিটি প্রাণশীল বস্তুই বিশেষভাবে ডিজাইন মেনে চলত, অর্থাৎ একটি প্রজাতি থেকে অন্য প্রজাতি উৎপন্ন হওয়া সম্ভব ছিল না, আর সীমিত ঐতিহাসিক উপাত্ত থেকে আমাদের পূর্ব পুরুষেরা প্রাণ সম্পর্কে যতটুকু জানতেন তা থেকে এরূপ একটি ধারণায় পৌঁছানো যথার্থভাবেই সঙ্গত ছিল। প্রতিটি প্রাণীসত্তা নিখুঁতভাবে সৃষ্টি হয়েছে একজন মহান ডিজাইনারের হাতে—এই ধারণাটি প্রকৃতির শৃঙ্খলা ও তাৎপর্যের দিকে ইঙ্গিত দিল এবং মানবজাতির প্রতি তা দিল অধিক গুরুত্ব, যা আমরা আজও ব্যাকুলভাবে কামনা করি। সেই ডিজাইনারটি হলেন প্রাকৃতিক, আকর্ষণীয় এবং সর্বোপরি জীবজগতের মানবীয় ব্যাখ্যা। কিন্তু ডারউইন এবং ওয়ালেস দেখালেন যে, আরো একটি উপায় আছে, সমান আকর্ষণীয়, সমান মানবীয় এবং আরো অধিক প্রভাবশালী : প্রাকৃতিক নির্বাচন, কালের পরিক্রমায় যা জীবনের সংগীতকে করে তোলে আরো মধুর।

জীবাশ্ম-প্রমাণসমূহ একজন 'মহান ডিজাইনার'-এর ধারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারত ; সম্ভবত সেই 'ডিজাইনার' যখন অসন্তুষ্ট হন তখন ধ্বংস করে ফেলেন

কিছু প্রজাতিকে, এবং অধিকতর উন্নত ডিজাইনের জন্য করা হয় নূতন পরীক্ষণ। কিন্তু এই ভাবনাটি কিছুটা বিব্রতকর। কিন্তু প্রতিটি উদ্ভিদ এবং প্রাণীই সৃষ্টি হয়েছে অপরূপ সৌন্দর্য নিয়ে ; একজন চরম দক্ষ ডিজাইনার কি শুরু থেকেই মনোযোগী হবেন না তার প্রত্যাশিত বৈচিত্র্যের জন্য ? জীবাশ্ম-প্রমাণ ইঙ্গিত দেয় ভুল শোধরানো পর্যন্ত পরীক্ষণের দিকে, ভবিষ্যৎকে অনুধাবনের ক্ষেত্রে এক অসামর্থ্যের দিকে, যেগুলো একজন দক্ষ 'মহান ডিজাইনার'-এর সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ (যদিও কোনো দূরবর্তী ও পরোক্ষ প্রকৃতির 'ডিজাইনার'-এর সাথে তা নয়)।

১৯৫০ সনের দিকে যখন আমি ছিলাম এক কলেজ আন্ডারগ্র্যাজুয়েট, আমার পরম সৌভাগ্য হয়েছিল এইচ. জে. মূলারের গবেষণাগারে কাজ করার, যিনি ছিলেন এক মহান বংশগতি-বিজ্ঞানী এবং যিনি আবিষ্কার করেন যে, বিকিরণ থেকে সৃষ্টি হয় মিউটেশন। মূলারই ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি কৃত্রিম নির্বাচনের উদাহরণ স্বরূপ হেইকি কাঁকড়ার প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বংশগতি বিদ্যার ব্যবহারিক জগৎটি জানার জন্য, আমি অনেকগুলো মাস কাটিয়ে দিয়েছিলাম ফলের মাছি, *Drosophila melanogaster* (যার অর্থ হল কৃষ্ণকায়া শিশির-প্রেমিক) নিয়ে কাজ করে—যেগুলো ছিল দুটি পাখনা ও বৃহৎ চক্ষু বিশিষ্ট ক্ষুদ্র শান্ত প্রাণী। আমরা এদেরকে রেখে দিলাম দুধের বিশেষ বোতলে (১/৮ গ্যালন মাপের)। আমরা সংকর ঘটালাম দুটি ভিন্ন প্রজাতির মধ্যে এটি দেখার জন্য যে, পিতৃ-জিনসমূহের পুনর্বিন্যাসে এবং প্রাকৃতিক ও আরোপিত মিউটেশনের ফলে কিরকম নূতন রূপ সৃষ্টি হয়। স্ত্রী-মাছিগুলো তাদের ডিমগুলো জমাতে পারত একধরনের মল্যাসিজ জাতীয় সিরাপের উপর, যেগুলো টেকনিসিয়ানগণ স্থাপন করে দিয়েছিলেন বোতলের অভ্যন্তরে ; বোতলগুলোকে ছিপি দ্বারা বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল ; এবং নিষিক্ত ডিমসমূহের লার্ভা, লার্ভা শুঁয়াপোকাতে এবং শুঁয়াপোকাসমূহের নূতন প্রাপ্তবয়স্ক ফল-মাছিতে পরিণত হওয়ার জন্য আমাদেরকে অপেক্ষা করতে হল দুসপ্তাহ।

একদিন আমি একটি সাধারণ বাইনোক্যুলার মাইক্রোস্কোপ দ্বারা দেখছিলাম সদ্য আগত প্রাপ্তবয়স্ক Drosophila-র দলকে যেগুলোকে অবশ করে ফেলা হয়েছিল সামান্য ইথার দ্বারা, এবং একটি উটের পশমের ব্রাশ দ্বারা দ্রুত আলাদা করে ফেলছিলাম বিভিন্ন বৈচিত্র্যসমূহকে। সবিস্ময়ে আমি এক ভিন্ন বিষয়ের মুখোমুখি হলাম : সাদা চোখের পরিবর্তে লাল চোখের মতো কোনো সামান্য বৈচিত্র্য নয়, অথবা কোনো গ্রীবা-লোম না থাকার স্থলে গ্রীবা-লোম থাকা নয়। এটি ছিল অন্যরকম, এবং চমৎকার, সাবলীল, এমন এক প্রাণী যার ছিল অপেক্ষাকৃত বড়ো পাখনা এবং দীর্ঘ পশমময় শুঙ্গ। ভাগ্যই এমনটি বয়ে এনেছে, আমি উপসংহার টানলাম, যে একটি মাত্র প্রজন্মে একটি বড়ো রকমের বিবর্তনমূলক পরিবর্তনের উদাহরণ পাওয়া গেল, যা কখনো ঘটবে না বলে মূলার ধারণা করেছিলেন, অবশেষে তা ঘটল তার নিজেরই গবেষণাগারে। তার সামনে এটি ব্যাখ্যা করা আমার জন্য ছিল একটি অস্বস্তিকর কাজ।

banglainternet.com

আশায় বুক বেঁধে আমি তার অফিসের দরজায় করাঘাত করলাম। 'ভেতরে এসো', এল তার চাপা গলার চিৎকার। আমি ঢুকে এমন এক অন্ধকার কক্ষ আবিষ্কার করলাম যেখানে কেবল একটিমাত্র ছোটো বাতি যা আলোকিত করছিল একটি মাইক্রোস্কোপের স্টেজকে, যা নিয়ে তিনি কাজ করছিলেন। এই বিষাদময় পারিপার্শ্বিকের মাঝে আমি আমতা আমতা করে আমার পরীক্ষণের ব্যাখ্যা দিলাম। আমি খুবই ভিন্নরকমের একটি মাছি পেয়েছি। আমি নিশ্চিত ছিলাম যে, মল্যাসিজের উপরস্থ শুঁয়াপোকাসমূহের কোনো একটি হতে এটি উৎপন্ন হয়েছিল। এর অর্থ ছিল না মূলারকে বিরক্ত করা কিন্তু... 'এটি কি Diptera অপেক্ষা Lepidoptera-র সাথেই অধিক সাদৃশ্য বহন করে?' তিনি জানতে চাইলেন, তার মুখাবয়ব নিচ হতে উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল। আমি জানতাম না এর অর্থ কী ছিল, তাই তাকে ব্যাখ্যা করতে হল : 'এর কি রয়েছে বড়ো আকৃতির পাখনা? এর কি রয়েছে পশমময় শুঙ্গ?' আমি বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়িয়ে সম্মতি দিলাম।

মূলার উপরের বাতিটি জ্বালিয়ে দিলেন এবং শান্তভাবে হাসলেন। এটি ছিল এক পুরনো কাহিনী। এমন এক ধরনের মথ ছিল যারা অভিযোজিত হয়ে গিয়েছিল Drosophila বংশগতির গবেষণাগারের সাথে। এটি ফলের মাছির মতো কিছুই ছিল না এবং ফলের মাছির সাথে কিছুই করতে চায়নি। এটি যা চেয়েছিল তা হল ফলের মাছির মল্যাসিজ। যে সংক্ষিপ্ত সময়ে গবেষণাগারের টেকনিসিয়ানগণ দুধের বোতলকে ছিপিমুক্ত ও ছিপিযুক্ত করেছিল—উদাহরণ স্বরূপ ফলের মাছি যোগ করার জন্য—মা মথটি নিচে নেমে এসে এর ডিম ফেলে দিল সুস্বাদু মল্যাসিজের উপর এবং অতঃপর চলে গেল উপরে। আমি আবিষ্কার করিনি কোনো ম্যাক্রো-মিউটেশন। আমি বড়োজোড় দৈবাৎ সন্ধান পেয়েছি প্রকৃতিতে আরো একটি চমকপ্রদ অভিযোজনের, যেটি নিজে মাইক্রো-মিউটেশন ও প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফসল।

বিবর্তনের রহস্য হল মৃত্যু এবং সময়—অসংখ্য প্রাণীসত্তার মৃত্যু যেগুলো পরিপার্শ্বের সাথে অযথার্থভাবে অভিযোজিত হয়েছিল ; দৈব অভিযোজনের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র মিউটেশনগুলোর দীর্ঘ পুনরাবৃত্তির সময়কাল, অনুকূল মিউটেশনসমূহের বিন্যাসের ধীর একত্রীকরণের সময়কাল। ডারউইন ও ওয়ালেসের প্রতি বিরোধিতার আংশিক উদ্ভূত হয় সহস্রাব্দের ব্যবধান কল্পনা করার ক্ষেত্রে আমাদের অসামর্থ্য থেকে, অপরিমেয় কাল থেকে যা অনেক কম। যারা কেবল দশ লক্ষ বছর যাবৎ অস্তিত্বশীল তাদের কাছে সত্তর মিলিয়ন বছর কি অনুভূতিই বা জাগাতে পারে? আমরা হলাম তেমন মৌমাছি যারা কেবল একদিন ধরে উড়ে বেড়িয়ে তাকেই ভেবে নেয় অনন্তকাল বলে।

হয়ত আরো অনেক গ্রহে প্রাণের বিবর্তনের ক্ষেত্রে যা ঘটেছিল পৃথিবীর ক্ষেত্রেও কম-বেশি তা-ই ঘটেছিল ; কিন্তু প্রোটিনের রসায়ন বা মস্তিষ্কের স্নায়ুবিদ্যার মতো সূক্ষ্ম বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে, পৃথিবীর উপাখ্যান মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সির মধ্যে হয়ত অনন্য। আন্তঃনাক্ষত্রিক গ্যাস ও ধুলো হতে ঘনীভূত হয়ে

সৃষ্টি হল পৃথিবী, প্রায় ৪.৬ মিলিয়ন বছর পূর্বে। জীবাশ্মের রেকর্ড হতে আমরা জানতে পারি যে, এর কিছু পরেই ঘটল প্রাণের উদ্ভব, সম্ভবত ৪ বিলিয়ন বছর পূর্বে, আদি পৃথিবীর পুকুর বা সমুদ্রসমূহে। প্রথম প্রাণশীল বস্তুসমূহ এক-কোষী প্রাণীসত্তার মতো এত জটিল কোনো কিছু ছিল না, যা এরই মধ্যে হয়ে উঠেছিল প্রাণের এক অভিজাত রূপ। প্রথম সৃষ্টিসমূহ ছিল অনেক বেশি বিনম্র। সেই সকল আদি কালে, বিদ্যুৎ চমক এবং সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি ভেঙে ফেলছিল আদি আবহাওয়ার সরল হাইড্রোজেন-সমৃদ্ধ অণুসমূহকে, খণ্ডাংশগুলো তাৎক্ষণিকভাবে পুনঃএকত্রিত হয়ে পরিণত হচ্ছিল অধিক থেকে অধিকতর জটিল অণুতে। এই আদি রসায়নের জাতকসমূহ মিশে গেল সমুদ্রে, গঠন করল ক্রমশ বর্ধিষ্ণু জটিলতাসম্পন্ন এক ধরনের জৈব স্যুপ, যতদিন না একদিন, প্রায় দৈবভাবে, এমন এক অণু আবির্ভূত হল যা নিজের অবিকল অণুকৃতি সৃষ্টি করতে সমর্থ হল, স্যুপের মধ্যকার অন্যান্য অণুসমূহকে নির্মাণের ব্লক হিসেবে ব্যবহার করে। (এই বিষয়ে পরে আমরা আবার ফিরে আসব।)

এটি ছিল পৃথিবীতে প্রাণের প্রধানতম অণু ডিঅক্সিরাইবো নিউক্লিক এসিড, DNA-এর আদিতম পূর্বপুরুষ। এটি আকৃতিতে মইয়ের মতো যা পেঁচিয়ে পরিণত হয়েছে একটি হেলিক্সে, যার ধাপসমূহ পাওয়া যায় চারটি ভিন্ন ভিন্ন অণুতে যা গঠন করে জেনেটিক কোডের চারটি অক্ষর। এই ধাপসমূহ, যাদেরকে বলা হয় নিউক্লিওটাইড, কোনো প্রদত্ত প্রাণীসত্তার জন্য বানানসহ প্রকাশ করে এর বংশাণুক্রমিক নির্দেশাবলি। পৃথিবীতে প্রতিটি প্রাণী-রূপেরই আছে এক সেট ভিন্ন নির্দেশাবলি, যা অবশ্যই লিখিত হয় একই ভাষায়। প্রাণীসত্তাসমূহ ভিন্ন হয় তাদের নিউক্লিক এসিডের নির্দেশাবলির ভিন্নতার কারণে। মিউটেশন হল নিউক্লিওটাইডে কোনো পরিবর্তন, যা অনুকৃত হয় পরবর্তী প্রজন্মে, যেটি বাস্তবেই প্রজাতিরূপে বিকশিত হয়। যেহেতু মিউটেশন হল নিউক্লিওটাইডের বিক্ষিপ্ত পরিবর্তন, এদের বেশিরভাগই হল ক্ষতিকর বা প্রাণঘাতী, যেগুলো অকার্যকর এনজাইমের অস্তিত্ব কোডবদ্ধ করে। কোনো মিউটেশন একটি প্রাণীসত্তাকে সুচারুরূপে কর্মক্ষম করে তুলতে অপেক্ষা করতে হয় দীর্ঘকাল। এবং তথাপি এটিই সেই অসম্ভাব্য ঘটনা, এক সেন্টিমিটারের দশ মিলিয়নের একভাগের মধ্যে কোনো নিউক্লিওটাইডে ঘটে যাওয়া এক ক্ষুদ্র ও উপকারী মিউটেশন, যা টিকিয়ে রাখে বিবর্তনের গতিকে।

চার বিলিয়ন বছর পূর্বে, পৃথিবী ছিল এক আণবিক 'গার্ডেন অব ইডেন'। তখনো আবির্ভূত হয়নি কোনো শিকারজীবি প্রাণী। কিছু অণু নিজেদেরকেই পুনরুৎপাদিত করল, প্রতিদ্বন্দ্বিতা করল ব্লক তৈরির জন্য এবং রেখে গেল নিজেদের অপরিবর্তিত অনুকৃতি। পুনরুৎপাদন, মিউটেশন এবং কম দক্ষ প্রজাতিসমূহের বিলুপ্তির মধ্য দিয়ে বিবর্তন প্রক্রিয়া ভালোভাবেই এগিয়ে যেতে থাকল, এমনকি আণবিক পর্যায়েও। যতই সময় এগিয়ে যেতে থাকল, পুনরুৎপাদনে তারা ততই উৎকর্ষ সাধন করতে থাকল। বিশেষায়িত গুণ সম্পন্ন অণুসমূহ শেষপর্যন্ত পরস্পরের

banglainternet.com

সাথে একত্রিত হল, সৃষ্টি করল এক ধরনের আণবিক সমন্বয়—যা হল প্রথম কোষ। আজকের দিনে, উদ্ভিদ-কোষের রয়েছে ক্ষুদ্র আণবিক কারখানা, যাদেরকে বলা হয় ক্লোরোপ্লাস্ট, যারা রয়েছে সালোক সংশ্লেষণের দায়িত্বে—যা হল সূর্যালোক, পানি ও কার্বন ডাই অক্সাইডকে কার্বোহাইড্রেট ও অক্সিজেনে পরিণত করা। রক্তের একটি ফোঁটায় যে কোষসমূহ রয়েছে, ধারণ করে এক ভিন্ন ধরনের আণবিক কারখানা, মাইটোকন্ড্রিয়ন, যা উপযোগী শক্তি আহরণের জন্য খাদ্যকে মিশ্রিত করে অক্সিজেনের সাথে। আজ এই কারখানাসমূহ বিরাজ করে উদ্ভিদ ও প্রাণী কোষগুলোতে, কিন্তু হয়ত একদা এরা ছিল মুক্তভাবে বিচরণশীল কোষ।

প্রায় তিন মিলিয়ন বছর পূর্বে, বেশ কিছু এককোষী উদ্ভিদ পরস্পরের সাথে একত্রিত হল, হয়ত কোনো একটি মিউটেশন কোনো একটি কোষ দুই ভাগে বিভক্ত হওয়ার পর একে আলাদা হতে দেয়নি। বিকশিত হল প্রথম বহু-কোষী প্রাণীসত্তা। আপনার শরীরের প্রতিটি কোষ একটি সংঘের মতো, সাধারণ মঙ্গলের জন্য একদা মুক্ত-জীবনযাপনকারী অংশগুলো একই বন্ধনে আবদ্ধ হল। এবং আপনি সৃষ্টি হলেন একশত ট্রিলিয়ন কোষ দ্বারা। আমরা, আমাদের প্রত্যেকেই, হলাম এক একটি বিপুলের উৎস। লিঙ্গভেদ আবিষ্কৃত হল সম্ভবত প্রায় দুই বিলিয়ন বছর পূর্বে। এর পূর্বে, প্রাণীসত্তার নতুন বৈচিত্র্যসমূহ জেগে উঠতে পারত কেবলমাত্র বিক্ষিপ্ত মিউটেশনের একত্রীকরণ হতে—যা ছিল পরিবর্তনের নির্বাচন, অক্ষরে অক্ষরে, বংশানুগতিক নির্দেশনা অনুসারে। বিবর্তন অবশ্যই বিরক্তিকর রকমের ধীর প্রক্রিয়া। লিঙ্গের আবিষ্কারের সাথে সাথে, দুটি প্রাণীসত্তা তাদের DNA কোডের সম্পূর্ণ অনুচ্ছেদ, পৃষ্ঠাসমূহ ও বইটিকে বিনিময় করতে পারত, উৎপন্ন করল নতুন বৈচিত্র্যসমূহ যারা প্রস্তুত ছিল নির্বাচনের ঝাঁঝরির মুখোমুখি হওয়ার জন্য। প্রাণীসত্তাসমূহ নির্বাচিত হল যৌন বিনিময়ে লিপ্ত হতে—যেগুলো এতে অনাগ্রহ বোধ করল, সেগুলো দ্রুত বিলুপ্ত হয়ে গেল। এবং এটি কেবল দুই বিলিয়ন বছর পূর্বের অণুজীবসমূহের ক্ষেত্রেই সত্য নয়। আমরা মানবকুলও আজ DNA-এর খণ্ডাংশ বিনিময় করার জন্য স্পষ্টতই বোধ করি এক তাড়না।

প্রায় এক বিলিয়ন বছর পূর্বে, তরুলতারা একত্রে সমন্বিত হয়ে, পৃথিবীর পরিবেশে সাধন করল এক বিস্ময়কর পরিবর্তন। সবুজ গাছপালারা উৎপন্ন করে আণবিক অক্সিজেন। যেহেতু এরই মধ্যে মহাসমুদ্রগুলো পূর্ণ হয়ে উঠেছিল সাধারণ সবুজ তরুলতা দ্বারা, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন হয়ে উঠছিল একটি প্রধান উপাদান, একে এর আদি হাইড্রোজেন সমৃদ্ধ অবস্থা থেকে অপ্রত্যাগামীভাবে পরিবর্তিত করে ফেলছিল এবং সমাপ্তি ঘটাচ্ছিল পৃথিবীর ইতিহাসের সেই কালটির যখন প্রাণের উপাদান তৈরি হত অজীববৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায়। কিন্তু অক্সিজেনের প্রবণতা হল জৈব অণুসমূহকে ভেঙে টুকরো টুকরো করা। আমাদের কাছে এটি প্রিয় হলেও, অরক্ষিত জৈব পদার্থগুলোর জন্য মূলত এটি একটি বিষ। অক্সিজেনযুক্ত বায়ু মণ্ডলে পরিণত হওয়াটি প্রাণের ইতিহাসের সৃষ্টি করল এক চরম

বিপর্যয়, অনেক প্রাণীসত্তা, যারা অক্সিজেনের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে অসমর্থ হল, তারা ধ্বংস হয়ে গেল। অল্প কিছু আদি প্রাণী-রূপ, যেমন বটুলিজম এবং টিটেনাস ব্যাসিলি, এমনকি আজ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারল কেবলমাত্র অক্সিজেন-মুক্ত পরিবেশে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেন হল রাসায়নিকভাবে অনেক বেশি নিষ্ক্রিয় এবং তাই অক্সিজেন অপেক্ষা অনেক বেশি অনুকূল। কিন্তু এটিও জীববৈজ্ঞানিকভাবে নিয়ন্ত্রিত। কাজেই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের প্রায় ৯৯% জীববৈজ্ঞানিক উৎস থেকে জাত। আকাশ গঠিত হয়েছে প্রাণ দ্বারা।

প্রাণের উৎপত্তির পরবর্তী চার বিলিয়ন বছরের অধিকাংশ সময় জুড়ে, মুখ্য প্রাণী সত্তাগুলো ছিল আণুবীক্ষণিক নীল-সবুজ শৈবাল, যেগুলো আচ্ছাদিত ও পূর্ণ করে রেখেছিল মহাসমুদ্রগুলোকে। অতঃপর প্রায় ৬০০ মিলিয়ন বছর পূর্বে, শৈবালের একচ্ছত্র আধিপত্য খর্ব হল এবং নতুন প্রাণ-রূপের এক অস্বাভাবিক দ্রুত-বিস্তার শুরু হল, যে ঘটনাটিকে বলা হয় 'ক্যামব্রিয়ান বিস্ফোরণ'। প্রাণের উদ্ভব ঘটেছে পৃথিবী সৃষ্টির অব্যবহিত পরেই, যা নির্দেশ করে যে পৃথিবী-সদৃশ গ্রহতে প্রাণের বিকাশ একটি অনিবার্য রাসায়নিক প্রক্রিয়া। কিন্তু তিন বিলিয়ন বছর ধরে নীল-সবুজ শৈবালের বাইরে প্রাণের খুব একটা বিবর্তন ঘটেনি, যার অর্থ হল বিশেষ অঙ্গাণুযুক্ত বিশাল প্রাণ-রূপগুলোর বিবর্তন ঘটা বেশ কঠিন, এমনকি প্রাণের উৎপত্তির চাইতেও কঠিনতর। হয়ত এমন আরো অনেক গ্রহ রয়েছে যেগুলোর এখন রয়েছে প্রচুর সংখ্যক অণুজীব, কিন্তু নেই কোনো বড়ো জন্তু এবং তরুলতা।

'ক্যামব্রিয়ান বিস্ফোরণ'-এর পর পরই মহাসমুদ্রগুলো প্রচুর সংখ্যায় ধারণ করল প্রাণের বিভিন্ন রূপ। ৫০০ মিলিয়ন বছর পূর্বে ছিল ট্রাইলোবাইটের অসংখ্য দল, যেগুলো ছিল চমৎকার গঠনের প্রাণী, কিছুটা এক ধরনের বৃহৎ পোকার মতো ; যেগুলো দলবদ্ধ হয়ে শিকার সম্পন্ন করত মহাসমুদ্রের তলদেশে। সমবর্তিত আলো চেনার জন্য এরা এদের চোখে জমা করত স্ফটিক। কিন্তু আজ আর কোনো ট্রাইলোবাইট জীবিত নেই ; এদের একটিও জীবিত নেই ২০০ মিলিয়ন বছর ধরে। পৃথিবী এমন সব বৃক্ষলতা ও প্রাণীর আবাস ছিল আজ যাদের অস্তিত্বের চিহ্ন মাত্রও অবশিষ্ট নেই। এবং অবশ্যই এই গ্রহটিতে আজ যেসব প্রজাতি আছে একদা তাদের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। প্রাচীন শিলাখণ্ডে আমাদের মতো প্রাণীর কোনো লক্ষণ পাওয়া যায় না। প্রজাতিসমূহ আবির্ভূত হয়, যাপন করে কম বা বেশি এক সংক্ষিপ্ত জীবনকাল এবং অতঃপর বিলুপ্ত হয়ে যায়।

'ক্যামব্রিয়ান বিস্ফোরণ'-এর পূর্বে মনে হয় প্রজাতিসমূহের পর্যায়ক্রমিক আবির্ভাব ছিল অপেক্ষাকৃত ধীর প্রক্রিয়ার। অংশত এটি হয়ত এ কারণে যে, যতই আমরা সুদূর অতীতের দিকে অস্পষ্ট দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, আমাদের তথ্যের সমৃদ্ধি ততই কমে আসতে থাকে অতি দ্রুত ; আমাদের গ্রহের আদি ইতিহাসে খুব অল্প সংখ্যক প্রাণীসত্তারই শরীরে ছিল শক্ত অংশ এবং কোমল শরীরের প্রাণীগুলো খুব সামান্য জীবাশ্ম অবশিষ্ট রেখে যেতে পারে। কিন্তু অংশত 'ক্যামব্রিয়ান বিস্ফোরণ'-

banglainternet.com

এর পূর্বে খুব নতুন রূপের আবির্ভাবের ধীর হারটি একটি বাস্তব ঘটনা ; কোষের গঠন ও প্রাণ রসায়নের সযত্ন বিবর্তনটি, জীবাশ্ম দ্বারা উদ্‌ঘটিত বাহ্যিক অবয়বে তৎক্ষণাৎ সঞ্চারিত হয়নি। 'ক্যামব্রিয়ান বিস্ফোরণ'-এর পর, চমৎকার সব নতুন অভিযোজন প্রকাশিত হতে লাগল একের পর এক, শ্বাসরুদ্ধকর গতিতে। দ্রুত একাদিক্রমে আবির্ভাব ঘটল প্রথম মাছ এবং প্রথম মেরুদণ্ডী প্রাণীর ; তরুলতা, পূর্বে যারা সীমিত ছিল মহাসমুদ্র পর্যন্ত, এবার ছড়িয়ে পড়ল ভূ-ভাগে ; বিকাশ ঘটল প্রথম পতঙ্গের, এবং এর উত্তর পুরুষরা প্রাণীদের দ্বারা ভূ-ভাগে বসতি স্থাপন প্রক্রিয়ায় হয়ে উঠল পথিকৃৎ ; পাখনাযুক্ত পতঙ্গের উদ্ভব ঘটল উভচরদের সাথে, Lungfish-এর মতো কিছু প্রাণী সমর্থ হল জল ও স্থল উভয় স্থানেই, আবির্ভাব ঘটল প্রথম বৃক্ষ ও প্রথম সরীসৃপের ; আবির্ভাব ঘটল ডাইনোসারদের ; উদ্ভব ঘটল স্তন্যপায়ীদের, এবং অতঃপর এল প্রথম পাখিরা ; ফুটল প্রথম ফুল ; বিলুপ্ত হল ডাইনোসাররা, ডলফিন ও তিমির পূর্বপুরুষ আদিতম cetacean-দের উদ্ভব ঘটল এবং একই সময়ে এল প্রাইমেইটরা—যারা ছিল বানর, শিম্পাঞ্জি এবং মানুষের পূর্বপুরুষ। দশ লক্ষ বছরের কম সময় পূর্বে, প্রথম প্রাণী, যারা মানুষের সবচেয়ে সদৃশরূপে আবির্ভূত হল, তারা মস্তিষ্কের আকৃতিতে পেল চমৎকার বৃদ্ধি। এবং অতঃপর কেবল কয়েক মিলিয়ন বছর পূর্বে, প্রথম প্রকৃত মানুষের আবির্ভাব ঘটল।

মানবকুল বেড়ে উঠল বন-জঙ্গলে ; এদের প্রতি আমাদের রয়েছে এক স্বাভাবিক আসক্তি। একটি বৃক্ষ কতই না সুন্দর, যা বেড়ে উঠছে আকাশ পানে। এর পত্র-পল্লবেরা সালোকসংশ্লেষণের জন্য আহরণ করে সূর্যালোক, তাই বৃক্ষরা তাদের প্রতিবেশীদেরকে ছায়া দান করে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়। যদি আপনি মনোযোগ দিয়ে দেখেন তবে আপনি প্রায়ই দেখতে পাবেন যে, দুটি বৃক্ষ নিরুত্তাপ অনুগ্রহসহ পরস্পরকে ঠেলা-ধাক্কা দিয়ে বেড়ে উঠছে। বৃক্ষরা হল অসাধারণ যন্ত্র, যারা সূর্যালোক থেকে পায় শক্তি, মাটি থেকে শোষণ করে পানি আর বায়ু থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড, এই দ্রব্যসমূহকে পরিবর্তিত করছে খাদ্যে, আমাদের জন্য, তাদের নিজেদের জন্য। বৃক্ষকুল যে কার্বোহাইড্রেট তৈরি করে তারা সেটিকে ব্যবহার করে শক্তির উৎস রূপে, তাদের এ কাজ অব্যাহত রাখার জন্য। এবং আমরা প্রাণীকুল, যারা শেষপর্যন্ত বৃক্ষের উপর নির্ভর করে পরজীবির মতো বেঁচে থাকি, চুরি করি সেই কার্বোহাইড্রেটকে যাতে আমরা আমাদের প্রয়োজন মেটাতে পারি। গুল্মলতা খেয়ে আমরা বায়ু থেকে আমাদের কাঙ্খিত শ্বাসক্রিয়ায় যে অক্সিজেন নিয়ে রক্তে মিশে যেতে দিই, তার সাথে সমন্বিত করি কার্বোহাইড্রেটকে, এবং এভাবে আহরণ করি আমাদের শরীরের জন্য অতি প্রয়োজনীয় শক্তি। এই প্রক্রিয়ায় নিশ্বাসের মাধ্যমে আমরা ত্যাগ করি কার্বন ডাইঅক্সাইড, বৃক্ষলতারা যার পুনঃচক্রের মাধ্যমে উৎপন্ন করে আরো বেশি কার্বোহাইড্রেট। কী অদ্ভুত সহযোগিতার পরিবেশ—উদ্ভিদ এবং প্রাণী একজনের শ্বাস সাহায্য করছে আরেক জনের নিশ্বাসে, গ্রহময় মুখ থেকে পত্ররন্ধ্র পর্যন্ত এক পারস্পরিক জীবন রক্ষাকারী

প্রক্রিয়া, অনন্য ও অসাধারণ এই পুরো চক্রটি শক্তি পাচ্ছে এমন এক নক্ষত্র থেকে যা আমাদের কাছ থেকে প্রায় ১৫০ মিলিয়ন কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত।

জ্ঞাত জৈব অণুর সংখ্যা প্রায় দশ বিলিয়ন। তবুও এদের মাত্র পঞ্চাশটি ব্যবহৃত হয় প্রাণের গুরুত্বপূর্ণ ক্রিয়াকলাপে। বিভিন্ন ক্রিয়ার জন্য একই বিন্যাস প্রযুক্ত হয় বারবার, অপরিবর্তিত রূপে, কুশলীভাবে। এবং পৃথিবীতে প্রাণের একেবারে কেন্দ্রে—প্রোটিন যেগুলো নিয়ন্ত্রণ করে কোষ রসায়ন এবং নিউক্লিক এসিড যেগুলো বহন করে বংশানুগতিয় নির্দেশনা—আমরা দেখতে পাই যে, এই সকল অণু সকল উদ্ভিদ এবং প্রাণীতে অবশ্যম্ভাবীভাবে একইরকম। একটি ওক গাছ এবং আমি একই পদার্থ দ্বারা তৈরি। যদি আপনি যথেষ্ট অতীতে ফিরে যান, তবে দেখবেন যে, আমাদের রয়েছে এক সাধারণ পূর্বপুরুষ।

জীবন্ত কোষ হল গ্যালাক্সি ও নক্ষত্রের জগতের মতোই জটিল ও সুন্দর এক ব্যবস্থা। কোষের সার্বিক অংশগুলো পীড়াদায়কভাবে বিবর্তিত হয়েছে চার বিলিয়ন বছরেরও অধিক সময় ধরে। খাদ্যের ক্ষুদ্র খণ্ডগুলো রূপান্তরিত হয়েছে কোষীয় অংশে। আজকের শ্বেত কণিকাগুলো গতকালের ক্রিমযুক্ত স্পিনিজ। কোষটি এটি কিভাবে সাধন করল ? এর ভেতরে আছে গোলকধাঁধাময় ও অতি সূক্ষ্ম এক স্থাপত্য যা এর গঠন-শৈলী নিয়ন্ত্রণ করে, রূপান্তরিত করে অণুসমূহকে, সঞ্চয় করে শক্তি এবং প্রস্তুতি সম্পন্ন করে এর স্ব-অণুকৃতি সৃষ্টির। যদি আমরা কোনো কোষে প্রবেশ করতে পারতাম, আমরা দেখতে পেতাম যে, আণবিক কণাসমূহের অনেকগুলোই হল প্রোটিন অণু, এদের কিছু উত্তেজিত অবস্থায় ক্রিয়াশীল, অন্যগুলো শুধুই অপেক্ষা করছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রোটিন হল এনজাইমসমুহ, যেই অণুগুলো নিয়ন্ত্রণ করে কোষের রাসায়নিক বিক্রিয়াসমূহকে। এনজাইমগুলো হল অ্যাসেম্‌ব্লি-লাইন কর্মীদের মতো, প্রত্যেকেই এক একটি বিশেষ আণবিক কাজে দক্ষ : যেমন, নিউক্লিওটাইড গুয়ানোসিন ফসফেট প্রস্তুতির ৪র্থ ধাপ, বা একটি চিনির অণুকে শক্তি শোষণের উদ্দেশ্যে টুকরো টুকরো করে ফেলার ১১তম ধাপটি, কোষীয় অন্যান্য কাজ সুচারু রূপে সম্পন্ন করার জন্য যেগুলো সম্পন্ন করে নিতে হয়। কিন্তু এনজাইমগুলো এই প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে না। তারা এদের নির্দেশনা গ্রহণ করে—এবং প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেরাই নির্মিত হয়—নির্দেশনা প্রদানকারীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত নির্দেশনার ভিত্তিতে। পথিকৃৎ অণু হল নিউক্লিক এসিড। তারা নির্জনে বাস করে এক নিষিদ্ধ নগরীতে, গভীর অন্তর্দেশে, কোষের নিউক্লিয়াসে।

যদি আমরা কোনো ছিদ্রের মধ্য দিয়ে প্রবিষ্ট হতে পারতাম কোনো কোষের নিউক্লিয়াসের ভিতর, আমরা দেখতে পেতাম এমন কোনো কিছু যা সাদৃশ্য বহন করে কোনো স্প্যাগেটি কারখানার বিস্ফোরণের সাথে—বিশৃঙ্খলভাবে পেঁচানো কুণ্ডলী ও রজ্জুর মতো কিছু, যেগুলো হল : দু-ধরনের নিউক্লিক এসিড : DNA, যেগুলো জানে তাদের কী করতে হবে, এবং RNA, যেগুলো DNA কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনাগুলোকে পাঠিয়ে দেয় কোষের অবশিষ্ট অংশে। এরাই হল চার বিলিয়ন

banglainternet.com

বছরের বিবর্তনের শ্রেষ্ঠ ফসল, যারা তথ্যের সম্পূর্ণ অংশটিই ধারণ করে, যা ব্যবহৃত হতে পারে একটি কোষ বা একটি গাছ বা একটি মানুষের প্রত্যঙ্গের গঠন ক্রিয়ায়। মানুষের DNA তে যে পরিমাণ তথ্য আছে, সেগুলো যদি সাধারণ ভাষায় লেখা হত তবে একশো মোটা ভলিয়্যম দখল করে নিত। এরও অধিক হল এই যে, অতি ব্যতিক্রমী রূপে DNA অণুসমূহ জানে যে, তাদের নিজেদের অবিকল অনুকৃতি তৈরি করতে হয়। তারা অসাধারণরকম বেশি জানে।

DNA হল একটি ডাবল হেলিক্স, পরস্পরের সাথে পাকানো দুটি রজ্জু যা দেখতে 'সর্পিলাকার' মইয়ের মতোই। এটি হল কোনো একটি রজ্জু বরাবর নিউক্লিওটাইডগুলোর ধারাবাহিক অবস্থান বা বিন্যাস এবং এটিই হল প্রাণের ভাষা। পুনরুৎপাদনের সময় হেলিক্সগুলো আলাদা হয়ে পড়ে, এ ক্ষেত্রে তারা সাহায্য পায় পাক খোলার জন্য উপযোগী একটি বিশেষ প্রোটিনের, প্রত্যেকেই কোষ-নিউক্লিয়াসের সান্দ্র তরলের আশেপাশে ভাসমান নিউক্লিওটাইড বিল্ডিং ব্লকগুলো হতে একে অপরের অনুকৃতি সংশ্লেষণ করে। একবার পাক মুক্ত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেলে, একটি গুরুত্বপূর্ণ এনজাইম DNA পলিমেরেইজ নিশ্চিত করতে সাহায্য করে যে, অনুকৃতিকরণ কাজটি প্রায় যথাযথভাবে সম্পন্ন হচ্ছে। যদি কোনো ভুল সাধিত হয়, এমন সব এনজাইম আছে যারা ভুলটিকে সংশোধন করে এবং এই প্রক্রিয়ায় তারা ত্রুটিযুক্ত নিউক্লিওটাইডটিকে একটি সঠিক নিউক্লিওটাইড দ্বারা প্রতিস্থাপন করে। এই এনজাইমগুলো ভীতিকর ক্ষমতার অধিকারী আণবিক মেশিন।

নিজের নিখুঁত অনুকৃতি তৈরি করা ছাড়াও—যা বংশানুগতিক বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে—নিউক্লিয়ার DNA কোষের ক্রিয়াকলাপকেও দিক নির্দেশনা দেয়—আবার যা হল বিপাক ক্রিয়া—সম্পন্ন হয় বার্তাবাহক RNA নামক আরো একটি নিউক্লিক এসিড দ্বারা, যাদের প্রত্যেকটি চলে যায় নিউক্লিয়াসের বহিঃস্থ প্রদেশসমূহে এবং নিয়ন্ত্রণ করে একটি এনজাইমের নির্মাণকে, সঠিক সময়ে, সঠিক স্থানে। যখন সব কিছু সম্পন্ন হল, উৎপন্ন হল একটিমাত্র অণু, সেটি তখন ব্যস্ত হয়ে পড়ে কোষ-রসায়নের একটি বিশেষ বিষয়ের মাঝে শৃঙ্খলা আনার জন্য।

মানব DNA হল এক বিলিয়ন নিউক্লিওটাইডের সমান দৈর্ঘ্যের একটি মইয়ের মতো। নিউক্লিওটাইডসমূহের সবচেয়ে সম্ভাব্য সমন্বয়গুলো অর্থহীন : তারা এমন সব প্রোটিনের সংশ্লেষণ ঘটায় যেগুলো কোনো প্রয়োজনীয় কাজের উপযোগী নয়। অতি সীমিত সংখ্যার কিছু নিউক্লিক এসিড অণু আমাদের মতো জটিল প্রাণ-রূপসমূহের জন্য উপকারী। তথাপি, নিউক্লিক এসিডের অণুগুলোকে একত্রীকরণের উপায়ের সংখ্যা উদ্ভট রকমের বেশি—সম্ভবত সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ইলেকট্রন ও প্রোটনের মোট সংখ্যার চাইতেও বেশি। সেই কারণে, স্বতন্ত্র মানুষের সম্ভাব্য সংখ্যাটাও যাপিত সময়ে জন্ম নেয়া মানুষের সংখ্যার চাইতে অনেক বেশি : মানব প্রজাতির অপরিমিত শক্তিটিও প্রবল। নিউক্লিক এসিডসমূহের একত্রীকরণের জন্য

অবশ্যই থাকতে হবে এমন সব উপায় যাতে এরা আরো ভালোভাবে কাজ করতে পারে—যেই লক্ষণের মাধ্যমেই আমরা নির্বাচন করি না কেন—যে কোনো কালে জীবিত মানুষের তুলনায়। সৌভাগ্যক্রমে, আমরা এখনো জানি না বিকল্প ধারার মানুষ সৃষ্টির জন্য নিউক্লিওটাইডসমূহের বিকল্প সজ্জাগুলো কীরকম হতে পারে। ভবিষ্যতে আমরা হয়ত যে কোনো কাঙ্ক্ষিত পরম্পরায় নিউক্লিওটাইডগুলোকে সাজাতে সমর্থ হব, আমাদের কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যগুলো উৎপন্ন করার জন্য—একটি ঐকান্তিক ও উদ্বেগজনক পরিপ্রেক্ষিত।

বিবর্তন ক্রিয়াশীল হয় মিউটেশন ও নির্বাচনের মাধ্যমে। অনুকৃতি সৃষ্টির সময় মিউটেশন ঘটতে পারে যদি এনজাইম DNA পলিমেরেইজ কোনো ভুল করে। কিন্তু এটি কদাচ কোনো ভুল করে। তেজস্ক্রিয়তা বা সূর্য থেকে আগত অতিবেগুনি রশ্মি বা কসমিক রশ্মি বা পরিবেশে বিরাজমান রাসায়নিক দ্রব্যাদি থেকেও মিউটেশন ঘটতে পারে, এদের সবগুলোই পাল্টে ফেলতে পারে নিউক্লিওটাইডগুলোকে কিংবা নিউক্লিক এসিডগুলোকে গ্রন্থিত করে ফেলে। যদি মিউটেশনের হার খুব উচ্চ হয়, আমরা হারিয়ে ফেলব কষ্ট সহিষ্ণু বিবর্তনের চার বিলিয়ন বছরের উত্তরাধিকার। যদি এটি খুব ধীর হয়, পরিবেশে কিছু ভবিষ্যৎ পরিবর্তনের সাথে অভিযোজনের জন্য পাওয়া যাবে না কোনো নতুন বৈচিত্র্য। প্রাণের বিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে মিউটেশন ও নির্বাচনের মধ্যে কম বা বেশি একটি সূক্ষ্ম ভারসাম্যের। যখন ভারসাম্যটি অর্জিত হয়, তখন সম্পন্ন হয় উল্লেখযোগ্য অভিযোজন।

একটিমাত্র DNA নিউক্লিওটাইডে কোনো পরিবর্তন সেই DNA কোড সংশ্লিষ্ট প্রোটিনের একটি অ্যামিনো এসিডে একটি পরিবর্তন সাধন করে। ইয়োরোপীয় বংশোদ্ভূত মানুষের লোহিত রক্ত কণিকা দেখতে মোটামুটিভাবে গোলাকৃতি। আফ্রিকান বংশোদ্ভূত কিছু মানুষের লোহিত রক্ত কণিকা দেখতে কাস্তের মতো বা অর্ধচন্দ্রাকৃতি। কাস্তের মতো কোষগুলো বহন করে অপেক্ষাকৃত কম অক্সিজেন এবং এর ফল স্বরূপ সঞ্চারিত করে এক ধরনের রক্তস্বল্পতা। এরা ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরোধও প্রদান করে। এতে কোনো প্রশ্নই উঠে না যে, মৃত্যু বরণ করার চাইতে রক্তস্বল্পতায় আক্রান্ত হওয়া অনেক বেশি শ্রেয়। রক্তের ক্রিয়ার উপর এই গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব—এতটাই ব্যাপক যে লোহিত রক্ত কণিকার ফোটোগ্রাফে তা তাৎক্ষণিকভাবে মূর্ত হয়ে উঠে—মানুষের একটি নমুনা কোষের DNA-এর দশ বিলিয়ন নিউক্লিওটাইডের কেবলমাত্র একটিতে কোনো পরিবর্তনের কারণে এটি ঘটেছে। অন্যান্য নিউক্লিওটাইডসমূহের বেশিরভাগের মধ্যে পরিবর্তনের ফলাফলটি কিরূপ সে ব্যাপারে আমরা এখনো অজ্ঞ।

আমরা মানুষেরা দেখতে বৃক্ষ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। নিঃসন্দেহে আমরা জগৎ কে উপলব্ধি করি একটি বৃক্ষ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে। কিন্তু অতি গভীরে প্রাণের আণবিক বিবেচনায়, বৃক্ষ এবং আমরা অনিবার্যভাবে একইরকম। বংশানুগতির জন্য আমরা উভয়েই ব্যবহার করি নিউক্লিক এসিড ; আমাদের

banglainternet.com

কোষসমূহের রসায়নকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আমরা উভয়েই প্রোটিনকে ব্যবহার করি এনজাইমরূপে। সবচেয়ে তাৎপর্যময় হল এই যে, নিউক্লিক এসিডের তথ্যকে প্রোটিন তথ্যে রূপান্তরের জন্য আমরা উভয়েই ব্যবহার করি সূক্ষ্মভাবে একই সংকেত-লিপি,* এই গ্রহের অন্যান্য সৃষ্টিও কার্যত যা করে থাকে। এই আণবিক ঐক্যের সাধারণ ব্যাখ্যা হল এই যে, আমরা, আমাদের সকলেই,—গাছপালা এবং মানুষ, অ্যাঙলার মাছ এবং শামুকের দেহ নিঃসৃত আঠালো পদার্থের ছাঁচ এবং প্যারামেসিয়া—আমাদের গ্রহের আদি ইতিহাসে প্রাণের উদ্ভবের একটি একক ও সাধারণ দৃষ্টান্ত হতে জাত। অতঃপর জটিল অণুগুলো কীভাবে বিকশিত হল ?

কর্নেল ইউনিভার্সিটিতে আমার গবেষণাগারে, আমরা কাজ করলাম, অন্যসব বিষয়ের মাঝে প্রাক্-জীববৈজ্ঞানিক জৈব রসায়ন নিয়ে, রচনা করলাম প্রাণ-সংগীতের কিছু স্বর। আমরা আদি পৃথিবীর গ্যাসসমূহকে মিশ্রিত ও প্রজ্বলিত করলাম : হাইড্রোজেন, পানি, অ্যামোনিয়া, মিথেন, হাইড্রোজেন সালফাইড—সকলেই, আজ দৈবক্রমে বিরাজ করে বৃহস্পতি গ্রহে এবং মহাবিশ্বের সর্বত্র। স্ফুলিঙ্গ থেকে উৎপন্ন হয় বিদ্যুৎ চমক—যা প্রাচীন পৃথিবী এবং আজকের বৃহস্পতি উভয়স্থানেই উপস্থিত। বিক্রিয়ার পাত্রটি শুরুতে ছিল স্বচ্ছ : মূল গ্যাসসমূহ পুরোপুরি অদৃশ্য থাকল। কিন্তু দশ মিনিট স্ফুলিঙ্গ প্রজ্বলনের পর, আমরা দেখতে পাই একটি অদ্ভুত বাদামি রঞ্জক ধীরে ধীরে বিন্দু বিন্দু করে ছড়িয়ে পড়ছে পাত্রের পার্শ্ব জুড়ে। অভ্যন্তরভাগটি ক্রমশ অস্বচ্ছ হয়ে উঠল, আচ্ছাদিত হয়ে পড়ল একটি পুরু বাদামি আলকাতরার মতো আবরণে। যদি আমরা ব্যবহার করতাম অতিবেগুনি রশ্মি—আদি সূর্যের অনুকরণে—ফলাফল প্রায় একইরকম হত। আলকাতরা হল জটিল জৈব অণুসমূহের এক অতি সমৃদ্ধ সমাবেশ, প্রোটিন ও নিউক্লিক এসিড গঠনকারী অংশগুলোসহ। এটি যা প্রদান করে তা থেকে সহজেই তৈরি করা যেতে পারে প্রাণের উপাদান।

এরূপ পরীক্ষণ প্রথম সম্পন্ন হয় ১৯৫০ এর দশকের প্রথম দিকে স্ট্যানলি মিলার কর্তৃক, তখন যিনি রসায়নবিদ হ্যারল্ড উরের একজন গ্র্যাজুয়েট ছাত্র। উরে জোর দিয়েই মতামত দিয়েছিলেন যে, পৃথিবীর আদি বায়ুমণ্ডল ছিল হাইড্রোজেন-

* জেনেটিক কোড পৃথিবীর সব প্রাণীসত্তার সব অংশে একইরকম নয় বলে প্রমাণ মেলে। নিদেনপক্ষে, এমন অল্পকিছু ক্ষেত্র জানা গেছে যেখানে, একটি মাইটোকন্ড্রিয়াতে DNA তথ্য থেকে প্রোটিন তথ্যে পরিবর্তনে প্রয়োগ করে একই কোষের নিউক্লিয়াসের জিনগুলো কর্তৃক ব্যবহৃত কোড বইটির চাইতে ভিন্নতর কিছু। এটি নির্দেশ করে মাইটোকন্ড্রিয়া এবং নিউক্লিয়াসের জেনেটিক কোডসমূহের মাঝে এক দীর্ঘ বিবর্তনমূলক বিচ্ছিন্নতা, এবং এটি এই ধারণাটির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ যে, বিলিয়ন বিলিয়ন বছর পূর্বে এক মিথোজীবিতার সম্পর্কের মধ্য দিয়ে একদা মুক্তভাবে বিচরণশীল প্রাণসত্তা মাইটোকন্ড্রিয়াগুলো কোষের সাথে একীভূত হয়। সেই মিথোজীবিতার উন্মেষ এবং বিকাশের উন্নতরূপটি, দৈবক্রমে, ক্যাম্ব্রিয়ান বিস্ফোরণের সময় কোষের উদ্ভব এবং বহুকোষী প্রাণসত্তাসমূহের দ্রুত বিস্তারের মধ্যবর্তী সময়ে কিরূপ বিবর্তন সংঘটিত হচ্ছিল তার একটি উত্তর।

সমৃদ্ধ, যেমনটি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বেশির ভাগ স্থান ; অর্থাৎ হাইড্রোজেন ক্ষরিত হয়ে গেছে পৃথিবী হতে শূন্যে, কিন্তু বিশাল বৃহস্পতি গ্রহ হতে নয় ; অর্থাৎ প্রাণের উদ্ভব ঘটেছিল হাইড্রোজেন হারিয়ে যাওয়ার পূর্বেই। উরে এরূপ গ্যাসকে স্ফুলিঙ্গের মতো প্রজ্বলিত করার জন্য বললেন, কেউ একজন তার কাছে জানতে চাইল যে, তিনি এরূপ একটি পরীক্ষণ হতে কী ফলাফল আশা করছেন। উরে উত্তরে বললেন, 'বাইলস্টাইন।' বাইলস্টাইন হল ২৮ খণ্ডের এক বিশাল জার্মান সংক্ষিপ্তসার, যাতে রসায়নবিদদের কাছে জ্ঞাত সকল জৈব অণুর তালিকা লিপিবদ্ধ আছে।

আদি পৃথিবীতে বিরাজিত সবচেয়ে প্রাচুর্যময় গ্যাসসমূহ এবং রাসায়নিক বন্ধন ভেঙে ফেলে এরূপ যে কোনো শক্তি ব্যবহার করে, আমরা উৎপন্ন করতে পারি প্রাণের প্রয়োজনীয় নির্মাণ-ব্লক। কিন্তু আমাদের পাত্রে ছিল প্রাণ-সংগীতের কেবল স্বরসমূহই—প্রাণ-সংগীত নিজে নয়। আণবিক নির্মাণ-ব্লকসমূহকে অবশ্যই একত্রে বসাতে হবে সঠিক ক্রমে। অ্যামিনো এসিডগুলো প্রাণের জন্য যে প্রোটিন তৈরি করে এবং নিউক্লিওটাইডগুলো যে নিউক্লিক এসিড তৈরি করে প্রাণ নিশ্চিতভাবেই তার চাইতে অধিক কিছু। কিন্তু তবু এই নির্মাণ-ছাঁচসমূহকে দীর্ঘ-শিকল অণুতে সজ্জিত করার জন্য, গবেষণাগারে অর্জিত হয়েছে যথেষ্ট সাফল্য। আদি পৃথিবীর অবস্থাতে অ্যামিনো এসিডগুলোকে যুথবদ্ধ করে পরিণত করা গেছে প্রোটিন সদৃশ অণুতে। এদের কিছু কিছু মৃদুভাবে নিয়ন্ত্রণ করে প্রয়োজনীয় রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলোকে, যেমনটি করে থাকে এনজাইমগুলো। নিউক্লিওটাইডগুলো একত্রিত করা হল কয়েক ডজন একক পরিমাণ দৈর্ঘ্যের নিউক্লিক এসিড রজ্জুতে। টেস্টটিউবে অনুকূল পরিবেশে হ্রস্ব নিউক্লিক এসিডগুলো নিজেদের অবিকল অনুকৃতি সংশ্লেষণ করতে পারে।

এখনো কেউ আদি পৃথিবীর গ্যাস ও পানিকে মিশ্রিত করেনি এবং পরীক্ষণের শেষে টেস্টটিউব থেকে হামাগুড়ি দিয়ে কিছু বেরিয়ে আসেনি। আমাদের জ্ঞাত সব ক্ষুদ্রতম জীব ভাইরয়েডগুলো, ১০,০০০ এর কম সংখ্যক অণু দ্বারা গঠিত। এরা চাষাবাদকৃত কিছু গাছপালায় কতকগুলো রোগ সৃষ্টি করে এবং সম্ভবত খুব সাম্প্রতিক সরল প্রাণ-সত্তার তুলনায় অপেক্ষাকৃত জটিল প্রাণ-সত্তায় বিবর্তিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এর চাইতেও সরল কোনো প্রাণ-সত্তা কল্পনা করা কঠিন যা যে কোনো দৃষ্টিতে জীবিত। ভাইরয়েডগুলো প্রধানত গঠিত হয় নিউক্লিক এসিড দ্বারা, ভাইরাসের সাথে বিসদৃশ রূপে এবং এদের রয়েছে একটি প্রোটিন আবরণও। এরা একটি রৈখিক বা বন্ধবৃত্ত জ্যামিতিক আকার সম্পন্ন RNA-এর একটিমাত্র রজ্জু ছাড়া আর কিছু নয়। ভাইরয়েডগুলো হতে পারে খুবই ক্ষুদ্র এবং তবুও বলিষ্ঠ এ কারণে যে, এরা আপসহীন এবং অবিশ্রান্ত পরজীবী। ভাইরাসের মতো, এরা শুধু অপেক্ষাকৃত বড়ো, ও সুচারুরূপে ক্রিয়াশীল কোষ দখল করে এবং একে আরো অধিক কোষ তৈরির কারখানা থেকে পরিবর্তিত করে আরো অধিক ভাইরয়েড তৈরির কারখানায়।

banglainternet.com

জ্ঞাত ক্ষুদ্রতম মুক্ত-জীবি প্রাণীসত্তা হল PPLO (প্লিওরোপনিউমোনিয়া সদৃশ প্রাণীসত্তা) এবং এ জাতীয় ক্ষুদ্র প্রাণী। এরা প্রায় পঞ্চাশ মিলিয়ন অণু দ্বারা গঠিত। এরূপ প্রাণীসত্তা, অধিকতর আত্মনির্ভর হওয়ার কারণে ভাইরয়েড ও ভাইরাস অপেক্ষা অধিকতর জটিল। কিন্তু আজকের দিনের পরিবেশ প্রাণের সরল রূপগুলোর জন্য খুব একটা অনুকূল নয়। বেঁচে থাকতে হলে করতে হয় কঠোর পরিশ্রম। শিকারি প্রাণীদের ব্যাপারে থাকতে হয় সতর্ক। তবে, আমাদের গ্রহের আদি ইতিহাসে, যখন হাইড্রোজেন-সমৃদ্ধ বায়ুমণ্ডলে সূর্য কর্তৃক উৎপন্ন হত প্রচুর পরিমাণ জৈব অণু, অতি সরল, অপরজীবীয় প্রাণীসত্তাগুলোর ছিল সংগ্রামের একটি অনুকূল সম্ভাবনা। প্রথম জীবসমূহ ছিল হয়ত কিছুটা মুক্ত-জীবী ভাইরয়েডদের মতো, কয়েকশত নিউক্লিওটাইডের সমান দৈর্ঘ্য সম্পন্ন। এরূপ জীব সৃষ্টি করার জন্য পরীক্ষণ-কাজ, শুরু হবে হয়ত এই শতাব্দীর শেষ দিকে। এখনো অনেক কিছু বাকি আছে প্রাণের উদ্ভবকে অনুধাবনের ক্ষেত্রে, বংশগতি সংকেতের উদ্ভবের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। কিন্তু আমরা এ জাতীয় পরীক্ষণ নিয়ে কাজ করছি মাত্র ত্রিশ বছরের মতো সময় ধরে। প্রকৃতিতে এর শুরু চার বিলিয়ন বছর পূর্বে। মোটের উপর, আমরা খুব একটা খারাপ করি নি।

এসব পরীক্ষণের কোনো কিছুই অনন্য নয় এই পৃথিবীতে। আদি গ্যাসসমূহ এবং শক্তির উৎসসমূহ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র একইরকম। আমাদের গবেষণাগারের পাত্রগুলোতে সম্পন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলোর মতো কোনো কিছু হয়ত আন্তঃনাক্ষত্রিক স্থানে জৈব পদার্থগুলো এবং উল্কাপিণ্ডে অ্যামিনো এসিডের উপস্থিতির কারণ। 'মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সি'-তে অন্য আরো বিলিয়ন সংখ্যক গ্রহতে এরকম কিছু রসায়নের অস্তিত্ব অবশ্যই থাকবে। প্রাণের অণুসমূহ পূর্ণ করে রাখে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে।

কিন্তু যদি অন্যকোনো গ্রহতে আণবিক রসায়ন আমাদের এখানকার মতো হয়েও থাকে, এরূপ আশা করার কোনো কারণ নেই যে তারা আমাদের গ্রহের প্রাণী সত্তাসমূহের সাথে সাদৃশ্য বহন করবে। বিবেচনা করুন পৃথিবীর জীব জগতের বিপুল বৈচিত্র্যের কথা, যাদের সকলেই একই গ্রহ এবং একজাতীয় আণবিক জীববিজ্ঞানের অংশীদার। অন্য গ্রহসমূহের জন্তু বা তরুলতাগুলো আমাদের পরিচিত প্রাণীসত্তাগুলো হতে সম্পূর্ণ ভিন্নরকমের। হয়ত থাকতে পারে সমকেন্দ্রমুখী বিবর্তন, কারণ একটি বিশেষ পরিবেশগত সমস্যার হয়ত থাকবে একটিমাত্র সর্বোত্তম সমাধান—উদাহরণ স্বরূপ, দুটি চোখ, দৃশ্যমান কম্পাংকে বাইনোক্যুলার দৃষ্টির জন্য। কিন্তু সাধারণভাবে বিবর্তন প্রক্রিয়ার অনুমেয় বৈশিষ্ট্যগুলো হয়ত সৃষ্টি করবে এমন সব বহির্জাগতিক জীব যেগুলো আমাদের জ্ঞাত জগৎ হতে সম্পূর্ণ ভিন্নরকমের।

আমি আপনাদেরকে বলতে পারি না একটি বহির্জাগতিক প্রাণী দেখতে ঠিক কীরকম হবে। আমি এই সত্য দ্বারা ভীষণভাবে সীমাবদ্ধ যে, আমি জানি কেবলমাত্র একরকমের প্রাণ, পৃথিবীর প্রাণ। কিছু মানুষ—উদাহরণ স্বরূপ কল্পবিজ্ঞান লেখক

এবং শিল্পী—অনুমান করেছেন বহির্জাগতিক প্রাণী দেখতে কিরূপ সেই সম্পর্কে। আমি এসব দৃষ্টিভঙ্গির বেশির ভাগের ব্যাপারেই সংশয়যুক্ত। আমার কাছে মনে হয় তারা এরইমধ্যে আমাদের জ্ঞাত প্রাণ-রূপগুলোর উপর খুব বেশিরকম নির্ভর করেছেন। প্রতিটি প্রাণীসত্তার থাকে স্বকীয় ও ভিন্ন রকমের ধাপসমূহের এক দীর্ঘ ধারার পথ চলা। আমি মনে করি না যে অন্য কোথাও প্রাণীসত্তা দেখতে হবে কোনো সরীসৃপ বা কোনো পতঙ্গ বা মানুষের মতো—এমনকি সুবজ ত্বক, সূচাগ্র বর্ণ এবং শুঙ্গের মতো নগণ্য সাদৃশ্যের ক্ষেত্রেও নয়। কিন্তু যদি আপনি পীড়াপীড়ি করেন, আমি একেবারেই অন্যরকম কিছু কল্পনা করতে চেষ্টা করব।

বৃহস্পতির মতো গ্যাস-গ্রহে, যার রয়েছে হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, মিথেন, পানি এবং অ্যামোনিয়া সমৃদ্ধ বায়ুমণ্ডল, যার নেই কোনো অভিগম্য কঠিন পৃষ্ঠ, অধিকন্তু রয়েছে একটি ঘন, মেঘাচ্ছন্ন বায়ুমণ্ডল যাতে জৈব অণুগুলো আকাশ হতে হয়ত পতিত হবে স্বর্গীয় বস্তুর মতো, আমাদের গবেষণাগার পরীক্ষণসমূহের ফলাফলগুলোর মতো। তথাপি, এরকম একটি গ্রহে আছে প্রাণের প্রতিবন্ধক স্বরূপ একটি বৈশিষ্ট্য : বায়ুমণ্ডলটি ঝঞ্ঝাময়, এবং অতি গভীরে এটি অত্যন্ত উষ্ণ। একটি প্রাণীসত্তাকে অবশ্যই সাবধান থাকতে হবে যাতে সে নিচে চলে না যায় এবং তাপে ফ্রাই না হয়ে যায়।

এমন একটি ভিন্নরকমের গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব যে একেবারেই অসম্ভব নয় তা দেখাতে, 'কর্নেল'-এ আমার সহকর্মী ই. ই. স্যালপিটার ও আমি কিছু হিসাব সম্পন্ন করেছিলাম। অবশ্যই, আমরা সূক্ষ্মভাবে জানতে পারি না এমন একটি স্থানে প্রাণ কেমন হবে, কিন্তু আমরা দেখতে চেয়েছিলাম যদি, পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নের বিধিগুলোর মধ্যে, এরকম এটি জগৎ জীব-বসতি সম্পন্ন হত।

এরূপ অবস্থায় বাস করার একটি উপায় হল তাপে শুষ্ক হয়ে যাওয়ার পূর্বেই পুনরুৎপাদন করা এবং পরিচলন প্রক্রিয়ায় এদের কিছু অংশ চলে আসবে বায়ুমণ্ডলের উপরের দিকের অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা স্তরে। এরূপ প্রাণী-সত্তার সংখ্যা খুব কম হওয়ারই কথা। আমরা এদেরকে বলি 'সিংকার'। আবার 'ফ্লোটার'-ও হওয়া সম্ভব, বিশাল এক হাইড্রোজেন বেলুন, যার ভিতর থেকে বেরিয়ে যায় হিলিয়াম ও অন্যান্য অপেক্ষাকৃত ভারি গ্যাসসমূহ এবং থেকে যায় হালকাতম গ্যাস, হাইড্রোজেন ; অথবা এক উত্তপ্ত বায়ুর বেলুন, একটি ফ্লোটার যত গভীরে থাকে, একে বায়ুমণ্ডলের অপেক্ষাকৃত উপরের ঠাণ্ডা ও নিরাপদ অঞ্চলে ফিরিয়ে আনার জন্য প্লবতা বলটিও তত শক্তিশালী। একটি ফ্লোটার হয়ত খেয়ে ফেলতে পারে পূর্বে তৈরিকৃত জৈব অণুসমূহকে, অথবা নিজেরটা নিজে তৈরি করে নেয় সূর্যালোক এবং বায়ু হতে, যেমনটি পৃথিবীতে করে গাছপালারা। একটি বিবেচনায়, ফ্লোটার আকৃতিতে যত বড়ো হবে এটি তত বেশি দক্ষ হবে। স্যালপিটার এবং আমি কল্পনা করেছিলাম যে, ফ্লোটারগুলো কয়েক কিলোমিটার লম্বা, যে কোনো কালের সবচেয়ে বড়ো তিমি অপেক্ষাও বৃহত্তর, শহরের সমান আকৃতির প্রাণী।

banglainternet.com

ফ্লোটারসমূহ হয়ত গ্রহটির বায়ুমণ্ডলের ভিতর দিয়ে দমকা গ্যাসের সাহায্যে ছুটে চলতে পারে একটি র‍্যামজেট বা একটি রকেটের মতো দ্রুত। আমরা এদেরকে কল্পনা করি যতদূর চোখ যায় এক বিশাল অলস দল রূপে, এদের ত্বকে থাকবে বিভিন্ন সজ্জা, অভিযোজনমূলক ছদ্মাবরণ ইঙ্গিত করে যে, এদের সমস্যাও ছিল। কারণ এমন একটি পরিবেশে রয়েছে কমপক্ষে আরো একটি বাস্তুসংক্রান্ত বিষয় : শিকার ধরা। শিকারি প্রাণীরা দ্রুত এবং কৌশলী। তারা খেয়ে ফেলে ফ্লোটারদেরকে, তাদের জৈব অণুর জন্য এবং তাদের বিশুদ্ধ হাইড্রোজেন সঞ্চয়ের জন্য, উভয় উদ্দেশ্যেই। গহবরের সিংকারগুলো বিবর্তিত হতে পারত প্রথম ফ্লোটারগুলোতে, এবং স্ব-চালিত ফ্লোটারগুলো বিবর্তিত হয়ে থাকতে পারে প্রথম শিকারি প্রাণীতে। খুব বেশি শিকারি প্রাণী থাকার কথা নয়, কারণ যদি তারা খেয়ে ফেলে সব ফ্লোটারকে, তবে শিকারি প্রাণীগুলো নিজেরাই বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

এমন প্রাণ-রূপের প্রতি অনুমোদন দেয় পদার্থবিজ্ঞান এবং রসায়ন। শিল্পকলা এদেরকে দান করে একটি নির্দিষ্ট বিনোদন। অবশ্য, প্রকৃতি আমাদের অনুমানকে অনুসরণ করতে বাধ্য নয়। কিন্তু মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সিতে যদি বিলিয়ন বিলিয়ন বসতিপূর্ণ গ্রহ থেকে থাকে তবে সম্ভবত এদের অল্পকিছুই সিংকার, ফ্লোটার এবং শিকারি প্রাণীর বসতি ধারণ করবে, যেগুলো হল আমাদের কল্পনা, উৎপন্ন হয়েছে পদার্থবিজ্ঞান এবং রসায়নের সূত্রগুলোর প্রণোদনায়।

জীববিজ্ঞান পদার্থবিজ্ঞানের চেয়ে ইতিহাসের সাথেই বেশি সাদৃশ্য বহন করে। বর্তমানকে উপলব্ধি করতে হলে আপনাকে উপলব্ধি করতে হবে অতীতকে। এবং আপনাকে এটি জানতে হবে নিখুঁত ও সূক্ষ্মভাবে। জীববিজ্ঞানে এখনো নেই ভবিষ্যদ্বাণী করার মতো কোনো তত্ত্ব, তেমনি ইতিহাসের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। কারণগুলো একই : উভয় বিষয় আমাদের জন্য এখনো অতি জটিল। কিন্তু আমরা নিজেদেরকে অপেক্ষাকৃত ভালোভাবে জানতে পারি অন্যদেরকে অনুধাবন করার মাধ্যমেই। বহির্জাগতিক প্রাণের একটিমাত্র দৃষ্টান্তই, যতই সামান্য হোক না কেন, জীববিজ্ঞানের সংকীর্ণতা দূর করবে। প্রথমবারের মতো জীববিজ্ঞানীরা জানবেন অন্যরকমের প্রাণ কীরকম হতে পারে। যখন আমরা বলি যে অন্য কোথাও প্রাণের অনুসন্ধানটি গুরুত্বপূর্ণ, আমরা নিশ্চয়তা দিচ্ছি না যে, এটি পাওয়া সহজ হবে—শুধু এটুকুই বলি যে, এটি অতি মূল্যবান অনুসন্ধান হবে।

আমরা এতদিন কেবলমাত্র একটি ক্ষুদ্র গ্রহেই প্রাণের শব্দ শুনেছি। কিন্তু আমরা অবশেষে মহাজাগতিক সংগীতে অন্যান্য কণ্ঠস্বর শুনতে শুরু করেছি।

তৃতীয় অধ্যায়
জগৎসমূহের ঐকতান

(আমরা কখনো প্রশ্ন করি না কী প্রয়োজনে পাখিরা গান করে, কারণ গানের জন্য সৃষ্টি হওয়ার পর থেকেই তারা গান গায়। একইভাবে, আমাদের জানতে চাওয়া উচিত নয় কেন মানব মন নভোলোকের গোপন রহস্যগুলো অনুধাবনের জন্য এত সচেষ্ট...। প্রকৃতির ঘটনাগুলোর বৈচিত্র্য এতটাই বেশি এবং নভোলোকের লুকোনো ঐশ্বর্য এতটাই সমৃদ্ধ, এত সূক্ষ্ম শৃঙ্খলায় যে মানব মন বিশুদ্ধ চর্চায় কখনোই পিছপা হবে না)

—জোহানেস কেপলার, 'মিস্টেরিয়াম কসমোগ্রাফিকাম'

যদি আমরা এমন কোনো গ্রহে বাস করতাম যেখানে কোনো কিছুর কখনো পরিবর্তন ঘটে না, তবে আমাদের সামান্য কিছুই করার থাকত। কোনোকিছুই উপলব্ধি করার প্রয়োজন পড়ত না। বিজ্ঞানের জন্য থাকত না কোনো প্রণোদনা। এবং আমরা যদি একটি অননুমেয় জগতে বাস করতাম, যেখানে বস্তুসমূহ বদলে যায় বিক্ষিপ্তভাবে বা জটিল উপায়ে, তবে আমরা কোনোকিছুই অনুধাবন করতে পারতাম না। সেই ক্ষেত্রেও, বিজ্ঞানের মতো কোনোকিছু থাকত না। কিন্তু আমরা বাস করি এমন এক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে, যেখানে বস্তুসমূহ পরিবর্তনশীল কিন্তু তা ঘটে কিছু শৃঙ্খলা ও নিয়ম মেনে, যাদেরকে আমরা প্রাকৃতিক সূত্র বলে থাকি। যদি আমি একটি দণ্ডকে উপরে শূন্যে নিক্ষেপ করি, এটি সর্বদাই পতিত হয় নিচের দিকে। সূর্য অস্ত যায় পশ্চিমে, সর্বদাই এটি আবার উদিত হয় পূর্ব দিকে। এবং তাই বিষয়গুলোকে উপলব্ধি করা সহজ হয়। আমরা কাজ করতে পারি বিজ্ঞান নিয়ে এবং এর সাহায্যে আমাদের জীবনকে উন্নত করতে পারি।

জগৎকে অনুধাবন করার ক্ষেত্রে মানবজাতি যথেষ্ট দক্ষ। আমরা সর্বদা তেমনি ছিলাম। আমরা শিকার ধরতে বা আগুন জ্বালাতে সমর্থ ছিলাম শুধু এই কারণে যে, আমরা গভীর উপলব্ধির মাধ্যমে কোনোকিছু সমাধান করতে পারতাম। এমন একটি সময় ছিল যখন টেলিভিশন, চলচ্চিত্র, রেডিও বা বই—কিছুই ছিল না। মানব অস্তিত্বের প্রায় পুরোটা সময় অতিবাহিত হয়েছে এরূপ সময়ের ভেতর দিয়েই। জ্যোৎস্নাহীন রাতে খোলা আকাশের নিচে প্রায় নিবে যাওয়া উনুনের ছাইয়ের উপর দিয়ে, আমরা তাকিয়ে থাকতাম নক্ষত্রের দিকে।

রাতের আকাশ মন্ত্রমুগ্ধকর। সেখানে রয়েছে সুবিন্যস্ত সজ্জা। এমনকি চেষ্টা না করেও আমরা সেখানে কল্পনা করতে পারি যে কোনো ছবি। উদাহরণস্বরূপ,

banglainternet.com

উত্তরের আকাশে, রয়েছে একটি বিশেষ সজ্জা বা নক্ষত্রপুঞ্জ, যা দেখতে কিছুটা ভল্লুকের মতো। কেউ কেউ এটিকে বলে 'সপ্তর্ষিমণ্ডল'। অন্যরা দেখে সম্পূর্ণ ভিন্নরকম প্রতিবিম্ব। এই ছবিগুলো অবশ্যই নয় রাতের আকাশের কোনোকিছু ; আমরা নিজেরাই এদেরকে সেখানে কল্পনা করলাম। আমরা ছিলাম শিকারি দল, এবং আমরা দেখলাম শিকারি ও কুকুর, ভল্লুক ও তরুণী, সব কিছুই আমাদের কাছে আগ্রহের বিষয়। যখন সপ্তদশ শতাব্দীর ইয়োরোপীয় নাবিকরা প্রথম দেখতে পেল দক্ষিণের আকাশ, তখন তারা নভোলোকে কল্পনা করল সপ্তদশ শতাব্দীর চমৎকার সব বস্তু—toucan এবং ময়ূর, দূরবীক্ষণ এবং অণুবীক্ষণ যন্ত্র, দিকদর্শন যন্ত্র এবং জাহাজের পশ্চাদ্‌ভাগ। যদি নক্ষত্রপুঞ্জগুলোর নামকরণ করা হত বিংশ শতাব্দীতে, আমি মনে করি, আমরা হয়ত আকাশে দেখতাম বাইসাইকেল এবং রেফ্রিজারেটর, রক এন্ড রোল 'তারকা'দেরকে এবং এমনকি হয়ত মাশরুম মেঘ—নক্ষত্রের মাঝে স্থাপিত মানুষের এক নূতন আশা ও ভয়ের সমন্বয়।

মাঝে মাঝে আমাদের পূর্বপুরুষরা দেখতে পেত লেজযুক্ত খুব উজ্জ্বল এক নক্ষত্র, যা দেখা দিত ক্ষণিকের জন্য, আকাশে ধাবিত হত প্রচণ্ড বেগে। তারা একে বলত 'পতনশীল নক্ষত্র', কিন্তু এটি কোনো ভালো নাম নয় : পতনশীল নক্ষত্ররা পতিত হওয়ার পরেও সেখানে থেকে যায় অনেক নক্ষত্র। কোনো কোনো ঋতুতে পতিত হয় অনেক নক্ষত্র ; অন্যসময়ে খুব অল্প সংখ্যক। এখানেও রয়েছে এক ধরনের নিয়ম।

সূর্য এবং চাঁদের মতো, নক্ষত্ররা সর্বদা উদিত হয় পূর্বদিকে এবং অস্ত যায় পশ্চিমে, যদি তারা মাথার উপর দিয়ে অতিক্রম করে তবে আকাশকে পাড়ি দিতে তাদের চলে যায় সারাটা রাত। বিভিন্ন ঋতুতে রয়েছে বিভিন্ন নক্ষত্রপুঞ্জ। যেমন, শরতের শুরুতে সর্বদা উদিত হয় একই নক্ষত্রপুঞ্জ। এরূপ কখনোই ঘটে না যে, একটি নতুন নক্ষত্রপুঞ্জ হঠাৎ জেগে উঠবে পূর্বদিকে। নক্ষত্রগুলোর ক্ষেত্রে আছে একটি নিয়ম, একটি অনুমানযোগ্যতা, একটি স্থায়িত্ব। কোনো একভাবে, এরা খুবই স্বস্তিকর।

কিছু নক্ষত্র উদিত হয় সূর্যোদয়ের সামান্য আগে এবং অস্ত যায় সূর্যাস্তের সামান্য পরে—সময় ও অবস্থানে তা ঋতু অনুযায়ী ভিন্নতর হয়। অনেক বছর ধরে যদি আপনি নক্ষত্রদেরকে সযত্নে পর্যবেক্ষণ করেন ও উপাত্ত সংগ্রহ করেন, আপনিও ঋতুগুলো অনুমান করতে পারবেন। আপনি পরিমাপ করতে পারবেন বছরের সময়কালও, দিগন্তে প্রতিদিন সূর্য কোথায় উদিত হত তা লক্ষ রেখে। আকাশে ছিল এক বিশাল ক্যালেন্ডার, যে কারো কাছেই যা ব্যবহারযোগ্য যদি তার থাকে ধৈর্য, সামর্থ্য ও উপাত্ত সংরক্ষণের উপায়।

আমাদের পূর্বপুরুষেরা অতিক্রমশীল ঋতুগুলোর সময়ক্ষণ পরিমাপ করার জন্য নির্মাণ করেছিল বিভিন্ন যন্ত্রপাতি। নিউ মেক্সিকোর চ্যাকো ক্যানিয়নে, রয়েছে এক বিশাল, ছাদহীন আনুষ্ঠানিক Kiva বা মন্দির, যার তারিখ উল্লেখিত আছে

একাদশ শতাব্দী হতে। বছরের দীর্ঘতম দিন, ২১ জুনে, সূর্যালোকের একটি রশ্মিগুচ্ছ একটি জানালায় প্রবেশ করল ভোরে এবং ধীরে ধীরে এমনভাবে সরে গেল যে এটি মূর্তি রাখার একটি বিশেষ কোটরকে আচ্ছাদিত করে ফেলল। কিন্তু এটি ঘটে কেবলমাত্র ২১ জুনের দিকে। আমি কল্পনা করি যে, গর্বিত অ্যানাসাজি জনতা, যারা নিজেদেরকে বর্ণনা করেছিল 'প্রাচীন এক দল' বলে, প্রতি ২১ জুনে জড়ো হত তাদের মন্দিরের বিশেষ আসনে, সূর্যের ক্ষমতা উদ্‌যাপন করার জন্য পরিধান করত পালক, ঝুমঝুমি এবং সবুজাভ নীল বর্ণের রত্ন বিশেষ। তারা চাঁদের আপাত গতিও পর্যবেক্ষণ করে : Kiva তে আটাশটি উঁচু কোটর হয়ত নক্ষত্রপুঞ্জের মাঝে একই অবস্থানে ফিরে আসতে চাঁদের যতদিন সময় লাগে তাকেই নির্দেশ করে। এই সকল লোক গভীর মনোযোগ দিয়েছিল সূর্য, চাঁদ এবং নক্ষত্রের দিকে। একই ধারণার উপর ভিত্তি করে নির্মিত যন্ত্র পাওয়া গেছে কম্বোডিয়ার অ্যাংকর ওয়াটে ; ইংল্যান্ডের স্টোনহেঞ্জে ; মিশরের আবু সিম্বেলে ; মেক্সিকোর চিকেন ইট্‌জাতে ; উত্তর আমেরিকার গ্রেট প্লেইনে।

কিছু বর্ষপঞ্জিভিত্তিক যন্ত্র হয়ত হয়েছে দৈবক্রমে—যেমন, ২১ জুনে জানালা এবং মূর্তির কোটরের দৈবভাবে সারিবদ্ধ হওয়ার ঘটনা। কিন্তু অন্যকিছু যন্ত্র আছে যেগুলো সম্পূর্ণ ভিন্নরকমের। দক্ষিণ-পশ্চিম আমেরিকার কোনো এক স্থানে রয়েছে তিনটি খাড়া পাথরের টুকরা যেগুলোকে এদের মূল অবস্থান হতে সরিয়ে ফেলা হয়েছে প্রায় ১০০০ বছর পূর্বে। একটি পেঁচানো বিন্যাস যা দেখতে কিছুটা গ্যালাক্সির মতো, খোদাই করা হয়েছে পাথরের উপর। গ্রীষ্মের প্রথম দিন ২১ জুনে, একগুচ্ছ আলোক রশ্মি পাথরের টুকরোগুলোর মধ্যবর্তী ছিদ্রপথে ঢুকে পড়ে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলে পেঁচানো বিন্যাসটিকে, এবং শীতের প্রথম দিন ২১ ডিসেম্বরে, দুই গুচ্ছ আলোক রশ্মি পেঁচানো বিন্যাসটির পার্শ্বদেশে পড়ল, আকাশের বর্ষপঞ্জি পড়ার জন্য মধ্যদিনের সূর্যের এক নিপুণ প্রয়োগ।

জ্যোতির্বিজ্ঞান জানার জন্য বিশ্বব্যাপী মানুষ এত সচেষ্ট হল কেন ? আমরা শিকার করলাম গজলা-হরিণ, কৃষ্ণসার মৃগ এবং মহিষ, যাদের স্থানান্তর ক্রমশ কমে আসছিল এবং বৃদ্ধি পাচ্ছিল ঋতুক্রমে। ফল এবং বাদাম কখনো কখনো আহরিত হওয়ার অবস্থায় থাকত কিন্তু সব কিছুর ক্ষেত্রে তা সত্য নয়। যখন আমরা কৃষিকাজ আবিষ্কার করলাম, আমাদেরকে যত্নশীল হতে হল গাছপালার প্রতি এবং ফসল তুলতে হল সঠিক ঋতুতে। যাযাবর গোত্রদের বার্ষিক মিলন বিশেষ সময়ে অনুষ্ঠিত হত। আকাশে বর্ষপঞ্জি পাঠ করার সামর্থ্য ছিল আক্ষরিক অর্থেই এক বাঁচা-মরার বিষয়। নতুন চাঁদের পর অর্ধচন্দ্রের পুনঃআবির্ভাব ; পূর্ণ গ্রহণের পর সূর্যের আবার ফিরে আসা ; রাতে কষ্টকদায়ক অনুপস্থিতির পর ভোরে আবার সূর্যের উদয় পৃথিবীময় লক্ষ করল মানুষেরা : এই ঘটনাটি আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে বলল মৃত্যুকে অতিক্রম করার সম্ভাবনার কথা। উপরে এই আকাশে ছিল এক অমরতার রূপক।

banglainternet.com

দক্ষিণ-পশ্চিম আমেরিকার গভীর গিরিখাতসমূহের মধ্য দিয়ে কশাঘাতের শব্দ তুলে ছুটে চলে বায়ু এবং আমরা ব্যতীত তা শোনার কেউ নেই আর—আমরা আমাদের পূর্বে জন্ম নেয়া চিন্তনশীল নর-নারীর ৪০,০০০ প্রজন্মের এক অবশেষ, যাদের সম্বন্ধে আমরা প্রায় কিছুই অবহিত নই, যাদের উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের সভ্যতা।

কালের অতিক্রমের সাথে সাথে, মানুষ শিখল তার পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে। সূর্য, চাঁদ এবং নক্ষত্রদের অবস্থান এবং গতি যত নিখুঁতভাবে আপনি জানতেন, অধিক বিশ্বস্ততার সাথে আপনি ধারণা করতে পারবেন, কখন শিকার করতে হবে, কখন বীজ বপন ও ফসল কাটতে হবে, কখন গোত্রগুলোকে একত্রিত হতে হবে। পরিমাপের শুদ্ধতা যত বৃদ্ধি পেতে থাকল, রেকর্ডসমূহকে সংরক্ষণ করতে হল, কাজেই জ্যোতির্বিদ্যা উৎসাহিত করল পর্যবেক্ষণ এবং গণিত এবং লিখনের উন্নতিকে।

কিন্তু অনেক পরে, আরো একটি অধিকতর কৌতূহলোদ্দীপক ধারণার উদ্ভব ঘটল, আধ্যাত্মবাদ এবং অন্ধবিশ্বাসে এক প্রচণ্ড আঘাত, যা মূলত হল এক পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষাভিত্তিক বিজ্ঞান। সূর্য এবং নক্ষত্ররা নিয়ন্ত্রণ করত ঋতুকাল, খাদ্য এবং উষ্ণতাকে। চাঁদ নিয়ন্ত্রণ করত স্রোতকে, অনেক প্রাণীর জীবন-চক্রকে, এবং সম্ভবত নারীর রজঃস্রাব* কালকে—সন্তান কামনায় ব্যাকুল আবেগপ্রবণ এক প্রজাতির ক্ষেত্রে যার গুরুত্ব অপরিসীম। আকাশে ছিল আর এক-ধরনের বস্তু, পরিভ্রমণশীল বা ভবঘুরে নাক্ষত্রিক বস্তু, গ্রহসমূহ। আমাদের যাযাবর পূর্বপুরুষরা অবশ্যই গ্রহগুলোর প্রতি বোধ করেছিল কোনো আসক্তি। সূর্য এবং চাঁদকে গণনা থেকে বাদ দিলে তারা দেখতে পেত এদের কেবল পাঁচটিকে। এগুলো অধিকতর দূরের নক্ষত্রগুলোর পশ্চাৎপটে পরিভ্রমণশীল। অনেক মাস ধরে যদি আপনি এদের আপাত গতি পর্যবেক্ষণ করেন, এরা ত্যাগ করে একটি নক্ষত্রপুঞ্জ, প্রবেশ করে অন্যটিতে, এমনকি মাঝে মাঝে আকাশে সৃষ্টি করে একধরনের ধীর চক্রবদ্ধ ক্রিয়া। আকাশের সব কিছুই মানব জীবনে প্রকৃতই ছিল প্রভাব সঞ্চারী। গ্রহসমূহের প্রভাব কী হতে পারে?

সমকালীন পশ্চিমা সমাজে কোনো সংবাদপত্রকেন্দ্রে জ্যোতিষতত্ত্বের একটি ম্যাগাজিন ক্রয় করা খুবই সহজ; কিন্তু জ্যোর্তিবিদ্যার উপর কোনো বই পাওয়া অনেক দুষ্কর। কার্যত আমেরিকার প্রত্যেকটি সংবাদপত্রে জ্যোতিষতত্ত্বের উপর রয়েছে একটি করে প্রাত্যহিক কলাম; অথচ জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপর একটি সাপ্তাহিক কলাম খুঁজে পাওয়াও কঠিন হবে। যুক্তরাষ্ট্রে জ্যোতির্বিজ্ঞানীর তুলনায় জ্যোতিষীর সংখ্যা দশগুণ। কোনো অনুষ্ঠানে, যেখানে লোকজন জানে না যে আমি একজন বিজ্ঞানী, আমাকে কখনো কখনো প্রশ্ন করা হয়, 'আপনি কি মিথুন রাশির?' (সাফল্যের সম্ভবনা বারো ভাগের এক ভাগ), অথবা 'আপনি কি লক্ষণ বহন করছেন?'

* শব্দটির মূল হল 'চাঁদ'।

আমাকে কদাচ প্রশ্ন করা হয় যে, 'আপনি জানেন কি সুপারনোভা বিস্ফোরণে তৈরি হয় স্বর্ণ?' বা 'আপনি মনে করেন, কখন কংগ্রেস অনুমোদন করবে একটি মার্স রোভার?'

জ্যোতিষতত্ত্ব মত দেয় যে, আপনার জন্মের মুহূর্তে গ্রহগুলো যে নক্ষত্রপুঞ্জে অবস্থান করে তা আপনার ভবিষ্যৎকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। কয়েক হাজার বছর পূর্বে এই ধারণাটির বিকাশ ঘটে যে, গ্রহগুলোর গতি নির্ধারণ করে রাজা, রাজবংশ এবং সাম্রাজ্যের নিয়তি। জ্যোতিষীরা পর্যবেক্ষণ করল গ্রহগুলোর গতি এবং নিজেদেরকে প্রশ্ন করল যে, যেমন, শেষবার যখন মঙ্গল গ্রহ উদিত হচ্ছিল Goat নক্ষত্রপুঞ্জে তখন কী ঘটেছিল; সম্ভবত এবারও তেমনি কিছু একটা ঘটবে। এটি ছিল এক চতুর এবং ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। জ্যোতিষীরা নিযুক্তি পেল কেবল রাষ্ট্রের কাছে। অনেক দেশে এটি ছিল যে কারো জন্য এক প্রধান আক্রমণ, কিন্তু একজন রাষ্ট্রীয় জ্যোতিষীর জন্য আকাশের অশনিসংকেত পাঠ করা: একটি শাসকগোষ্ঠীকে ক্ষমতাচ্যুত করার একটি উত্তম উপায় ছিল এর পতনকে অনুমান করার মধ্যে। চীনা রাজ-জ্যোতিষীরা, যারা ভুল অনুমান করেছিল, মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিল। অন্যরা কেবল রেকর্ডগুলো নিয়ে কাজ করল যাতে পরবর্তীতে তারা ঘটনাগুলোর সাথে যথার্থ স্বস্তি বোধ করতে পারে। জ্যোতিষতত্ত্বের বিকাশ ঘটল পর্যবেক্ষণ, গণিত এবং রেকর্ড সংরক্ষণের এক উদ্ভট সমন্বয়ের মাধ্যমে; যার সাথে যুক্ত হল অস্পষ্ট চিন্তা এবং ধর্মীয় প্রতারণা।

কিন্তু গ্রহগুলো যদি জাতিসমূহের নিয়তিকে নির্ধারণ করতে পারে, তবে আগামীকাল আমার কী ঘটবে তারা সেটিকে প্রভাবিত করার সামর্থ্যকে কীভাবে এড়িয়ে চলতে পারে? ব্যক্তিক জ্যোতিষতত্ত্বের উদ্ভব ঘটল আলেকজান্দ্রীয় মিশরে এবং গ্রিক ও রোমান জগতের ভিতর দিয়ে ছড়িয়ে পড়ল প্রায় ২০০০ বছর পূর্বে। আজ আমরা জ্যোতিষতত্ত্বের প্রাচীনত্বকে অনুধাবন করতে পারি এসকল শব্দে, যেমন, 'disaster' যা হল গ্রিকদের জন্য 'bad star'-এর সমার্থক, 'influenza', হল (নাক্ষত্রিক ক্ষেত্রে) 'influence'-এর ইটালিয়ান রূপ, 'mazeltov'— হিব্রুদের জন্য, চূড়ান্তভাবে ব্যাবিলনীয়নের জন্য হল 'good constelletion'-এর সমার্থক, ইহুদিদের শব্দ 'shlamazel', প্রয়োগ করা হয় এমন কারো ক্ষেত্রে যে নির্মম দুর্ভাগ্যের দ্বারা তাড়িত, যা আবারো খুঁজে পাওয়া যায় ব্যাবলনীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান শব্দকোষে। প্লিনির মতে, রোমানদের মধ্যে অনেকেই এমনও ছিল যে, 'sideratio'কে 'Planet struck' বলে বিবেচনা করত। গ্রহগুলোকে ব্যাপকভাবে মনে করা হত মৃত্যুর প্রত্যক্ষ কারণ রূপে। অথবা বিবেচনা করুন 'consider' অর্থ হল, 'with the planets', স্পষ্টতই যা মারাত্মক প্রতিফলনের ক্ষেত্রে একটি আবশ্যকীয় শর্ত। বিবেচনা করুন ১৬৩২ সনে লন্ডন নগরীতে মৃত্যুর পরিসংখ্যানের কথা। শিশুরোগ এবং 'আলোর উদয়' ও 'রাজার অন্যায়'-এর মতো উদ্ভট রোগের দ্বারা সাধিত ক্ষয়ক্ষতির মধ্যে, আমরা দেখতে পাই যে, ৯,৫৩৫টি মৃত্যুর মধ্যে,

banglainternet.com

১৩জন আক্রান্ত হল 'Planet' দ্বারা, যা ক্যান্সারে মৃতের সংখ্যার চাইতেও অধিক। আমি বিস্মিত হই এই ভেবে যে, লক্ষণসমূহ কিরূপ ছিল।

এবং ব্যক্তিক জ্যোতিষতত্ত্ব এখনো আমাদের সহচর : ভাবুন, একই নগরীতে একই দিনে প্রকাশিত দুটি ভিন্ন সংবাদপত্রের জ্যোতিষতত্ত্বের কলামের কথা। উদাহরণ স্বরূপ, আমরা যাচাই করতে পারি ১৯৭৯ সনের ২১ সেপ্টেম্বরের New York Post এবং New York Daily News। ধরুন, আপনি একজন তুলা রাশির জাতক—অর্থাৎ আপনার জন্ম ২৩ সেপ্টেম্বর থেকে ২২ অক্টোবরের মধ্যে। Post-এর জ্যোতিষীর মতে, 'একটি আপসমূলক কাজ আপনার উৎকণ্ঠাকে কমিয়ে দেবে', হয়ত উপযোগী, কিন্তু কিছুটা অস্পষ্ট। Daily News-এর জ্যোতিষীর মতে, আপনি অবশ্যই 'নিজের কাছে বেশি দাবি করবেন', একটি সতর্কীকরণ, যেটিও অস্পষ্ট কিন্তু ভিন্নতর। এই 'ভবিষ্যদ্বাণীগুলো' কোনো ভবিষ্যদ্বাণীই নয় ; উপরন্তু এগুলো কতকগুলো উপদেশ মাত্র—এগুলো বলে কী করতে হবে তা, কী ঘটবে তা নয়। উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে, এগুলোকে এমন সার্বজনীন ভাষায় প্রকাশ করা হয় এবং এগুলো যে কারো ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হতে পারে। এবং এরা প্রকাশ করে বড়োরকমের পারস্পরিক অসামঞ্জস্য। এগুলো কেন খেলাধুলার পরিসংখ্যান এবং স্টক মার্কেট রিপোর্টের মতো কৈফিয়তবিহীনভাবে প্রকাশিত হয় ?

জ্যোতিষতত্ত্বকে পরীক্ষা করা যেতে পারে দুটি জমজ শিশুর জীবনের মাধ্যমে। এমন অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে একটি জমজের মৃত্যু ঘটে শৈশবেই যেমন, কোনো সাইকেল দুর্ঘটনায়, বা তড়িতাহত হয়ে, যখন অন্যজন একটি সমৃদ্ধ জীবনযাপন করে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত। অথচ হুবহু একই গ্রহসমূহ উদিত হয়েছিল তাদের জন্মক্ষণে। যদি জ্যোতিষতত্ত্ব সত্য হয়ে থাকে তবে এমন দুটি জমজ কেন পাবে এতটা ভিন্নতর নিয়তি ? এ থেকে এটিও উন্মোচিত হয় যে, একটি বিশেষ রাশি যা বোঝায় জ্যোতিষীগণ তার উপরেও একমত হতে পারে না। কতকগুলো সযত্ন পরীক্ষণে, যেসকল লোকের জন্মের* স্থান ও সময় ব্যতীত আর কিছুই জ্যোতিষীরা জানে না, তাদের চরিত্র ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তারা কিছুই ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে না।

---

* জ্যোতিষশাস্ত্র এবং সংশ্লিষ্ট মতবাদসমূহ সম্বন্ধে সংশয় পাশ্চাত্যের কাছে নতুন অথবা অনন্য কোনোটিই নয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ১৩৩২-এ কেনকোর সুরেজুরেগুসা কর্তৃক লিখিত 'আলস্য' শিরোনামের রচনাসমূহ হতে আমরা পাই :

'রেড টাং ডেজ'-এর বিষয়বস্তু সম্বন্ধে ইন-ইয়াং শিক্ষার জাপানে কিছু বলার নেই। পূর্বে জনগণ এই দিনগুলোকে এড়িয়ে চলত না—আমি ভেবে বিস্মিত হই এই প্রথাটি চালু করার জন্য কে দায়ী—যেমন, মানুষ বলতে শুরু করল যে, 'রেড টাং ডে'-তে শুরু করা উদ্যোগ কখনো এর শেষ দেখতে পায় না' অথবা, 'রেড টাং ডে'-তে যদি আপনি কিছু বলেন বা করেন, তবে আপনার ধ্বংস অবধারিত : আপনি যা কিছু জয় করেছেন, তার সব কিছুই হারাবেন, আপনার পরিকল্পনাসমূহ হবে ব্যর্থ।' বাজে কথা ! সতর্কভাবে 'সৌভাগ্যের দিনগুলো'-তে শুরু হওয়া প্রকল্পগুলোর ব্যর্থতা নিয়ে ভাবতেন, তবে তারা 'রেড টাং' দিনগুলোতে শুরু হওয়া উদ্যোগগুলোর অসাড়তা নিয়ে নীরব থাকতেন।

পৃথিবী নামক গ্রহটিতে জাতীয় পতাকাগুলো নিয়ে রয়েছে কৌতূহলোদ্দীপক কিছু একটা। যুক্তরাষ্ট্রের পতাকায় আছে পঞ্চাশটি তারকা, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ইসরাইলের একটি করে ; বার্মার চৌদ্দোটি ; গ্রানাডা এবং ভেনিজুয়েলার সাতটি ; চীনের পাঁচটি ; ইরাকের তিনটি ; সাওটমেই প্রিন্সাইপের দুটি ; জাপান, উরুগুয়ে, মালয়ি, বাংলাদেশ এবং তাইওয়ানের সূর্য ; ব্রাজিলের একটি আকাশ সম্পর্কীয় গোলক ; অস্ট্রেলিয়া, পশ্চিম সামোয়া, নিউজিল্যান্ড এবং পাপুয়া নিউগিনির পতাকায় Southern Cross-এর নক্ষত্রপুঞ্জ, ভুটানের ড্রাগন পার্ল, যা পৃথিবীর প্রতীক ; কম্বোডিয়ার অ্যাংকর ওয়াট যা একটি জ্যোর্তিবিদ্যা-বিষয়ক মানমন্দির ; ভারত, দক্ষিণ কোরিয়া এবং মঙ্গোলিয়ার বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সংক্রান্ত প্রতীক। অনেক সমাজতান্ত্রিক জাতি তাদের পতাকায় ব্যবহার করে তারকা চিহ্ন। অনেক ইসলামিক দেশের পতাকায় প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয় চাঁদ। বিশ্বের প্রায় অর্ধেক জাতীয় পতাকা প্রদর্শন করে জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক প্রতীক। ঘটনাটি আন্তঃসাংস্কৃতিক, দল নিরপেক্ষ, বিশ্বব্যাপী। এটি কেবল আমাদের কালেই সীমাবদ্ধ নয় : খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দের সুমেরুয় সিলিন্ডার সিলসমূহে এবং বিপ্লবপূর্ব চীনের টাওয়িস্ট পতাকাসমূহ উপস্থাপন করে তারকারাজি। আমি নিঃসন্দেহ যে, জাতিসমূহ আলিঙ্গন করতে চায় নভোলোকের ক্ষমতা এবং বিশ্বাসযোগ্যতার কিছু একটা। আমরা খুঁজে ফিরি মহাবিশ্বের সাথে আমাদের কোনো সংযোগ। আমরা গণনা করতে চাই বস্তুসমূহের বিশাল কোনো মাত্রায়। এবং এটি প্রকাশ করে যে, আমরা সংযুক্ত—জ্যোতিষীরা যেরকম ব্যক্তিক ও কল্পনাবিবর্জিত ক্ষুদ্র মাত্রায়, তেমন কিছু নয়, কিন্তু গভীরতম সব উপায়ে, পদার্থের মূলের সাথে পৃথিবীর বাসযোগ্যতা, মানব জাতির বিবর্তন এবং নিয়তির সাথে সংশ্লিষ্ট থেকে, যে সকল বিষয়ের মূলে আমরা আবার ফিরে আসব।

আধুনিক জনপ্রিয় জ্যোতিষতত্ত্ব সরাসরি ফিরে যায় ক্লডিয়াস টলেমিউসের কাছে, যাকে আমরা বলি টলেমি, যদিও তিনি একই নামের রাজাগণের সাথে অসম্পর্কিত ছিলেন। তিনি দ্বিতীয় খ্রিষ্টাব্দে কাজ করেন আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরিতে। গ্রহগুলো সংক্রান্ত সকল রহস্যময় কাজ যেগুলো এই সৌর বা চান্দ্র 'বাড়ি' বা 'কুম্ভরাশির কাল'-এর উপর ক্রমবর্ধমান প্রভাব বিস্তারকারী, এসেছে টলেমির কাছ থেকে, যিনি সারসংগ্রহের আকারে গ্রথিত করেন ব্যাবিলনীয় জ্যোতিষতত্ত্বের ঐতিহ্যকে। এখানে উদ্ধৃত করা হল টলেমির কালের বৈশিষ্ট্যবাহী রাশিচক্র, যা ১৫০ খ্রিষ্টাব্দে জন্ম নেয়া এক বালিকার উদ্দেশে গ্রিক ভাষায় লেখা হয়েছিল প্যাপিরাসের পাতায় : 'ফিলীর জন্ম। মহাধিপতি অ্যান্টোনিনাস সিজারের রাজত্বের দশম বছরে, ফ্যামেনথ ১৫ থেকে ১৬, রাত্রির প্রথম ভাগে। সূর্য তখন মীন রাশিতে, বৃহস্পতি এবং বুধ গ্রহ মেষরাশিতে, শনি কর্কটে, মঙ্গল সিংহরাশিতে, শুক্র এবং চাঁদ কুম্ভরাশিতে, রাশিচক্র মকর রাশি।' মধ্যবর্তী শতাব্দীগুলোতে জ্যোতিষতাত্ত্বিক নির্ভুলতার তুলনায় মাস এবং বছর গণনার পদ্ধতি পাল্টে গেছে

banglainternet.com

অনেক বেশি। টলেমির জ্যোতিষতাত্ত্বিক পুস্তক 'Tetrabiblos'-এর একটি বৈশিষ্ট্যসূচক উদ্ধৃতি এরকম : 'শনি, যদি সে থাকে প্রাচ্যে, তার প্রজাদেরকে দেখতে করে তোলে কৃষ্ণবর্ণের, শক্ত-সমর্থ, কালো চুলের, কোঁকরানো চুলের, পশমময় বক্ষবিশিষ্ট, চোখ হয় সাধারণ আকৃতির, উচ্চতা হয় মাঝারি, অতিরিক্ত আর্দ্রতা ও ঠাণ্ডায় হয় অসহিষ্ণু।' গ্রহ এবং নক্ষত্রগুলো দ্বারা শুধু যে আচরণগত প্রবণতাই প্রভাবিত হয় তা নয়, টলেমি এটিও বিশ্বাস করতেন যে, উচ্চতা, স্বাভাবিক গাত্রবর্ণ, জাতীয় চরিত্র এবং এমনকি জন্মগত শারীরিক অস্বাভাবিকত্ব নির্ধারিত হয় নক্ষত্রগুলো দ্বারা। এই বিষয়টিতে আধুনিক জ্যোতিষীরা মনে হয় গ্রহণ করেছে অপেক্ষাকৃত সাবধানি এক অবস্থান।

কিন্তু আধুনিক জ্যোতিষীরা ভুলে গেছে সূর্যের বিষুবরেখা অতিক্রম কালের নির্ভুলতা, যা অনুধাবন করেছিলেন টলেমি। তারা উপেক্ষা করল বায়ুমণ্ডলীয় প্রতিসরণ, যার সম্বন্ধে লিখেছিলেন টলেমি। তারা আদৌ কোনো মনোযোগ দেয় না সেই সকল উপগ্রহ এবং গ্রহ, গ্রহানুপুঞ্জ এবং ধূমকেতু, কোয়াসার এবং পাল্‌সার, উচ্চ শব্দে বিস্ফোরণশীল গ্যালাক্সি, মিথোজীবী নক্ষত্রসমূহ, আকস্মিক এবং প্রবল পরিবর্তনের চলকসমূহ কিংবা এক্স-রশ্মির উৎসসমূহের দিকে যেগুলো আবিষ্কৃত হয়েছে টলেমির কালের পরে। জ্যোতির্বিদ্যা হল একটি বিজ্ঞান—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের মতোই। জ্যোতিষতত্ত্ব হল ছদ্মবিজ্ঞান—কোনো গ্রহণযোগ্য সাক্ষ্য ছাড়াই এমন এক দাবি যে, অন্য গ্রহগুলো আমাদের প্রাত্যহিক জীবনকে প্রভাবিত করে। টলেমির কালে জ্যোতির্বিদ্যা এবং জ্যোতিষতত্ত্বের মধ্যে স্পষ্ট কোনো পার্থক্য ছিল না। কিন্তু আজ তা আছে।

একজন জ্যোতির্বিদ হিসেবে, টলেমি নামকরণ করেন নক্ষত্রগুলোর, এদের উজ্জ্বলতার মাত্রাকে লিপিবদ্ধ করেন, পৃথিবী যে একটি গোলক তা বিশ্বাস করার জন্য প্রদান করেন চমৎকার কারণ, গ্রহণসমূহ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্য কিছু নিয়ম উল্লেখ করেন এবং হয়ত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল এই যে, দূরবর্তী নক্ষত্রপুঞ্জের পটভূমিতে গ্রহগুলো কেন অদ্ভুত, পরিক্রমনশীল আচরণ প্রকাশ করে তা উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেন। গ্রহগুলোর গতি অনুধাবন করার জন্য তিনি বের করেন একটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক মডেল। এবং নভো-বাণীর সংকেত উদ্ধার করেন। নক্ষত্রলোক সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ টলেমির জন্য নিয়ে এল এক ধরনের পরমানন্দ। 'যদিও আমি মরণশীল', তিনি লিখলেন, 'আমি জানি যে, আমার জন্ম হয়েছে কেবল একদিনের জন্য। কিন্তু যখন আমি নিবিড় ও বিপুল সংখ্যক গ্রহকে এদের বৃত্তীয় গতির মাঝে সানন্দে পর্যবেক্ষণ করি, আমার পাগুলো আর মর্ত্য ভূমিতে থাকে না...।'

টলেমি বিশ্বাস করতেন যে, পৃথিবী ছিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রে ; অর্থাৎ সূর্য, চাঁদ এবং গ্রহ-নক্ষত্রগুলো পৃথিবীর চারদিকে পরিক্রমণশীল। এটি পৃথিবীতে খুব স্বাভাবিক একটি ধারণা। পৃথিবীকে মনে হয় নিয়মিত, দৃঢ়, অনড়, অথচ নভোমণ্ডলের বস্তু নিচয়কে আমরা দেখি প্রতিদিন উদিত হতে এবং অস্ত যেতে। প্রতিটি সংস্কৃতি

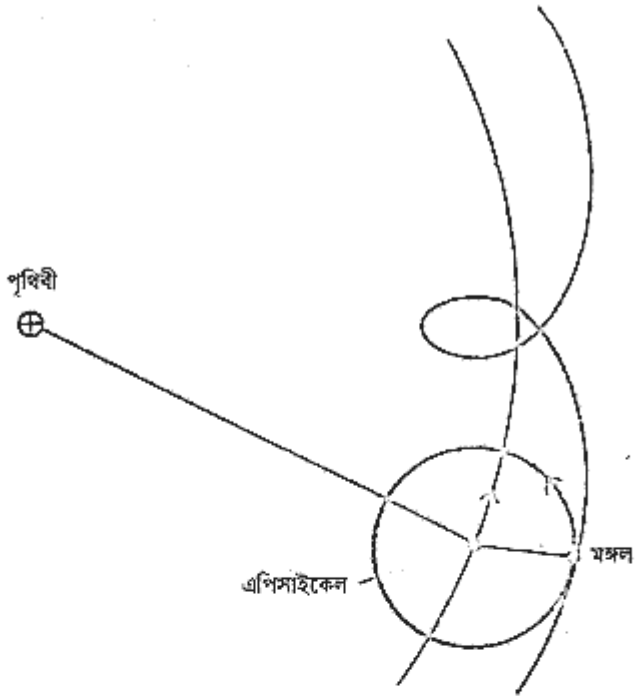

টলেমির পৃথিবী-কেন্দ্রিক ব্যবস্থায় গ্রহগুলোকে ধারণকারী এপিসাইকেলটি আর একটি বৃহত্তর ঘূর্ণনশীল গোলকের সংস্পর্শে থেকে স্থানান্তরিত হয় এবং দূরের নক্ষত্রগুলোর পশ্চাদ্‌পটের বিপরীতে সৃষ্টি করে পশ্চাৎমুখী আপাত গতি।

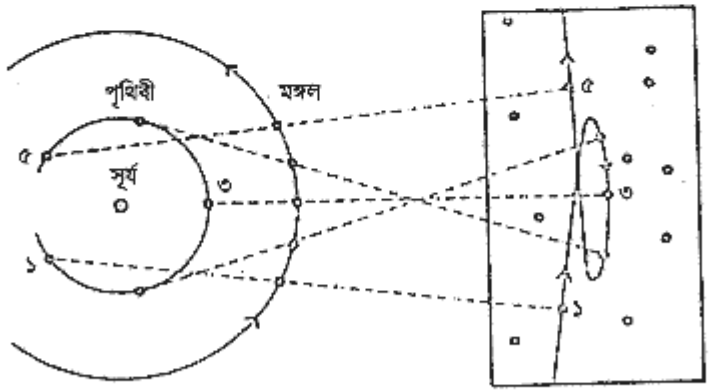

কোপার্নিকাসের ব্যবস্থায় পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহগুলো সূর্যের চারদিকে বৃত্তীয় কক্ষপথে আবর্তিত হয়। যখন পৃথিবী মঙ্গল গ্রহকে অতিক্রম করে, দ্বিতীয়টি দূরের নক্ষত্রগুলোর পশ্চাদ্‌পটের বিপরীতে প্রদর্শন করে এর পশ্চাৎমুখী আপাত গতি।

banglainternet.com

দ্রুত এগিয়ে গেল পৃথিবীকেন্দ্রিক প্রকল্পের দিকে। জোহানেস কেপলার লিখলেন, 'কোন দিক-নির্দেশনায় এর চেয়ে ভিন্ন কিছু কল্পনা করা অসম্ভব যে, পৃথিবী এক বিশাল বাড়ি এবং আকাশের খিলানটি এর উপরে স্থাপিত ; এটি স্থির এবং এর মাঝে সূর্য এত ক্ষুদ্র যে এটি আকাশে উড়ন্ত পাখির মতো চলে যায় এক স্থান হতে অন্য স্থানে।' কিন্তু আমরা কীভাবে ব্যাখ্যা করব গ্রহগুলোর স্পষ্টত প্রতীয়মান গতিকে—উদাহরণ স্বরূপ, মঙ্গলগ্রহ, যেটি টলেমির কালের হাজার হাজার বছর পূর্বেও জানা ছিল ? (প্রাচীন মিশরীয়গণ কর্তৃক মঙ্গল গ্রহকে প্রদত্ত একটি বিশেষণ ছিল 'sekded-ef em khetkhet', যার অর্থ হল 'যা ছুটে চলে পেছন দিকে', এর পশ্চাৎমুখী বা চক্রবদ্ধ গতির এক স্পষ্ট উল্লেখ।

গ্রহাদির গতি সংক্রান্ত টলেমির মডেলটি উপস্থাপিত হতে পারে একটি ছোটো যন্ত্র দ্বারা, সেগুলোর মতোই যেগুলো টলেমির কালে* একই উদ্দেশ্য সাধন করত। সমস্যাটি ছিল 'বহিঃপার্শ্ব'-এ, উপর থেকে গ্রহসমূহের 'প্রকৃত' গতি নির্ণয় করা, যা 'অন্তঃপার্শ্ব'-এ নিচ থেকে দেখার মতোই অতি নিখুঁতভাবে গ্রহসমূহের প্রতীয়মান গতিকে নির্ণয় করে।

গ্রহগুলো যথার্থ স্বচ্ছ গোলকসমূহের সাথে যুক্ত থেকে পৃথিবীর চারদিকে পরিক্রমনশীল বলে কল্পনা করা হত। কিন্তু এগুলো গোলকসমূহের সাথে সংযুক্ত থাকত সরাসরি নয়, পরোক্ষভাবে, এক ধরনের কেন্দ্রচ্যুত চাকার মাধ্যমে। গোলক সরে যায়, ক্ষুদ্র চাকাটি ঘূর্ণনশীল হয়, এবং পৃথিবী থেকে যেমনটি দেখা যায়, মঙ্গল গ্রহটি এর চক্রবদ্ধ প্রক্রিয়াটি শুরু করে। এই মডেলটি গ্রহাদির গতির যথেষ্ট নিখুঁত ভবিষ্যদ্বাণী করার উপায় করে দিল, নিশ্চিতভাবেই টলেমির কালে পরিমাপের সূক্ষ্মতার জন্য যা যথেষ্টই ছিল, এবং এমনকি আরো অনেক শতাব্দী পরেও।

টলেমির ইথারীয় গোলকসমূহ, যেগুলোকে কল্পনা করা হয়েছিল মধ্যযুগে, সেগুলো ক্রিস্টালের তৈরি বলেই ধরা হয়েছিল। আর এজন্যই আমরা এখনো কথা বলি গোলকগুলোর সুর এবং সপ্তম স্বর্গ (একটি 'স্বর্গ' অথবা গোলক ছিল চাঁদ, বুধ, শুক্র, সূর্য, মঙ্গল, বৃহস্পতি এবং শনির জন্য এবং আরো একটি অন্য সব নক্ষত্রের জন্য)-কে নিয়ে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রে আছে পৃথিবী, সৃষ্টি আবর্তিত হয় পার্থিব ঘটনাসমূহের সাপেক্ষে, স্বর্গসমূহকে কল্পনা করা হল চরম অপার্থিব নীতিমালার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বলে ; ফলে জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণের প্রতি মানুষের আগ্রহ থাকল সামান্যই। 'অন্ধকার যুগ' ব্যাপী চার্চ কর্তৃক সমর্থিত হয়ে টলেমির মডেল সহস্রাব্দের জন্য জ্যোতির্বিদ্যার অগ্রগতিকে থামিয়ে রাখতে সাহায্য করল। অবশেষে, ১৫৪৩ খ্রিষ্টাব্দে গ্রহগুলোর প্রতীয়মান গতিকে ব্যাখ্যা করার জন্য একটি

* চার শতাব্দী পূর্বে, এরূপ একটি যন্ত্র নির্মিত হয়েছিল আর্কিমিডিস কর্তৃক এবং সেটি রোমে পরীক্ষিত ও বর্ণিত হয়েছিল সিসেরো কর্তৃক, যেখানে এটি নিয়ে এসেছিলেন রোমান সেনাপতি মার্সেলাস, যার কোনো এক সৈন্য সিরাকিউস বিজয়ের কালে অকারণে এবং নিয়মগর্হিতভাবে হত্যা করে সপ্তচিপর বিজ্ঞানীটিকে।

সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের প্রকল্প প্রকাশিত হল নিকোলাস কোপার্নিকাস নামক এক পোলিশ ক্যাথলিক যাজক কর্তৃক। এর সবচেয়ে দুঃসাহসী বৈশিষ্ট্য ছিল এই বিবৃতিটি যে, পৃথিবী নয়, সূর্যই হল মহাবিশ্বের কেন্দ্র। পৃথিবীকে নামিয়ে দেয়া হল শুধু গ্রহগুলোর অন্যতম একটিতে, সূর্য থেকে তৃতীয়তে, যা একটি নিখুঁত বৃত্তাকার কক্ষপথে আবর্তনশীল। (টলেমি এরূপ একটি সৌরকেন্দ্রিক মডেলের কথা ভেবেছিলেন, কিন্তু অনতিবিলম্বে তা বাতিল করে দেন ; এরিস্টটলের পদার্থবিদ্যা মতে, পৃথিবীর সূচিত তীব্র ঘূর্ণনগতিকে পর্যবেক্ষণের সাথে বিপরীত বলে মনে হল)।

গ্রহগুলোর প্রতীয়মান গতি ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে হলেও এটি টলেমির গোলকসমূহের মতোই কাজ করল। কিন্তু এটি অনেক লোককেই বিরক্ত করল। ১৬১৬ খ্রিষ্টাব্দে ক্যাথলিক চার্চ কোপার্নিকাসের কাজকে এর নিষিদ্ধ বইয়ের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে রাখল 'যতদিন না সংশোধিত হল' স্থানীয় গির্জা সংক্রান্ত সেন্সরগণ কর্তৃক, যেখানে এটি রয়ে গেল ১৮৩৫* খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। মার্টিন লুথার তাকে বর্ণনা করলেন, এভাবে, 'একজন ভুঁইফোড় জ্যোতির্বিদ...। এই নির্বোধটি পাল্টে ফেলতে চায় পুরো জ্যোতির্বিজ্ঞানকে। কিন্তু 'পবিত্র বাইবেল' আমাদেরকে বলে যে জোসুয়া আদেশ করলেন সূর্যকে স্থির থাকতে, পৃথিবীকে নয়।' তথাপি কোপার্নিকাসের কিছু প্রশংসাকারী ভিন্নমত পোষণ করে বললেন যে, তিনি প্রকৃত পক্ষে সূর্য-কেন্দ্রিক মহাবিশ্বে বিশ্বাস করতেন না, কিন্তু তিনি এটিকে প্রস্তাব করলেন স্রেফ গ্রহসমূহের গতি হিসাব করার সুবিধার্থে।

পৃথিবী কেন্দ্রিক এবং সূর্যকেন্দ্রিক—মহাবিশ্ব সংক্রান্ত এই দুটি দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যকার যুগান্তকারী সংঘাত—ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দী হয়ে চূড়ান্ত পরিণতি পেল এমন এক ব্যক্তির মাঝে যিনি টলেমির মতোই ছিলেন জ্যোতিষী এবং জ্যোতির্বিদ। তিনি জীবিত ছিলেন এমন এক কালে যখন মানুষের চেতনা এবং মন ছিল শৃঙ্খলিত ; যখন বিজ্ঞানভিত্তিক বিষয়সমূহের উপর এক বা দুই সহস্রাব্দের পুরনো গির্জার ঘোষণাসমূহকে প্রাচীনকালের অপ্রাপ্ত কারিগরি কৌশলে অর্জিত উপায়গুলোর চেয়ে অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য বলে বিবেচনা করা হত ; তখন এমনকি গোপনীয় ধর্মতাত্ত্বিক বিষয় সম্বন্ধে প্রচলিত ক্যাথলিক বা প্রোটেস্ট্যান্ট ধারণাবাহী ঈশ্বরের বন্দনাগীতি থেকে বিচ্যুতিকেও শাস্তি দেয়া হত লাঞ্ছনা, করারোপ, নির্বাসন, অত্যাচার বা মৃত্যুর মাধ্যমে। স্বর্গসমূহে বসতি ছিল এঞ্জেল, অপদেবতা এবং 'ঈশ্বরের হাত'-এর, তৈরি করছিল গ্রহাদির স্ফটিক গোলকগুলো। বিজ্ঞানের এই ধারণাটি ছিল না যে, 'প্রকৃতি'-র ঘটনাসমূহের অন্তরালেই থাকতে পারে পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রসমূহ। কিন্তু এই মানুষটির সাহসী এবং একাকী সংগ্রামের উদ্দেশ্য ছিল আধুনিক বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের দীপশিখা প্রজ্বলিত করা।

* কোপার্নিকাসের গ্রন্থের ষোড়শ-শতাব্দীর প্রায় প্রতিটি কপির এক পরিসংখ্যানে, ওয়েন গিংগেরিচ সেন্সরশিপটিকে অকার্যকর বলে লক্ষ করেছেন : ইতালিতে কপিগুলোর শতকরা মাত্র ৬০ ভাগ 'সংশোধিত' হয়েছিল এবং আইবেরিয়াতে একটিও নয়।

banglainternet.com

১৫৭১ খ্রিষ্টাব্দে জার্মানিতে জন্মগ্রহণ করেন জোহানেস কেপলার এবং তাকে বালক বয়সে প্রাদেশিক শহর মলব্রনের প্রোটেস্ট্যান্ট সেমিনারি স্কুলে পাঠিয়ে দেয়া হয় যাজকের শিক্ষাগ্রহণ করার জন্য। এটি ছিল এমন এক শিক্ষাশ্রম যেখানে তরুণ মনসমূহকে প্রশিক্ষিত করে তোলা হত রোমান ক্যাথলিজমের নগর দুর্গের বিরুদ্ধে ধর্মতাত্ত্বিক অস্ত্র ব্যবহার করার জন্য। কেপলার ছিলেন দৃঢ়সংকল্প, বুদ্ধিমান এবং চরমভাবে স্বাধীনচেতা। তিনি নিরানন্দ মলব্রনে বন্ধুহীনভাবে কাটালেন দুটি বছর, হয়ে পড়লেন বিচ্ছিন্ন এবং অন্তর্মুখী, তার চিন্তাগুলো ধাবিত হল ঈশ্বরের চোখে তার কল্পিত অনুপযুক্ততার দিকে। তিনি অনুতপ্ত হলেন হাজার পাপের জন্য এবং কখনো মুক্তি পাওয়ার ব্যাপারে আশাহীন হয়ে পড়লেন।

কিন্তু তার জন্য ঈশ্বর হয়ে গেলেন ব্যাকুলভাবে প্রায়শ্চিত্ত কামনাকারী কোনো স্বর্গীয় রোষানলের চাইতে অধিক কিছু। কেপলারের ঈশ্বর ছিলেন মহাবিশ্বের সৃষ্টিশীল ক্ষমতা। বালকটির কৌতূহল জয় করল তার ভয়কে। সে শিখতে চাইল বিশ্বের পরলোকতত্ত্ব ; সে 'ঈশ্বরের মন' নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করার দুঃসাহস দেখাল। এই বিপজ্জনক দৃষ্টিভঙ্গি, যা প্রথমে স্মৃতি হিসেবে ছিল অলীক, হয়ে গেল সারাজীবনের আচ্ছন্নতা। একটি শিশু-যাজকের অহমিকাপূর্ণ প্রত্যাশাগুলো ইয়োরোপকে মধ্যযুগীয় চিন্তার আশ্রম থেকে মুক্তি দিল।

মধ্যযুগপূর্বীয় ক্ল্যাসিক্যাল বিজ্ঞান নীরব হয়ে পড়েছিল এক হাজার বছরেরও অধিক পূর্বে, কিন্তু 'মধ্যযুগ'-এ সেই সকল কণ্ঠস্বরের কিছু ম্রিয়মান প্রতিধ্বনি সংরক্ষিত থাকল আরব পণ্ডিতগণ কর্তৃক, যেগুলো সুকৌশলে প্রবেশ করতে থাকল ইয়োরোপীয় শিক্ষা পাঠক্রমে। মলব্রনে ধর্মতত্ত্ব ছাড়াও গ্রিক ও ল্যাটিন ভাষা, সংগীত ও গণিত পাঠ করে কেপলার শুনেছিলেন তাদের ধ্বনির অনুরণন। তিনি ভাবলেন যে তিনি ইউক্লিডের জ্যামিতিতে ক্ষণিকের জন্য হলেও দেখতে পেয়েছেন যথার্থতা এবং মহাজাগতিক গৌরবের এক প্রতিবিম্ব। পরবর্তীতে তিনি লিখলেন, " 'সৃষ্টি'র পূর্বেই অস্তিত্বশীল ছিল জ্যামিতি। ঈশ্বরের মনের সাথে এটিও সহ-চিরন্তন...। জ্যামিতি ঈশ্বরকে দিল 'সৃষ্টি'র জন্য এক মডেল...। জ্যামিতিই হল ঈশ্বর।"

কেপলারের গাণিতিক তুরীয় আনন্দের মাঝে, এবং তার নিঃসঙ্গ জীবন সত্ত্বেও, বাইরের জগতের ত্রুটিসমূহ অবশ্য তার চরিত্রের ছাঁচে প্রভাব বিস্তার করেছিল। দুর্ভিক্ষ, মহামারি এবং ভয়ংকর মতবাদগত সংঘাতের বিরুদ্ধে ক্ষমতাহীন জনতার জন্য অন্ধবিশ্বাস ছিল এক বহুল ব্যবহৃত কৌশল। অনেকের জন্য, একমাত্র নিশ্চয়তা ছিল নক্ষত্ররাজি, এবং প্রাচীন জ্যোতিষতাত্ত্বিক আত্মগর্ব বিকাশ লাভ করল ভয়-পীড়িত ইয়োরোপের প্রাঙ্গণ ও সরাইখানায়। কেপলার, সারা জীবন ব্যাপী জ্যোতিষতত্ত্বের প্রতি যার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল দ্ব্যর্থক, বিস্মিত হয়েছিলেন এই ভেবে যে, প্রাত্যহিক জীবনের আপাত বিশৃঙ্খলার অন্তরালে কোনো লুকোনো সজ্জা আছে কি না। যদি বিশ্ব নির্মিত হয়ে থাকে ঈশ্বর কর্তৃক, তবে এটি কি নিবিড়ভাবে পরীক্ষিত হওয়ার কথা নয় ? সকল সৃষ্টি কি ঈশ্বরের মনে বিরাজমান ঐকতানের একটি প্রকাশ নয় ? প্রকৃতির পুস্তকটি একজন পাঠকের জন্য প্রতীক্ষা করল এক সহস্র বছরেরও অধিক সময় ধরে।

১৫৮৯ খ্রিষ্টাব্দে বিখ্যাত টুবিনগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে যাজকবিদ্যা অর্জন করার জন্য কেপলার ত্যাগ করলেন মলব্রন এবং এতে মুক্তির সন্ধান পেলেন। সেই সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বুদ্ধিবৃত্তিক ধারণাসমূহের মুখোমুখি হয়ে, তার প্রতিভা অতি দ্রুত স্বীকৃত পেল তার শিক্ষকদের কাছে—যাদের একজন এই যুবকটিকে পরিচিত করে দিলেন কোপার্নিকাসের প্রকল্পের বিপজ্জনক রহস্যগুলোর সাথে। সৌর-কেন্দ্রিক মহাবিশ্ব ঐকতানিক হল কেপলারের ধর্মীয় ধারণার সাথে এবং তিনি এটিকে গ্রহণ করলেন ঐকান্তিকতার সাথে। 'সূর্য' ছিল ঈশ্বরের রূপক, 'যার' চারদিকে সব কিছু আবর্তনশীল। পুরোহিতের পেশায় প্রবেশের পূর্বে, তাকে পার্থিব কাজের এক আকর্ষণীয় প্রস্তাব দেয়া হল—যেহেতু তিনি নিজেকে যাজকের কাজের জন্য নিস্পৃহভাবে উপযুক্ত মনে করতেন, তাই তিনি প্রস্তাবটি গ্রহণ করলেন। তাকে অস্ট্রিয়ার গ্রাজে ডেকে পাঠানো হল, মাধ্যমিক স্কুলে গণিত শেখানোর জন্য, এবং কিছুদিন পর জ্যোতির্বিদ্যা ও আবহাওয়াবিদ্যা সংক্রান্ত পঞ্জিকা তৈরি এবং রাশিচক্র সন্ধান করতে শুরু করলেন। 'ঈশ্বর সকল প্রাণীর পুষ্টির উপায় করে দেন', তিনি লিখলেন, 'জ্যোতির্বিদদের জন্য, তিনি দিয়েছেন জ্যোতিষতত্ত্ব।'

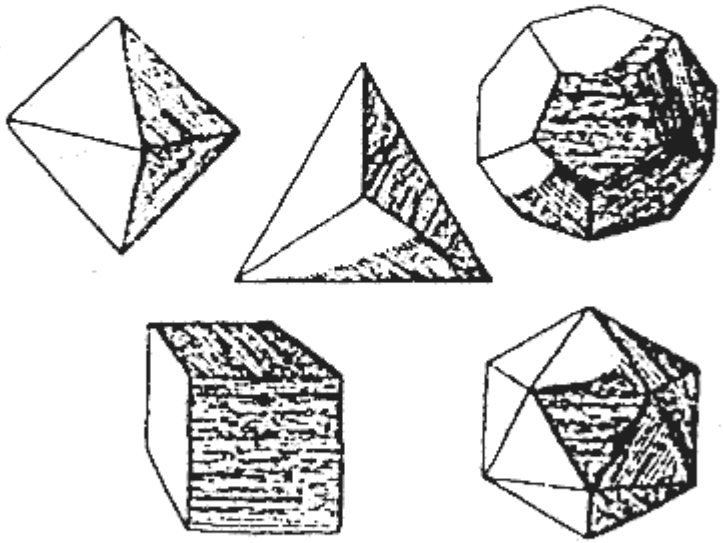

পিথাগোরাস এবং প্লেটোর পাঁচটি সুষম ঘনবস্তু। পরিশিষ্ট ২ দ্রষ্টব্য।

কেপলার ছিলেন এক অসাধারণ চিন্তাবিদ এবং এক চিত্তাকর্ষক লেখক, কিন্তু একজন শ্রেণী শিক্ষক হিসেবে তিনি ছিলেন এক বিপর্যয়। তিনি কথা বলতেন মিন মিন করে। তিনি কথা বলতেন অপ্রাসঙ্গিকভাবে। কখনো কখনো তিনি ছিলেন চরম রকমের অবোধগম্য। গ্রাজে তিনি তার প্রথম বর্ষে স্বল্প সংখ্যক ছাত্রই জোগাড় করতে পারলেন ; কিন্তু পরের বছরে তাদের কেউই থাকল না। বিভিন্ন সংঘ এবং

banglainternet.com

তার সাথে পাল্লা দেয়ায় রত বিভিন্ন জনের নিরন্তর নালিশে তিনি বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেন। এবং গ্রীষ্মের এক মনোরম বিকেলে তিনি উন্মোচন করলেন এমন এক বিস্ময় যা জ্যোতির্বিদ্যার ভবিষ্যৎকে আমূল পাল্টে দিল। সম্ভবত তিনি থেমে গেলেন বাক্য-মধ্যে। তার অমনোযোগী ছাত্ররা, যারা দিবসের সমাপ্তির প্রত্যাশায় ছিল, আমি মনে সন্দেহ পোষণ করি, তারা সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তের সামান্যই লক্ষ রাখতে পেরেছিল।

কেপলারের সময়ে কেবলমাত্র ছয়টি গ্রহ জানা ছিল : বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি এবং শনি। কেপলার সবিস্ময়ে ভাবলেন, কেন শুধু ছয়টি ? কেন বিশটি বা একশতটি নয় ? কেন তাদের কক্ষপথগুলো পরস্পরের মাঝে কোপার্নিকাস কর্তৃক নির্ণিত ব্যবধান বজায় রাখে ? এর পূর্বে এরকম প্রশ্ন আর কেউ কখনো করেনি। পিথাগোরাসের সময়ের পর গ্রিক গণিতজ্ঞদের কাছে যেমনটি জানা ছিল সে মতে, নিয়মিত আকৃতির বা 'প্লেটোনিক' ঘন বস্তুর সংখ্যা পাঁচটি, যাদের পার্শ্বসমূহ সুষম বহুভুজ। কেপলার ভাবলেন যে, দুটি সংখ্যা অবশ্যই সম্পর্কযুক্ত ; গ্রহের সংখ্যা কেবলমাত্র ছয়টি এই কারণে যে, নিয়মিত আকৃতির ঘন বস্তুর সংখ্যা ছিল কেবল পাঁচটি, এবং একে অপরের মধ্যে খাপ খেয়ে নেয়া এই ঘন বস্তুগুলো নির্দেশ করবে সূর্য থেকে গ্রহসমূহের দূরত্বকে। তিনি বিশ্বাস করলেন যে, ছয়টি গ্রহের গোলকগুলোর জন্য অদৃশ্য সাহায্যকারী বস্তুগুলোকে তিনি চিনতে পেরেছেন এই সকল সুষম আকৃতিতে। তিনি তার উদ্‌ঘাটনকে বললেন 'মহাজাগতিক রহস্য'। পিথাগোরাসের ঘন বস্তুসমূহ এবং গ্রহসমূহের বিন্যাসের মধ্যকার সম্পর্ক একটি ব্যাখ্যাই মেনে নেয় : 'ঈশ্বরের হাত, জিওমিটার।'

কেপলার এতটাই বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়লেন যে তিনি—পাপে নিমজ্জিত ছিলেন বলে ভেবেছিলেন—হয়ত এই আবিষ্কারের জন্য স্বর্গীয়ভাবে নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি উরটেমবার্গের ডিউকের কাছে গবেষণার অনুমোদন প্রার্থনা করে প্রস্তাব পাঠালেন যে, একটি ত্রিমাত্রিক মডেল হিসেবে তার খাপ খেয়ে নেয়া ঘন বস্তুসমূহের গঠন যেন পরীক্ষা করে দেখা হয় যাতে অন্যরা পবিত্র জ্যামিতির সৌন্দর্য সামান্য হলেও অবলোকন করতে পারে। তিনি আরো বললেন যে, এটি আবিষ্কৃত হতে পারে রূপা এবং মূল্যবান পাথর হতে এবং ঘটনাক্রমে তা ব্যবহৃত হতে পারে ডিউকের পানপাত্র রূপে। এই বিনয়ী উপদেশসহ প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যাত হল যে, তিনি প্রথমে যেন কাগজ দ্বারা একটি অপেক্ষাকৃত কম ব্যয়বহুল মডেল তৈরি করে নেন, যা তিনি স্বতস্ফূর্তভাবে করতে চাইলেন : 'এই আবিষ্কার হতে আমি যেই পরম আনন্দ পেয়েছি তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়...। যত কঠিন হোক না কেন আমি কোনো হিসাবই বাদ দিলাম না। দিবা-রাত্রিময় আমি সময় কাটালাম গাণিতিক ক্রিয়া-কর্মে, যতক্ষণ না আমি বুঝলাম যে, আমার প্রকল্পটি কোপার্নিকাসের কক্ষগুলোর সাথে মিলে যাবে, নাকি, আমার আনন্দ উবে যাবে বায়ুতে।' কিন্তু তিনি যত কঠোর চেষ্টাই করে থাকুন না কেন, ঘন বস্তুসমূহ এবং গ্রহাদির কক্ষপথগুলোর

মধ্যে তেমন মিল পাওয়া গেল না। তবে তত্ত্বটির আভিজাত্য এবং মহিমা তাকে প্ররোচিত করল যে, পর্যবেক্ষণসমূহে হয়ত কোনো ত্রুটি আছে, যখন পর্যবেক্ষণসমূহ কাঙ্ক্ষিত ফলাফল না নিয়ে আসে তখন বিজ্ঞানের ইতিহাসে অন্য আরো তাত্ত্বিক যেমনটি করে থাকেন। গ্রহগুলোর প্রতীয়মান অবস্থান সম্পর্কে পৃথিবীতে তখন কেবল একজন মানুষই এর চাইতে অধিকতর সঠিক পর্যবেক্ষণ সম্পন্ন করতে পেরেছিলেন, এক স্বেচ্ছা-নির্বাসিত ড্যানিশ মনীষী, যিনি অলংকৃত করেছিলেন মহান রোমান সম্রাট, দ্বিতীয় রুডল্‌ফের রাজ-গণিতজ্ঞের পদ। সেই মানুষটি ছিলেন টাইকো ব্রাহে। দৈবক্রমে, রুডল্‌ফের উপদেশে তিনি সবেমাত্র কেপলারকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তার সাথে প্রাগে যোগ দেয়ার জন্য, যার গণিত সংক্রান্ত খ্যাতি তখন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল।

কয়েকজন গণিতজ্ঞ ব্যতীত সকলের কাছে অপরিচিত, সাধারণ ঘরের এক মফস্বলি স্কুল শিক্ষক, কেপলার টাইকোর প্রস্তাবের ব্যাপারে সংশয়ী ছিলেন। কিন্তু তার জন্যই সিদ্ধান্তটি নেয়া হয়েছিল। ১৫৯৮ খ্রিষ্টাব্দে, আসন্ন 'ত্রিশ বছরের যুদ্ধ'-এর অনেকগুলো পূর্ব হুঁশিয়ারিসূচক অনুভূতি তাকে বিপন্ন করে ফেলল। স্থানীয় ক্যাথলিক আর্চডিউক, যিনি গোঁড়া মতবাদমূলক নিশ্চয়তায় ছিলেন অবিচল, প্রতিজ্ঞা করলেন যে, 'প্রচলিত ধর্ম-মতের বিরুদ্ধবাদীদেরকে* শাসন করার চাইতে দেশটিকে মরুভূমিতে রূপান্তরিত করাই শ্রেয়তর।' অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা হতে প্রোটেস্ট্যান্টদেরকে বাদ দেয়া হল, বন্ধ হয়ে গেল কেপলারের স্কুল, এবং প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধী বলে বিবেচিত প্রার্থনা, পুস্তক এবং স্তোত্রগীতিসমূহ নিষিদ্ধ করা হল। অবশেষে নগরবাসীদেরকে ডেকে পাঠানো হল তাদের ব্যক্তিক ধর্মীয় প্রত্যয়সমূহের শুদ্ধতা যাচাই করার জন্য, যারা রোমান ক্যাথলিক বিশ্বাসে আনুগত্য প্রকাশ করতে অস্বীকার করল তাদের আয়ের এক-দশমাংশ জরিমানা করা হল এবং তারা মৃত্যু যন্ত্রণার হুমকির মুখে গ্রাজ হতে চিরতরে নির্বাসিত হল। কেপলার বেছে নিলেন নির্বাসনের পথ : 'আমি কখনো শিখিনি ভণ্ডামি। আমি আমার বিশ্বাসের প্রতি থাকি পরম আস্থাশীল। আমি এর সাথে ছলনা করি না।'

গ্রাজ ত্যাগ করার পর কেপলার, তার স্ত্রী এবং সৎকন্যা প্রাগের উদ্দেশ্যে তাদের কঠিন যাত্রা শুরু করলেন। কেপলারের বিয়েটি সুখের ছিল না। দীর্ঘস্থায়ী রোগে আক্রান্ত, সদ্য দুটি স্বল্প বয়সী সন্তানকে হারানো তার স্ত্রীকে বর্ণনা করা হল, 'নির্বোধ, গোমড়ামুখো, নিঃসঙ্গ এবং বিষণ্ন' রূপে। তিনি তার স্বামীর কাজ কিছুই অনুধাবন করতে পারতেন না এবং সাধারণ গ্রাম্য লোকাচারে উপনীত হয়ে তিনি তার স্বামীর কপর্দকশূন্য পেশাকে তুচ্ছজ্ঞান করলেন। কেপলার এর জবাবে তার

* মধ্যযুগীয় বা 'রিফর্মেশন ইয়োরোপে' এরূপ সবচেয়ে চরম মন্তব্য। মূলত একটি আলবিগেনসিয়ান নগরীর অবরোধকালে, আস্তিককে কীভাবে নাস্তিক হতে পৃথক করবেন—এই প্রশ্নের মুখোমুখি হলে, ডমিনিগো গুজম্যান, যিনি পরবর্তীতে সেইন্ট ডমিনিক নামে পরিচিত হন, যুক্তি দেখিয়ে বলালেন : 'এদের সবগুলোকে মেরে ফেল। ঈশ্বর নিজে সব জেনে নেবেন।'

banglainternet.com

স্ত্রীর প্রতি মৃদু ভর্ৎসনা এবং উপেক্ষা প্রদর্শন করতেন, 'কারণ আমি আমার পড়াশোনার জন্য কখনো কখনো চিন্তারহিত অবস্থায় গিয়ে পৌঁছতাম ; কিন্তু আমি আমার পাঠ সম্পন্ন করলাম, তার সাথে ধৈর্য ধারণ করলাম। কিন্তু যখন আমি বুঝতাম যে, সে আমার কথা বুঝতে পেরেছে তখন তাকে আর আক্রমণ না করে আমি আমার আঙুল কামড়াতাম।' কিন্তু কেপলার তার কাজে আচ্ছন্ন হয়ে থাকলেন। কালের পঙ্কিলতা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তিনি তার মনশ্চক্ষুতে টাইকোর জগৎকে দেখলেন এক আশ্রয়রূপে, এমন এক স্থান যেখানে তার 'মহাজাগতিক রহস্য' উদ্‌ঘাটিত হতে পারে। তিনি মহান টাইকো ব্রাহের একজন সহকর্মী হওয়ার জন্য উচ্চাকাঙ্ক্ষী হয়ে উঠলেন, যিনি অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কারের পূর্বে, একটি সূক্ষ্ম এবং সুশৃঙ্খল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ব্যাখ্যায় নিজেকে নিবিষ্ট রাখলেন ত্রিশ বছর ধরে। কেপলারের মনোবাঞ্ছা অপূর্ণ থাকারই ছিল। টাইকো নিজে ছিলেন এক বর্ণাঢ্য চরিত্র, সজ্জিত ছিলেন স্বর্ণের নাকে, আসলটি এক অগ্রজ গণিতজ্ঞের সাথে এক ছাত্র-দ্বন্দ্বযুদ্ধে হারিয়ে ফেলেছিলেন। তার চারপাশে থাকত সহকারী মোসাহেব, দূরাত্মীয় এবং বাছাইকৃত চাটুকারদের এক কর্কশ দল। তাদের সীমাহীন আনন্দোপভোগ, ব্যঙ্গ ও কুমন্ত্রণা, ধার্মিক ও পণ্ডিত গেঁয়ো জনকে নিয়ে তাদের নিষ্ঠুর তামাশা কেপলারকে হতাশ ও দুঃখিত করে তুলল : 'টাইকো...চরম ধনী, কিন্তু জানেন না কীভাবে একে ব্যবহার করতে হয়। আমি এবং আমার পুরো পরিবারের অদৃষ্টে যতটুকু আছে তার একটি মাত্র যন্ত্রের পেছনে তার চাইতে অধিক খরচ হয়।'

টাইকোর জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত উপাত্ত দেখে অধৈর্য হয়ে, কেপলার নিজেকে অবাঞ্ছিতই ভাবতে পারলেন : 'টাইকো আমাকে তার পরীক্ষণে অংশগ্রহণ করার কোনো সুযোগ দিলেন না। তিনি কেবল, আহারের সময়ে এবং অন্য সব বিষয়ের মাঝে, যেমন যেতে যেতে, উল্লেখ করেন, আজ পৃথিবী হতে কোনো এক গ্রহের দূরতম অবস্থান, আগামীকাল অন্য একটির রাহু...। টাইকো সম্পন্ন করেছিলেন শুদ্ধতম পর্যবেক্ষণসমূহ...। তার ছিল সহযোগীও। তার ছিল না কেবল সেই স্থপতি যে এই সব কিছুকে ব্যবহারযোগ্য করে তুলতে পারত।' টাইকো ছিলেন তার কালের শ্রেষ্ঠতম পর্যবেক্ষণবিদ, এবং কেপলার ছিলেন শ্রেষ্ঠতম তাত্ত্বিক। প্রত্যেকেই জানতেন যে, তিনি, একাকী, একটি নিখুঁত এবং সংবদ্ধ জগৎ-ব্যবস্থার সংশ্লেষণ অর্জন করতে সমর্থ হবেন না, যা অত্যাসন্ন বলে তারা উভয়েই অনুভব করেছিলেন। কিন্তু টাইকো তার সারা জীবনের কৃতিত্বের ভাগ দিতে চাইছিলেন না অপেক্ষাকৃত তরুণ এক ধীমান প্রতিদ্বন্দ্বীকে। যে কোনো কারণেই, ফলাফলসমূহের কোনো রকমের যৌথ গ্রন্থস্বত্ব গ্রহণযোগ্য ছিল না। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের জন্ম—তত্ত্ব এবং পর্যবেক্ষণের উদ্ভব—টলমলভাবে এগিয়ে যায় এদের পারস্পরিক অনাস্থার খাড়া শিলাখণ্ডের উপর দিয়ে। অবশিষ্ট আঠারো মাস জুড়ে, অর্থাৎ যে কদিন টাইকো জীবিত ছিলেন, দুজনে বিবাদে জড়ালেন এবং আবার বন্ধুত্ব স্থাপন করলেন

পুনঃ পুনঃ। রোজেনবার্গের ব্যারন কর্তৃক প্রদত্ত এক নৈশভোজে, চরমভাবে মদ্যপান করে টাইকো, 'ভদ্র সমাজের কাজকে স্থান দিলেন স্বাস্থ্যের আগে', এবং সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য হলেও, ব্যারনের সামনে, তার শরীরের তাড়নাকে প্রশমিত হতে বাধা দিলেন। এর ফল স্বরূপ সংঘটিত মূত্রনালির সংক্রমণের আরো অবনতি ঘটল যখন টাইকো তাকে তার পানাহার নিয়ন্ত্রিত করার উপদেশকে দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করলেন। মৃত্যুশয্যায়, টাইকো তার পর্যবেক্ষণগুলোর স্বত্ব দান করলেন কেপলারকে, এবং তার মৃদু প্রলাপের শেষ রাতটিতে, তিনি এই কথাগুলো পুনরাবৃত্তি করলেন, যেন কেউ রচনা করছে কোনো কাব্য : 'আমাকে দেখে যেন মনে না হয় যে, আমার সব কিছু নিরর্থক...। আমাকে দেখে যেন মনে না হয় যে, আমার সব কিছু নিরর্থক।'

টাইকোর মৃত্যুর পর নতুন রাজগণিতজ্ঞ হলেন কেপলার এবং তিনি টাইকোর অবাধ্য পরিবারের কাছ থেকে পর্যবেক্ষণসমূহ আহরণ করতে সমর্থ হলেন। তার অনুমান যে, গ্রহগুলোর কক্ষপথসমূহকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে রাখে পাঁচটি প্লেটোনিক ঘন বস্তু, কোপার্নিকাসের মতো তা আর টাইকোর উপাত্ত দ্বারা সমর্থিত হল না। অপেক্ষাকৃত নতুন গ্রহগুলোর আবিষ্কারসমূহ, ইউরেনাস, নেপচুন, এবং প্লুটো তার 'মহাজাগতিক রহস্য'কে পুরোপুরি ভুল প্রমাণিত করল—যার অর্থ ছিল যে, আর কোনো অতিরিক্ত প্লেটোনিক ঘনবস্তু* নেই যা সূর্য থেকে এদের দূরত্ব স্থির করতে পারত। পিথাগোরীয় ঘনবস্তুসমূহ পৃথিবীর কোনো উপগ্রহের অস্তিত্বকেও অনুমোদন করল না এবং গ্যালিলিও কর্তৃক আবিষ্কৃত বৃহস্পতির চারটি বিশাল উপগ্রহের বিষয়টিও ছিল অস্বস্তিকর। কিন্তু বিরক্ত হওয়ার পরিবর্তে কেপলার আরো উপগ্রহের সন্ধান পেতে চাইলেন এবং ভেবে বিস্মিত হলেন একটি গ্রহের কতগুলো উপগ্রহ থাকতে পারে। তিনি গ্যালিলিওর কাছে লিখলেন : 'আমি অনতিবিলম্বে ভাবতে শুরু করলাম যে, আমার 'মিস্টেরিয়াস কসমোগ্রাফিকাম'কে বাতিল না করে দিয়ে কীভাবে গ্রহের সংখ্যায় সংযোজন সম্ভব, যে মতে ইউক্লিডের পাঁচটি নিয়মিত ঘনবস্তু সূর্যের চারদিকে পাঁচটির বেশি গ্রহ অনুমোদন করে না...। আমি বৃহস্পতির চারটি উপগ্রহের অস্তিত্বে অবিশ্বাস করা হতে এতটাই দূরে যে, আপনাকে অনুধাবন করার জন্য আমি একটি দূরবীক্ষণ যন্ত্র কামনা করি, যদি সম্ভব হয়, মঙ্গলের চারদিকে দুটি উপগ্রহ আবিষ্কার করা, আনুপাতিক প্রয়োজনে যেমনটি মনে হয়, শনির চারদিকে ছয়টি বা আটটি, এবং হয়ত বুধ ও শুক্রের প্রতিটির চারদিকে একটি করে।' মঙ্গলের আছে দুটি ক্ষুদ্র উপগ্রহ, এবং এদের অপেক্ষাকৃত বড়োটিতে রয়েছে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য আজকের দিনে যাকে তার অনুমানের সম্মানে 'কেপলার রেখা' বলে থাকি। কিন্তু তিনি পুরোপুরি ভুল করেছিলেন শনি, বুধ এবং শুক্র সম্বন্ধে এবং গ্যালিলিও যে কটি আবিষ্কার করেছিলেন শনির রয়েছে তার চাইতে অনেক বেশি সংখ্যক উপগ্রহ। আমরা আজও প্রকৃতপক্ষে জানি না কেন রয়েছে কম-বেশি

* এই বিবৃতির প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে পরিশিষ্ট ২-এ।

banglainternet.com

কেবলমাত্র নয়টি গ্রহ এবং কেন তারা সূর্য থেকে নিজ নিজ আপেক্ষিক দূরত্ব বজায় রাখে। [অষ্টম অধ্যায় দ্রষ্টব্য]

নক্ষত্রপুঞ্জের ভিতর দিয়ে মঙ্গল এবং অন্যান্য গ্রহসমূহের প্রতীয়মান গতি সংক্রান্ত টাইকোর পর্যবেক্ষণগুলো সম্পন্ন হয়েছিল বহুবছর ধরে। দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কারের পূর্বের কয়েক শতাব্দীর প্রাপ্ত উপাত্তগুলোর মধ্যে এগুলোই সবচেয়ে সঠিক। এগুলোকে অনুধাবনের জন্য কেপলার কাজ করলেন আবেগময় একাগ্রতা নিয়ে : সূর্যের চারদিকে পৃথিবী এবং মঙ্গলের প্রকৃত গতি কী ব্যাখ্যা করতে পারত, পরিমাপের সূক্ষ্মতার ক্ষেত্রে, আকাশে মঙ্গলের আপাত গতির ক্ষেত্রে, এবং পটভূমির নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্য দিয়ে এর পশ্চাদ্‌গামী ফাঁসসমূহের ক্ষেত্রে ? টাইকো কেপলারের কাছে মঙ্গল গ্রহকেই সুপারিশ করলেন এই কারণে যে, এর গতিকে মনে হল সবচেয়ে ব্যতিক্রমী, বৃত্তাকার কোনো কক্ষপথের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করা সবচেয়ে কঠিন। [তার অজস্র হিসেবের কারণে যেসব পাঠক একঘেয়ে বোধ করেন তাদের উদ্দেশ্যে তিনি পরবর্তীতে লিখলেন : এই বৈচিত্র্যহীন পদ্ধতিতে আপনি যদি ক্লান্ত হয়ে পড়েন, সহানুভূতিশীল হোন আমার প্রতি যে কমপক্ষে সতেরোবার পরীক্ষণের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়েছে।]

পিথাগোরাস, খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে, এবং কেপলারের পূর্ববর্তী প্লেটো, টলেমি ও অন্য সব খ্রিষ্টান জ্যোতির্বিদ ধারণা করেছিলেন যে, গ্রহসমূহ আবর্তিত হয় বৃত্তাকার পথে। বৃত্তটিকে ভাবা হয়েছিল 'সুষম' জ্যামিতিক আকৃতি সম্পন্ন বলে, এবং 'জাগতিক পঙ্কিলতা' থেকে দূরে, স্বর্গে অতি উচ্চে স্থাপিত গ্রহগুলোকে কোনো এক অতীন্দ্রিয় চেতনায় 'যথার্থ' বলে ভাবা হয়েছিল। গ্যালিলিও, টাইকো এবং কোপার্নিকাস সকলেই গ্রহসমূহের সুষম বৃত্তীয় গতিকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করতেন, শেষোক্ত জন দাবি করেছিলেন যে, এর বিকল্প ভাবনায় 'মন কেঁপে উঠে', কারণ "সম্ভাব্য সর্বোত্তম উপায়ে গঠিত 'বিশ্ব-সৃষ্টি'-তে এমন একটি বিষয় ধারণা করাটা হবে অযথার্থ।" তাই সূর্যের চারদিকে পৃথিবী ও মঙ্গল বৃত্তাকার কক্ষপথে আবর্তিত হচ্ছে এরূপ কল্পনা করে কেপলার প্রথমে পর্যবেক্ষণসমূহকে ব্যাখ্যা করতে সচেষ্ট হলেন।

তিন বছর ধরে হিসেব-নিকেশের পর, তিনি বিশ্বাস করলেন যে, তিনি মঙ্গল গ্রহের বৃত্তাকার কক্ষপথের একটি সঠিক মান বের করতে পেরেছেন, যা বৃত্তচাপের দুই মিনিট পরিমাণ কৌণিক ব্যবধানের মধ্যে টাইকোর দশটি পর্যবেক্ষণের সাথে মিলে যায়। আবার এক ডিগ্রি পরিমাণ কোণের মাঝে থাকে বৃত্তচাপের ৬০ মিনিট, দিগন্ত হতে শীর্ষ পর্যন্ত এক সমকোণে থাকে ৯০ ডিগ্রি। কাজেই বৃত্তচাপের কয়েকটি মিনিট পরিমাপের জন্য অতিক্ষুদ্র—বিশেষত কোনো দূরবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া ; এটি পৃথিবী হতে দৃষ্ট পূর্ণ চাঁদের কৌণিক ব্যাসের এক-পঞ্চদশমাংশ। কিন্তু কেপলারের অফুরন্ত আনন্দ শীঘ্রই বিলীন হয়ে গেল বিষণ্ণতায়—কারণ টাইকোর

আরো দুটি পর্যবেক্ষণ কেপলারের কক্ষপথের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে পড়ল বৃত্তচাপের প্রায় আট মিনিট কৌণিক ব্যবধান দ্বারা :

> স্বর্গীয় ঈশ্বর টাইকো ব্রাহের মাঝে এমন এক পরিশ্রমী পর্যবেক্ষককে স্থাপন করলেন যে, তার পর্যবেক্ষণগুলো একে অভিযুক্ত করল...হিসেবে আট মিনিটের ত্রুটি ; এটিই কেবলমাত্র ঠিক যে, ঈশ্বরের দানকে আমাদের উচিত কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করে নেয়া...। যদি আমি বিশ্বাস করতাম যে, আমরা এই আট মিনিটকে উপেক্ষা করতে পারি, তবে আমি আমার প্রকল্পকে আমার মতো করে উপযোগী করে নিতে পারতাম। কিন্তু, যেহেতু এটি উপেক্ষণীয় ছিল না, সেই আটটি মিনিট জ্যোতির্বিদ্যার এক সামগ্রিক পুনর্গঠনের পথটিকেই নির্দেশ করল।

কেবলমাত্র সূক্ষ্ম পরিমাপ এবং সত্যকে সাহসীভাবে গ্রহণ করার মাধ্যমেই একটি বৃত্তাকার কক্ষপথ এবং প্রকৃত কক্ষপথটির মধ্যকার পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে দেখানো যেত : 'বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটি ঐকতানিক অনুপাতসমূহের অলংকারে অলংকৃত, কিন্তু সাদৃশ্যসমূহকে অবশ্যই অভিজ্ঞতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে।' কেপলার তার বৃত্তীয় কক্ষপথের ধারণা বাতিল করতে গিয়ে এবং 'ঐশ্বরিক জিওমিটার'-এ তার বিশ্বাসকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে গিয়ে আলোড়িত হয়ে পড়লেন। বৃত্ত এবং সর্পিলাকৃতি সংক্রান্ত জ্যোতির্বিদ্যার আস্তাবলটি পরিষ্কার করে ফেলার পর, তার ভাষায়, তার জন্য থাকল, 'কেবল এক গাড়ি বিষ্ঠা', একদিকে প্রসারিত এক বৃত্ত, যা দেখতে অনেকটা ডিম্বাকৃতি।

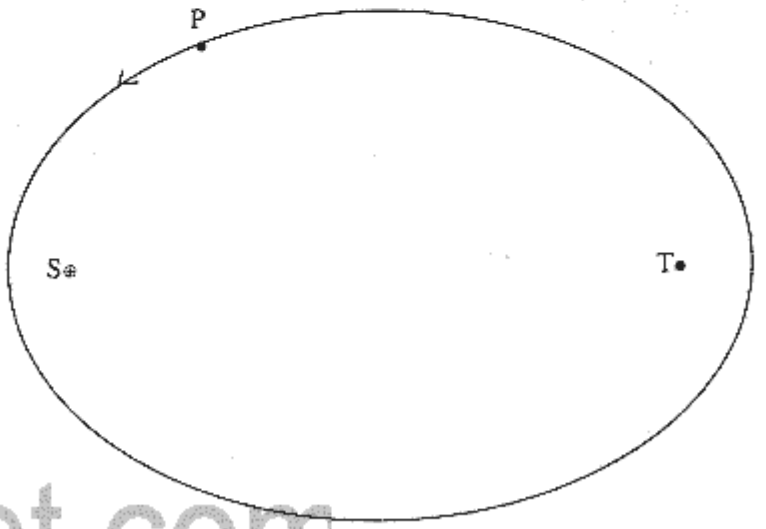

কেপলারের প্রথম সূত্র : একটি গ্রহ (P) একটি উপবৃত্তাকার পথে আবর্তিত হয়, সূর্যটিকে দুটি উপকেন্দ্রের যে কোনো একটিতে রেখে।

banglainternet.com

শেষ পর্যন্ত, কেপলার উপলব্ধি করতে পারলেন যে, বৃত্তের প্রতি দুর্বলতা ছিল শুধু এক মরীচিকা। কোপার্নিকাস যেমনটি বলেছিলেন যে, পৃথিবী একটি গ্রহ এবং এটি কেপলারের কাছে পুরোপুরি সুস্পষ্ট যে পৃথিবী, যা ক্লিষ্ট হয় যুদ্ধ, মহামারি, দুর্ভিক্ষ এবং অশান্তি দ্বারা, কখনোই পৌঁছতে পারে না যথার্থতায়। প্রাচীনকাল হতে কেপলারই ছিলেন প্রথম মানুষ যিনি প্রস্তাব করলেন যে, গ্রহসমূহ পৃথিবীর মতোই অযথার্থ উপাদান দ্বারা গঠিত বস্তু। এবং গ্রহগুলো যদি 'অযথার্থ' হয় তবে এদের কক্ষপথগুলোও কেন এরকম হবে না ? তিনি বিভিন্ন রকমের ডিম্বাকৃতি বক্ররেখা নিয়ে চেষ্টা করলেন, হিসেব করলেন, কিছু গাণিতিক ভুল করলেন (যা তাকে প্রথমে সঠিক উত্তরটি প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য করেছিল) এবং কয়েক মাস পরে, কিছুটা মরিয়া হয়ে একটি উপবৃত্তের সূত্র নিয়ে সচেষ্ট হলেন, যা পার্গা-র অ্যাপোলোনিয়াস কর্তৃক আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরিতে প্রথম গ্রথিত হয়েছিল। তিনি দেখলেন যে, এটি টাইকোর পর্যবেক্ষণগুলোর সাথে চমৎকারভাবে মিলে গেছে : 'প্রকৃতির যে সত্যকে আমি প্রত্যাখ্যান করলাম এবং দূরে ফেলে এলাম, নিভৃতে ফিরে এল পেছনের দরজা দিয়ে, যেন গ্রহণ করি তাই এটি এল ছদ্মবেশে...। ওহ্, আমি কীরকম বোকাই না ছিলাম !'

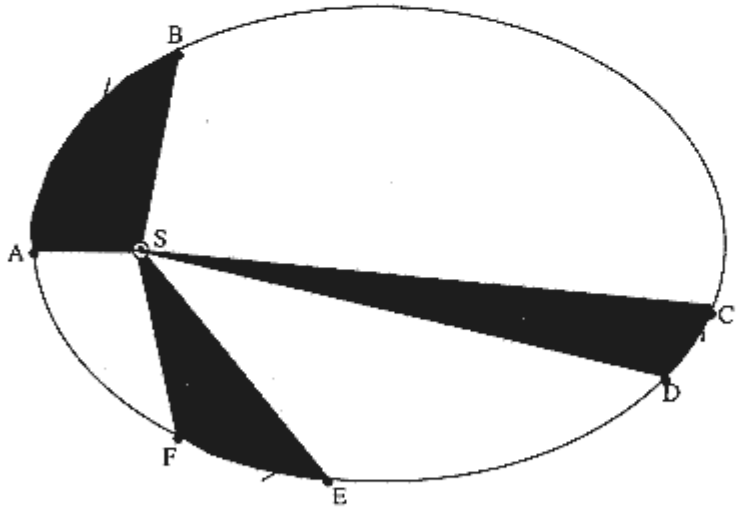

কেপলারের দ্বিতীয় সূত্র : একটি গ্রহ সমান সময়ে সমান ক্ষেত্রফল অতিক্রম করে। এটি B থেকে A তে, F থেকে E তে, D থেকে C তে যেতে সমান সময় নিলে ছায়াকৃত অংশসমূহ BSA, FSE এবং DSC-এর ক্ষেত্রফলগুলো সমান হবে।

কেপলার দেখলেন যে, মঙ্গল গ্রহ সূর্যের চারদিকে আবর্তিত হয় কোনো বৃত্তাকার পথে নয়, উপবৃত্তাকার পথে। অন্যান্য গ্রহের কক্ষপথগুলো মঙ্গলের কক্ষপথের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম উপবৃত্তাকার, এবং যেমন, টাইকো যদি তাকে

শুক্র গ্রহের গতি হিসেব করতে বলতেন, তবে কেপলার হয়ত আর কখনোই গ্রহগুলোর প্রকৃত পক্ষপথগুলো আবিষ্কার করতে পারতেন না। এমন একটি কক্ষপথে সূর্যটি কেন্দ্রে নয়, কিছুটা সরে, উপবৃত্তটির উপকেন্দ্রে। যখন কোনো গ্রহ সূর্যের নিকটতম অবস্থানে থাকে, তখন এটির গতি বৃদ্ধি পায়। যখন এটি দূরতম অবস্থানে যায় তখন এর বেগ হ্রাস পায়। এমন গতির কারণেই আমরা বলি যে, গ্রহগুলো চিরকাল সূর্যের দিকে এগিয়ে যায়, কিন্তু কখনোই এতে পৌঁছতে পারে না। গ্রহগুলোর গতি সংক্রান্ত কেপলারের প্রথম সূত্রটি শুধু এই : যে কোনো গ্রহ সূর্যকে একটি উপকেন্দ্রে রেখে একটি উপবৃত্তাকার কক্ষপথে আবর্তিত হয়।

সুষম বৃত্তীয় গতির ক্ষেত্রে, সমান সময়ে সমান কোণ বা সমান বৃত্তচাপ অতিক্রান্ত হয়। কাজেই, উদাহরণ স্বরূপ, বৃত্তের পরিধি বরাবর এক-তৃতীয়াংশ দূরত্ব অতিক্রম করতে যে সময় লাগে একই পথে দুই-তৃতীয়াংশ দূরত্ব অতিক্রম করতে তার দ্বিগুণ সময় লাগে। উপবৃত্তাকার কক্ষপথের ক্ষেত্রে কেপলার খুঁজে পেলেন ভিন্ন কিছু : যখন গ্রহটি কক্ষপথ বরাবর চলতে থাকে তখন এটি উপবৃত্তের ভিতর কিছুটা কীলক-আকৃতির ক্ষেত্র অতিক্রম করে। যখন এটি সূর্যের কাছাকাছি আসে, তখন এটি একটি নির্দিষ্ট সময়ে এর কক্ষপথে একটি বিশাল বৃত্তচাপ অতিক্রম করে, কিন্তু বৃত্তচাপটি দ্বারা সৃষ্ট ক্ষেত্রটি খুব বড়ো হয় না, কারণ তখন গ্রহটি থাকে সূর্যের নিকটে। যখন গ্রহটি সূর্য থেকে দূরে সরে যায়, একই সময় ব্যবধানে এটি অতিক্রম করে একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র বৃত্তচাপ, কিন্তু সূর্যটি অধিকতর দূরে বলে বৃত্তচাপটি সৃষ্টি করে অপেক্ষাকৃত বড়ো একটি ক্ষেত্র। কক্ষপথটি যেমন উপবৃত্তাকারই হোক না কেন কেপলার দেখলেন যে, এই দুটি ক্ষেত্রফল পরস্পর সমান : দীর্ঘ, ক্ষীণ ক্ষেত্র, যখন গ্রহটি সূর্য থেকে দূরবর্তী এবং হ্রস্ব, প্রশস্ত ক্ষেত্র, যখন গ্রহটি সূর্যের নিকটবর্তী, পুরোপুরি সমান। এটি ছিল গ্রহদের গতি সংক্রান্ত কেপলারের দ্বিতীয় সূত্র : গ্রহগুলো সমান সময়ে সমান ক্ষেত্রফল অতিক্রম করে।

কেপলারের প্রথম দুটি সূত্রকে কিছুটা আবছা এবং বিমূর্ত মনে হতে পারে : গ্রহগুলো উপবৃত্তাকার পথে আবর্তিত হয়, এবং সমান সময়ে সমান ক্ষেত্রফল অতিক্রম করে। তো, কী হয়েছে ? বৃত্তীয় গতি সহজেই অনুধাবনযোগ্য। স্রেফ গাণিতিক আনাড়িপনা বিবেচনা করে আমরা এই সূত্রগুলোকে বাতিল করে দেয়ার প্রবণতা দেখাতে পারি, যেগুলো প্রাত্যহিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন। কিন্তু এগুলো আমাদের গ্রহটির সূত্র। আমরা যেমন মহাকর্ষ দ্বারা ভূ-পৃষ্ঠের সাথে আকৃষ্ট থাকি, তেমনি এই সূত্রগুলো মেনে চলে পৃথিবী ধাবিত হয় আন্তঃগ্রহ স্থানের ভিতর দিয়ে। আমরা চলাচল করি প্রকৃতির সেই সব নিয়মের সাহায্যে যেগুলো প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন কেপলার। যখন আমরা গ্রহগুলোতে পাঠাই নভোযান, যখন আমরা পর্যবেক্ষণ করি দ্বৈত-নক্ষত্র, যখন আমরা পরিমাপ করি দূরের গ্যালাক্সির গতি, আমরা দেখতে পাই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সর্বত্রই মেনে চলে কেপলারের সূত্রসমূহকে।

banglainternet.com

অনেক বছর পর কেপলার উদ্ভাবন করলেন গ্রহাদির গতি সংক্রান্ত তার শেষ সূত্র, এমন এক সূত্র যা বিভিন্ন গ্রহের গতিকে পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত করে, যা সঠিক ভাবে সজ্জিত করে সৌরজগতের ঘড়ি-কল বৈশিষ্ট্যকে। তিনি 'The Harmonies of the World' নামক গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেন। ঐকতান শব্দটির দ্বারা কেপলার অনেক কিছু উপলব্ধি করেছিলেন : গ্রহাদির গতির শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্য, সেই গতিকে ব্যাখ্যা করার জন্য গাণিতিক সূত্রগুলোর অস্তিত্ব,—এমন এক ধারণা যা ফিরে যায় পিথাগোরাসের কাছে—এমনকি সাংগীতিক দৃষ্টিতে ঐকতান, 'গোলকসমূহের ঐকতান।' বুধ এবং মঙ্গলের সাথে বিসদৃশভাবে, অন্যান্য গ্রহগুলোর কক্ষপথসমূহ বৃত্তীয় বৈশিষ্ট্য হতে এত সামান্যই বিচ্যুত যে, আমরা খুব সঠিক চিত্রের সাহায্যেও এদের প্রকৃত আকার নির্ণয় করতে পারি না। পৃথিবী হল আমাদের চলমান প্ল্যাটফর্ম যেখান হতে দূরবর্তী নক্ষত্রপুঞ্জের প্রেক্ষাপটে আমরা অন্যান্য গ্রহসমূহের গতি পর্যবেক্ষণ করি।

ভিতরের দিককার গ্রহগুলো তাদের কক্ষপথে আবর্তিত হয় দ্রুতগতিতে—এই কারণেই বুধ গ্রহের নামটি এমন হল : মার্কারি ছিলেন দেবতাদের দূত। শুক্র, পৃথিবী এবং মঙ্গল ক্রমান্বয়ে অপেক্ষাকৃত কম দ্রুত আবর্তিত হয় সূর্যের চারদিকে। বাইরের দিককার গ্রহগুলো, যেমন বৃহস্পতি এবং শনি আবর্তিত হয় রাজসিকভাবে এবং ধীরে, যেমনটি শোভন দেবতাদের শ্রেষ্ঠদের জন্য।

কেপলারের তৃতীয় বা ঐকতানিক সূত্র বিবৃত করে যে, গ্রহগুলোর পর্যায়কালের বর্গসমূহ (একটি পূর্ণ আবর্তন সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় সময়) সূর্য থেকে এদের গড় দূরত্বের ঘনফলসমূহের সমানুপাতিক ; গ্রহটি যত দূরে, এটি ততই ধীরে আবর্তিত হয়, কিন্তু একটি সূক্ষ্ম গাণিতিক সূত্র অনুযায়ী : $P^2 = a^3$, যেখানে P নির্দেশ করে সূর্যের চারদিকে গ্রহটির আবর্তনকালকে, যা বৎসর এককে পরিমাপকৃত এবং a নির্দেশ করে সূর্য থেকে গ্রহটির দূরত্বকে যা 'অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল একক'-এ পরিমাপকৃত। অ্যাসট্রোনমিক্যাল একক স্থির হয় সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব দ্বারা। উদাহরণস্বরূপ, বৃহস্পতি গ্রহটি সূর্য থেকে পাঁচ অ্যাসট্রোনমিক্যাল একক দূরে, এবং $a^3 = ৫ \times ৫ \times ৫ = ১২৫$। কোন্ সংখ্যার বর্গ ১২৫ হবে ? কেন, ১১, যথেষ্ট কাছাকাছি। এবং সূর্যের চারদিকে বৃহস্পতির আবর্তনকাল ১১ বছর। একই, সূত্র প্রযোজ্য প্রতিটি গ্রহ, গ্রহানু এবং ধূমকেতুর ক্ষেত্রে।

স্রেফ প্রকৃতি হতে গ্রহাদির গতি সংক্রান্ত সূত্রগুলো আহরণ করেই ক্ষান্ত হলেন না, কেপলার প্রচেষ্টা চালালেন মৌলিক আরো কিছু অন্তর্নিহিত কারণ খুঁজে বের করতে, গ্রহগুলোর গতিতত্ত্বের উপর সূর্যের কোনো প্রভাব সম্বন্ধে। সূর্যের কাছে এলে গ্রহগুলো তাদের গতি বৃদ্ধি করে এবং দূরে সরে গেলে গতি হ্রাস করে। দূরের গ্রহগুলো কোনো এক উপায়ে বুঝে ফেলে সূর্যের উপস্থিতিকে। কেনো অবস্থানে চুম্বকত্বের প্রভাবটিও অনুধাবনযোগ্য, এবং মহাবৈশ্বিক মহাকর্ষের ধারণার এক বিস্ময়কর পূর্বাভাস দিয়ে কেপলার বললেন যে, অন্তর্নিহিত কারণটি চুম্বকত্বের মতোই :

> এই ক্ষেত্রে আমার লক্ষ্য হল এই যে, নক্ষত্রলোকীয় যন্ত্রটিকে কোনো স্বর্গীয় বস্তু বলে ভাবা ঠিক নয়, বরং এটি এক ঘড়ি-কল..., যেহেতু এর প্রায় সকল বিবিধ গতি সংঘটিত হয় কেবল একটি মাত্র, খুবই সাধারণ চৌম্বক বল দ্বারা, যেমনটি ঘড়ি-কলের ক্ষেত্রে, যেখানে সকল গতির কারণ একটি সাধারণ ভার।

অবশ্যই চুম্বকত্ব, মহাকর্ষের মতো কিছু নয়, কিন্তু এক্ষেত্রে কেপলারের মৌলিক উদ্ভাবন শ্বাসরুদ্ধকরের চাইতে কম কিছু নয় : তিনি প্রস্তাব করলেন যে, পৃথিবীর ক্ষেত্রে যে সকল মাত্রিক ভৌত সূত্র প্রযোজ্য, সেগুলো, নভোলোক যে সকল মাত্রিক ভৌত সূত্র দ্বারা পরিচালিত হয় তাদেরই ভিত্তি। এটি নভোলোকে বিভিন্ন গতির প্রথম অনাধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ; এটি পৃথিবীকে পরিণত করল মহাবিশ্বের একটি প্রদেশে। 'জ্যোতির্বিদ্যা', তিনি বললেন, 'হল পদার্থবিদ্যার একটি অংশ।' ইতিহাসের এক শিখর বিন্দুতে ঠাঁই হল কেপলারের, শেষ বিজ্ঞানমনস্ক জ্যোতিষীটি হয়ে গেলেন প্রথম জ্যোতিঃপদার্থবিদ।

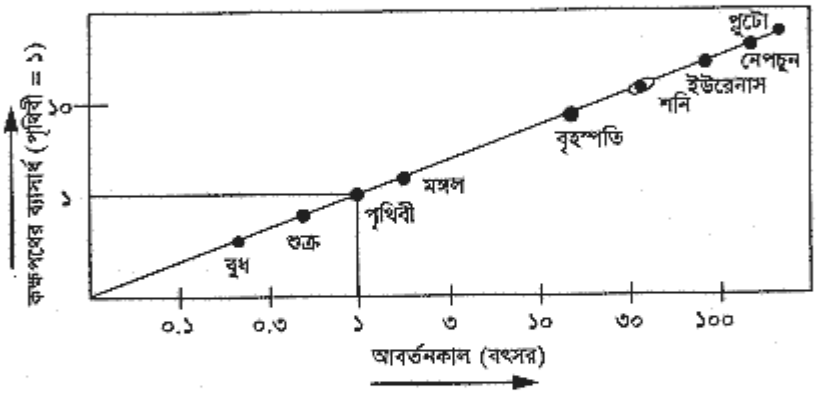

কেপলারের তৃতীয় সূত্রটি, একটি গ্রহের কক্ষপথের আকৃতি এবং সূর্যের চারদিকে একবার প্রদক্ষিণে এর প্রয়োজনীয় সময়ের মধ্যে যথার্থ সম্পর্ককে সূচিত করে। কেপলারের মৃত্যুর বহু বছর পরে আবিষ্কৃত ইউরেনাস, নেপচুন এবং প্লুটোর ক্ষেত্রেও এটি স্পষ্টতই প্রযোজ্য।

কোনো প্রশান্ত মৃদুভাষণে নয়, কেপলার তার আবিষ্কারগুলোর মূল্যায়ন করলেন এভাবে :

> কণ্ঠস্বরগুলোর এই সিম্ফনির মাধ্যমে, এক ঘণ্টারও কম সময়ে মানুষ বিচরণ করতে পারে অনন্তকালের ভিতর দিয়ে এবং সামান্য হলেও 'পরম শিল্পী', ঈশ্বরের আনন্দের স্বাদ নিতে পারে...। আমি মুক্তভাবে আত্মসমর্পণ করি পবিত্র উত্তেজনার কাছে...ধাতব ছাঁচটির ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে, এবং আমি এই গ্রন্থটি রচনা করছি—এটি পঠিত হবে এখন, নাকি ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কর্তৃক, সেটি কোনো বিষয় নয়। এটি একজন পাঠকের জন্য একটি শতাব্দী ধরে অপেক্ষা করতে পারে, কারণ ঈশ্বর নিজেই একটি সাক্ষ্যের জন্য অপেক্ষা করেছেন ৬,০০০ বছর ধরে।

banglainternet.com

'কণ্ঠস্বরগুলোর সিম্ফনি'-র মাঝে, কেপলার বিশ্বাস করতেন যে, প্রতিটি গ্রহের দ্রুতি, তার সময়কার জনপ্রিয় Latinate সংগীত-স্কেলের সাথে সাদৃশ্য বহন করে—do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. তিনি দাবি করলেন যে, গোলকগুলোর ঐকতানের মাঝে পৃথিবীর সুরগুলো হল fa এবং mi, এবং এরা famine শব্দটির ল্যাটিন রূপের কারণ। তিনি সফলভাবেই মত প্রকাশ করলেন যে, এই একক বেদনামাখা শব্দটিই পৃথিবীর বর্ণনায় সবচেয়ে উপযুক্ত।

কেপলারের তৃতীয় সূত্রের আবিষ্কারের ঠিক আট দিন পর, ত্রিশ বছরের যুদ্ধ পীড়িত প্রাগ উন্মত্ত হয়ে উঠল। যুদ্ধের সহিংসতা লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন বিপন্ন করে তুলল, কেপলারও রেহাই পেলেন না। তিনি তার স্ত্রী এবং পুত্রকে হারালেন উচ্ছৃঙ্খল সৈনিকদের হাতে, তাকে প্রদত্ত রাজ-পৃষ্ঠপোষকতা প্রত্যাহার করা হল এবং মতবাদের বিষয়ে আপসহীন ব্যক্তি-সত্তার কারণে লরেল চার্চ কর্তৃক তিনি ধর্ম হতে বহিষ্কৃত হলেন। কেপলার আরো একবার নিরাশ্রয় হয়ে পড়লেন। ক্যাথলিক এবং প্রোটেস্ট্যান্ট উভয় সম্প্রদায় কর্তৃক পবিত্র যুদ্ধ বলে আখ্যায়িত হলেও আসলে এই সংঘাতটি ছিল ভূমি ও ক্ষমতার জন্য ক্ষুধার্ত জনদের ধর্মীয় গোঁড়ামির শোষণ। অতীতে, যুধ্যমান রাজকুমারদের অস্ত্র যখন ফুরিয়ে আসত, তখন যুদ্ধ-সমাপ্তির প্রবণতা দেখা যেত। কিন্তু এখন সংগঠিত লুটেরাদেরকে নামিয়ে দেয়া হল সেনাদলকে যুদ্ধক্ষেত্রে ধরে রাখার উপায় হিসেবে। লাঙলের ফলা এবং ডাল ছাঁটার ছুরিসমূহ আক্ষরিক অর্থেই তরবারি এবং বর্শাতে* পরিণত করার ফলে ইয়োরোপের আদিম জনগোষ্ঠী অসহায় হয়ে পড়ল।

গুজব এবং নির্যাতন-আতংকের ভ্রম ছড়িয়ে পড়ল গ্রামাঞ্চলে, বিশেষত দুর্বল জনতার মাঝে। এর শিকার হল একাকী বাসরত বয়োবৃদ্ধা নারীরা, যাদেরকে জাদুবিদ্যার দায়ে অভিযুক্ত করা হল। গভীর রাতে কেপলারের মাকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া হল এক লব্রিতে। কেপলারের নিজের ছোট্ট শহর উইল ডার স্টাটে ১৬১৫ হতে ১৬২৯ খ্রিষ্টাব্দের মাঝে প্রতি বছর তিনজন নারীকে ডাইনী আখ্যায়িত করে চরম নির্যাতনের মাধ্যমে হত্যা করা হত। এবং ক্যাথেরিনা কেপলার ছিলেন একজন কলহপ্রিয় বৃদ্ধা। তিনি জড়িয়ে পড়লেন বিবাদে যা বিরক্ত করে তুলেছিল স্থানীয় অভিজাত সম্প্রদায়কে, এবং তিনি বিক্রয় করতেন নিদ্রাকর এবং সম্ভবত ভ্রমোৎপাদক ঔষধসামগ্রী যেমনটি করে থাকে সমকালীন মেক্সিকান কিউরেনডেরাসগণ। হতভাগ্য কেপলার বিশ্বাস করতেন যে তার কারণেই তার স্ত্রীর এই পরিণতি।

এমনটি হল এ কারণে যে, বিজ্ঞানকে ব্যাখ্যা এবং জনপ্রিয় করার ইচ্ছায় কেপলার লিখলেন প্রথম দিককার বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীগুলোর অন্যতম একটি। এর নাম ছিল 'Somnium', 'দ্য ড্রিম'। তিনি কল্পনা করলেন এক চন্দ্রাভিযান, নভোচারীরা দাঁড়িয়ে আছেন চন্দ্রপৃষ্ঠে এবং দেখতে লাগলেন পৃথিবী নামের এক

* গ্রাজ অস্ত্রাগারে এখনো কিছু নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়।

মনোমুগ্ধকর গ্রহকে, যা আকাশে তাদের উপর দিয়ে ধীরে ধীরে আবর্তিত হচ্ছিল। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টিয়ে আমরা বুঝতে পারি, কীভাবে গ্রহগুলো ক্রিয়ারত। পৃথিবী ঘূর্ণনশীল—এ ধারণার ব্যাপারে কেপলারের কালে প্রধান আপত্তি ছিল এই সত্যটি যে মানুষ পৃথিবীর গতি অনুভব করতে পারে না। 'Somnium'-এ তিনি পৃথিবীর আবর্তনকে যুক্তিসঙ্গত, নাটকীয় এবং বোধগম্য করার জন্য সচেষ্ট হলেন : 'যতদিন জনতা ভুল না করবে,...আমি ততদিন তাদেরই পক্ষে থাকতে চাই। তাই আমি যতটা সম্ভব বেশি জনের কাছে ব্যাখ্যা করার তাড়না অনুভব করি।' (অন্য এক উপলক্ষে তিনি একটি চিঠিতে লিখলেন, 'আমাকে গাণিতিক হিসেবের ঘানির মধ্যে ফেলে দেয়ার দণ্ডাজ্ঞা দিয়ো না—দার্শনিক ভাবনার জন্য আমাকে কিছুটা সময় দাও, যা আমার একমাত্র আনন্দ।'*)

দূরবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কারের সাথে, কেপলারের 'চান্দ্র ভূগোল'-কে সম্ভব বলে মনে হচ্ছিল। 'Somnium'-এ তিনি চাঁদকে পর্বত এবং উপত্যকায় পূর্ণ এবং 'রন্ধ্রযুক্ত, যেন পুরোটাই গর্ত ও গুহা খনন করা' বলে বর্ণনা করেছিলেন, প্রথম নভোদূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে সম্প্রতি গ্যালিলিও কর্তৃক আবিষ্কৃত চাঁদের অগ্নিগিরির জ্বালামুখগুলোর সাথে যেগুলো সাদৃশ্য বহন করে। তিনি এটিও কল্পনা করেছিলেন যে চাঁদে তার অধিবাসীও রয়েছে, যারা স্থানীয় পরিবেশের রুক্ষতার সাথে ভালোভাবেই খাপ খাইয়ে নিয়েছে। তিনি চন্দ্রপৃষ্ঠ হতে দৃষ্ট ধীরে আবর্তনশীল পৃথিবীকে বর্ণনা করেছেন এবং কল্পনা করেন আমাদের গ্রহের মহাদেশ ও মহাসাগরগুলোকে যেন এরা 'চাঁদের মানুষ'-এর আদলে সৃষ্টি করে কিছু সংশ্লিষ্ট বিম্ব। তিনি জিব্রাল্টার প্রণালিতে উত্তর আফ্রিকার সাথে দক্ষিণ স্পেনের নিকট-সংযোগকে চিত্রায়িত করেন উড়ন্ত

* কেপলারের মত ব্রাহে জ্যোতিষতত্ত্বের প্রতি কম আক্রমণাত্মক ছিলেন, যদিও তিনি জ্যোতিষতত্ত্বের নিজ গোপন প্রকরণটিকে তার কালের অধিকতর সাধারণ প্রকরণসমূহ থেকে সযত্নে আলাদা করে রাখেন। ১৫৯৮ সালে প্রকাশিত তার গ্রন্থ 'Astronomiae Instauratae Mechanica'-তে তিনি মতামত দিলেন যে, যদি নক্ষত্রগুলোর অবস্থানের চার্টসমূহের যথাযথ উৎকর্ষ সাধন করা যায় তবে, জ্যোতিষতত্ত্ব, 'যেমনটি ভাবা হয়, তার চাইতে অধিক বিশ্বাসযোগ্য।' ব্রাহে লিখলেন : 'আমি ২৩ বছর বয়স থেকে মগ্ন ছিলাম আলকেমি এবং নভোলোক সংক্রান্ত জ্ঞান নিয়ে।' কিন্তু তিনি অনুধাবন করলেন যে, এই উভয় ছদ্মবিজ্ঞানে রয়েছে এমন সব গোপন বিষয় যেগুলো সাধারণ মানুষের জন্য বিপজ্জনক (যদিও পুরোপুরি নিরাপদ থাকার পরেও, তিনি ভাবলেন, সেইসব রাজপুত্র এবং রাজাদের হাতে যাদের কাছ থেকে তিনি সাহায্য আশা করছিলেন)। ব্রাহে এমন কিছু বিজ্ঞানীর দীর্ঘ এবং অতি বিপজ্জনক ঐতিহ্য বজায় রাখলেন যারা বিশ্বাস করতেন যে, তারা এবং গির্জা সম্পর্কীয় শক্তিরাই রহস্যময় জ্ঞান সম্বন্ধে বিশ্বাসযোগ্য : 'এরূপ বিষয়সমূহকে সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে আনা অযৌক্তিক এবং এতে কোনো উদ্দেশ্যও সাধিত হয় না।' অন্যদিকে, কেপলার স্কুলসমূহে বক্তৃতা দিলেন জ্যোতির্তত্ত্বের উপর, ব্যাপকভাবে প্রকাশনায় জড়িয়ে পড়লেন এবং প্রায়শই তা নিজ খরচে, এবং লিখলেন বৈজ্ঞানিক কল্প কাহিনী, যেগুলো নিশ্চিতভাবেই তার বৈজ্ঞানিক মেধার সমকক্ষতার উদ্দেশ্যে রচিত হয়নি। আধুনিক ধারণায় তিনি হয়ত জনপ্রিয় বিজ্ঞান-লেখক ছিলেন না কিন্তু এতেই প্রকাশিত হয়ে পড়ে একই প্রজন্মে টাইকো এবং কেপলারের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য।

banglainternet.com

পোশাক পরিহিতা এক তরুণী কর্তৃক তার প্রেমিককে চুম্বন করার উপক্রম রূপে—যদিও স্পর্শমান নাকটি দেখতে প্রায় আমারটির মতোই।

চাঁদের দিন এবং রাতের দৈর্ঘ্য বিবেচনা করে কেপলার বর্ণনা করলেন, 'চাঁদে রয়েছে জলবায়ুর চরম অপরিমিত অবস্থা এবং সংঘটিত হয় অতিশয় তাপ ও শৈত্যের অসহনীয় পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তন', যা পুরোপুরি সঠিক। অবশ্যই তার সব ধারণা সঠিক ছিল না। উদাহরণ স্বরূপ, তিনি বিশ্বাস করতেন যে, চাঁদে ছিল বিপুল চান্দ্র বায়ুমণ্ডল, মহাসাগর এবং জনবসতি। তার ধারণায় সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক ছিল চাঁদে অগ্নিগিরির জ্বালামুখসমূহের উদ্ভব, তার মতে, যা চাঁদকে পরিণত করে 'গুটি বসন্তে কোনো বালকের বিকৃত মুখাবয়বের চেয়ে খুব একটা ভিন্নতর নয় এমন কিছুতে।' তিনি সঠিকভাবেই মতামত দিলেন যে, অগ্নিগিরির জ্বালামুখগুলো টিলার চাইতে খানাখন্দের সাথেই বেশি সদৃশ। তার নিজের পর্যবেক্ষণসমূহ হতে তিনি লক্ষ করলেন অনেক অগ্নিগিরির জ্বালামুখের চারদিকে বিরাজমান মাটির উঁচু বাঁধ এবং কেন্দ্রীয় চূড়াসমূহকে। কিন্তু তিনি ভাবলেন যে, এদের নিয়মিত বৃত্তীয় আকৃতি এমনই শৃঙ্খলার মাত্রা নির্দেশ করত যা কেবল বুদ্ধিমান প্রাণীর পক্ষেই ব্যাখ্যা করা সম্ভব। তিনি ভাবলেন না যে, শূন্য হতে পতিত বিশাল শিলাখণ্ডগুলো সৃষ্টি করতে পারে স্থানীয় বিস্ফোরণ, যা সকল দিকেই সুষমভাবে প্রতিসম, যেটি সৃষ্টি করে একটি বৃত্তীয় গহ্বর—যা চাঁদ এবং অন্যান্য গ্রহগুলোতে অগ্নিগিরির জ্বালামুখের স্তূপের উদ্ভবের মূল কারণ। এর পরিবর্তে তিনি অনুমান করলেন 'এমন কিছু গোত্রের অস্তিত্ব যারা চন্দ্রপৃষ্ঠে ওই সব গহ্বর নির্মাণ করতে যুক্তিগতভাবেই সমর্থ। গোত্রটির অবশ্যই থাকতে হবে অনেক জনবল, ফলে একটি দল স্থাপন করে একটি গহ্বর, অন্যদল অন্য একটি।' এরূপ বিশাল নির্মাণ-কাজ সম্ভব ছিল না—এই মতের বিরুদ্ধে, কেপলার পাল্টা উদাহরণ হিসেবে মিশরের পিরামিডসমূহ এবং চীনের প্রাচীরের কথা প্রস্তাব করলেন, প্রকৃতপক্ষে, যেগুলোকে আজ পৃথিবীর কক্ষপথ থেকেও দেখা সম্ভব। জ্যামিতিক শৃঙ্খলা যে অন্তর্নিহিত বুদ্ধিমত্তাকে প্রকাশ করে এই ধারণাটি কেপলারের জীবনে ছিল কেন্দ্রীয়। চাঁদে অগ্নিগিরির জ্বালামুখের ব্যাপারে তার মতামত ছিল মঙ্গলের খাল-বিতর্কের (৫ম অধ্যায়) এক সুস্পষ্ট পূর্বাভাস। এটি দুঃখজনক যে, বহির্জাগতিক প্রাণের জন্য পর্যবেক্ষণমূলক অনুসন্ধান শুরু হয়েছিল দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কারের একই প্রজন্মে এবং যুগের শ্রেষ্ঠতম তাত্ত্বিকদের সাথে।

'Somnium'-এর কিছু অংশ স্পষ্টতই ছিল আত্মজীবনীমূলক। উদাহরণস্বরূপ, নায়ক দেখা করে টাইকো ব্রাহের সাথে। তার পিতা-মাতা বিক্রয় করে ড্রাগ। তার মা সংসর্গ দান করে আত্মা ও পিশাচকে, যাদের একটি শেষপর্যন্ত চাঁদে যাওয়ার উপায় নির্দেশ করে। 'Somnium' আমাদের কাছে এটি স্পষ্ট করে দেয় যে, যদিও এটি কেপলারের সমসাময়িক সবাইকে তা করতে পারেনি যে, 'একজন মানুষকে মাঝে মাঝে স্বপ্নে এমন কিছু কল্পনা করার স্বাধীনতা অবশ্যই দেয়া উচিত যা চেতনার উপলব্ধির জগতে কখনো অস্তিত্বশীল ছিল না।' 'ত্রিশ বছরের যুদ্ধ'-এর

কালে বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীর ধারণা ছিল নতুন, এবং কেপলারের বইটি ব্যবহৃত হল এই সাক্ষ্য হিসেবে যে, তার মা ছিল একজন ডাইনি।

অন্যান্য চরম ব্যক্তিগত সমস্যাগুলোর মাঝেই কেপলার দ্রুত ছুটে গেলেন উরটেমবার্গে তার চুয়াত্তর বছর বয়সের মাকে খোঁজার জন্য যিনি শৃঙ্খলিত ছিলেন জনপদের এক ভূগর্ভস্থ অন্ধকার কারাকক্ষে। একজন বিজ্ঞানীর স্বভাবতই যেমনটি করা উচিত, তিনি জাদুকলার অভিযোগের উৎস সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে সচেষ্ট হলেন, এমনকি উরটেমবার্গের নাগরিকদের সাধারণ শারীরিক অসুস্থতাকেও, যেগুলো তার জাদুকলার কারণে হয়েছিল বলে ধারণা করা হত। গবেষণাটি সফল হল, এটি ছিল একটি বিজয়, যেমনটি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ঘটেছিল তার বাকিটা জীবনে, অন্ধবিশ্বাসের উপর যুক্তির বিজয়। তার মাকে নির্বাসনে পাঠানো হল, যদি তিনি আবার কখনো উরটেমবার্গে ফেরেন তাকে মৃত্যুর স্বাদ নিতে হবে—এই অগ্রিম দণ্ডাজ্ঞা দিয়ে ; এবং কেপলারের আত্মপক্ষ সমর্থনের দৃঢ়তা দৃশ্যত ডিউকের এমন এক অধ্যাদেশ জারিকে ত্বরান্বিত করল যাতে অপ্রতুল সাক্ষ্যের মাধ্যমে জাদুকলার জন্য আদালতের আরো বিচারকে নিষেধ করা হল।

যুদ্ধের কারণে সবকিছুর আকস্মিক পরিবর্তন কেপলারকে তার অধিকাংশ আর্থিক সমর্থন থেকে বঞ্চিত করল, এবং তার জীবনের শেষ অংশ অতিবাহিত হল অনিশ্চিতভাবে, অর্থ ও স্পন্সর প্রার্থনা করে। তিনি ওয়ালেনস্টাইনের ডিউকের জন্য রাশিচক্র পরীক্ষা করতেন, যেমনটি তিনি করেছিলেন দ্বিতীয় রুডল্‌ফের জন্য, এবং জীবনের শেষ ক'টি বছর কাটালেন ওয়ালেনস্টাইনের নিয়ন্ত্রিত এক সাইলেসিয়ান শহরে যেটির নাম ছিল সাগান। তার সমাধিলিপিতে ছিল তার নিজেরই রচনা : 'আমি আকাশকে পরিমাপ করেছিলাম, এখন আমি পরিমাপ করি ছায়াসমূহকে। মন বিচরণ করে আকাশ অবধি, শরীর বিশ্রাম নেয় মর্তে'। কিন্তু 'ত্রিশ বছরের যুদ্ধ' নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছে তার কবরটিকে। যদি আজ কোনো স্তম্ভ নির্মাণ করা হত, তবে তার বৈজ্ঞানিক সাহসের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এটি পড়া যেত : 'প্রিয়তম মরীচিকাগুলোর চাইতে তিনি কঠিন সত্যগুলোকেই বেশি পছন্দ করতেন।'

জোহানেস কেপলার বিশ্বাস করতেন যে, এমন একদিন আসবে যখন 'নভোলোকের বায়ুর সাথে অভিযোজিত পার্থিব নভোযানগুলো' সেই অভিযাত্রীদেরকে নিয়ে পাড়ি দেবে মহাশূন্য, এর 'বিশালতাকে যারা ভয় পাবে না'। এবং আজ সেইসব অভিযাত্রী, মানুষ ও রোবট, মহাশূন্যের বিশালতার ভিতর দিয়ে তাদের অভিযাত্রার সময় নির্ভুল নির্দেশক হিসেবে প্রয়োগ করে গ্রহাদির গতি সংক্রান্ত সূত্র তিনটিকে, কেপলার যেগুলো উদ্‌ঘাটন করেন তার জীবন-ব্যাপী ব্যক্তিগত পরিশ্রমী প্রচেষ্টার ফল এবং আনন্দময় আবিষ্কার রূপে।

গ্রহগুলোর গতি অনুধাবন করার জন্য, নভোলোকে একটি ঐকতান খুঁজে পাবার জন্য, জোহানেস কেপলারের সারা জীবনের অনুসন্ধান, শীর্ষবিন্দুতে পৌছল

banglainternet.com

তার মৃত্যুর ছত্রিশ বছর পর, আইজাক নিউটনের কাজে। নিউটনের জন্ম হয়েছিল ১৬৪২ খ্রিষ্টাব্দের ক্রিসমাস দিবসে, এতটাই ক্ষুদ্র আকৃতির ছিলেন যে, পরে তার মা তাকে বলেছিলেন যে, তাকে পুরে ফেলা যেতে পারত কোনো কোয়ার্ট মগে। রুগ্ন, তার পিতা-মাতা কর্তৃক পরিত্যক্ত বলে ধারণাগ্রস্ত, খিটখিটে মেজাজের, অসামাজিক, আমৃত্যু চিরকুমার, আইজাক নিউটন সম্ভবত সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক প্রতিভা।

এমনকি যুবক জীবনেও, নিউটন অধৈর্য হয়ে উঠতেন অলীক প্রশ্ন নিয়ে, যেমন আলোক 'কোনো পদার্থ বা দৈব কোনো কিছু' ছিল কি না, মধ্যবর্তী বায়ুশূন্য স্থানে কীভাবে মহাকর্ষ কাজ করে। তিনি প্রথমে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, ট্রিনিটিতে প্রচলিত খ্রিষ্টীয় বিশ্বাস ছিল বাইবেলের এক ভুল পঠন। তার আত্মজীবনী লেখক, জন মেনার্ড কিনিসের মতে,

> তিনি ছিলেন মেইমোনিডিসের স্কুলে একেশ্বরবাদী কোনো ইহুদির মতো। তিনি এই উপসংহারে পৌঁছলেন, তেমন কোনো যৌক্তিক বা সংশয়বাদী ভিত্তিতে নয়, কিন্তু পুরোপুরিভাবে প্রাচীন তথ্যের ব্যাখ্যার ভিত্তিতে। তিনি প্ররোচিত হয়েছিলেন যে, প্রকাশিত প্রমাণাদি ট্রিনিটারিয়ান মতাদর্শের প্রতি কোনো সমর্থন জোগাল না, যেগুলো পরে ভুল প্রমাণিত হয়েছিল। প্রকাশিত ঈশ্বরটি ছিলেন একেশ্বর। কিন্তু এটি ছিল এক চরম গোপনীয়তা, যা সারা জীবন ধরে নিউটনের জন্য বয়ে এনেছিল নিদারুণ যন্ত্রণা।

কেপলারের মতো তিনি তার কালের অন্ধ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন না এবং অনেক অতীন্দ্রিয় বিষয়ের মুখোমুখি হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, নিউটনের অধিকাংশ বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের উৎস রূপে গণ্য করা যায় যুক্তিশীলতা ও অতীন্দ্রিয়তার মধ্যে তার এই অনিশ্চয়তাকে। ১৬৬৩ খ্রিষ্টাব্দে, স্টুরব্রিজ মেলাতে, বিশ বছর বয়সে, তিনি জ্যোতিষ-শাস্ত্রের উপর একটি বই ক্রয় করলেন, 'এর মধ্যে কী লেখা আছে তা দেখার কৌতূহলে।' তিনি পাঠ করলেন যতক্ষণ না তিনি এমন একটি চিত্র দেখলেন যা তিনি বুঝতে পারলেন না, কারণ তখন ত্রিকোণমিতি সম্বন্ধে তার কোনো জ্ঞান ছিল না। কাজেই তিনি ত্রিকোণমিতির উপর একটি বই কিনলেন, কিন্তু অনতিবিলম্বে আবিষ্কার করলেন যে তিনি জ্যামিতিক মতামতসমূহ অনুসরণ করতে পারছেন না। কাজেই তিনি ইউক্লিডের 'এলিমেন্ট্স অব জিওমেট্রি'-র একটি কপি নিলেন এবং এটি পড়তে থাকলেন। এর দুবছর পর তিনি উদ্ভাবন করলেন ডিফারেনশিয়াল ক্যালকুলাস।

ছাত্র হিসেবে নিউটনের আগ্রহ ছিল আলোর প্রতি এবং বিদ্ধ হয়েছিলেন সূর্য দ্বারা। তিনি একটি আয়নায় সূর্যের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে থাকার মারাত্মক চর্চাটি গ্রহণ করেছিলেন :

> কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আমি আমার চোখগুলোকে এমন এক অবস্থায় নিয়ে আসতাম যে, কোনো চোখ দিয়েই আমি কোনো উজ্জ্বল বস্তুর দিকে তাকাতে পারতাম না। কিন্তু

> আমার সামনে দেখতে পেতাম সূর্যকে, ফলে আমি লিখতে বা পড়তে পারতাম না, কিন্তু আমার চোখের কার্যক্ষমতা ফিরিয়ে আনার জন্য আমি আমাকে তিন দিন ধরে আটকে রাখতাম আমার অন্ধকার প্রকোষ্ঠে এবং সূর্য থেকে আমার কল্পনাকে সরিয়ে দেয়ার জন্য সকল উপায়ই প্রয়োগ করতাম। কারণ, যদিও আমি অন্ধকারে ছিলাম, তবু আমি ওকে নিয়ে চিন্তা করলে এখন এর ছবি দেখতে পেতাম।

১৬৬৬ খ্রিষ্টাব্দে, তেইশ বছর বয়সে, নিউটন যখন ছিলেন ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন আন্ডারগ্রাজুয়েট প্রাদুর্ভাব ঘটল প্লেগের, যা তাকে ওলস্থর্পের এক নির্জন গ্রামে অলস একটি বছর কাটাতে বাধ্য করল, যেটি ছিল তার জন্ম স্থান। তিনি আত্মনিমগ্ন থাকলেন ডিফারেনশিয়াল ও ইন্টিগ্র্যাল ক্যালকুলাস উদ্ভাবনের মাধ্যমে, আলোর প্রকৃতির উপর মৌলিক আবিষ্কার সম্পন্ন করে, সার্বজনীন মহাকর্ষ তত্ত্বের ভিত্তি স্থাপন করে। পদার্থ বিজ্ঞানের ইতিহাসের এরকম কেবল আর একটি বছর হল আইনস্টাইনের 'বিস্ময়ের বছর', ১৯০৫ সন। যখন জিজ্ঞাসা করা হল যে তিনি কীভাবে তার বিস্ময়কর আবিষ্কারগুলো সম্পন্ন করেছেন, নিউটন নিরাসক্তভাবে উত্তর দিলেন, 'এদেরকে নিয়ে চিন্তা করে।' তার অর্জন এতটাই তাৎপর্যপূর্ণ ছিল যে, ক্যামব্রিজে তার শিক্ষক আইজাক ব্যারো, গণিতের বিভাগীয় প্রধানের পদটিতে ইস্তফা দিলেন নিউটনকে তা দেয়ার জন্য, পাঁচ বছর পর তরুণ ছাত্রটি কলেজে ফিরে আসার পর।

মধ্য চল্লিশের নিউটন, তার পরিচারক কর্তৃক বর্ণিত হলেন এভাবে :

> আমি তাকে কখনো আনন্দ-স্ফূর্তি বা অবসর-বিনোদনের জন্য মুক্ত বায়ু সেবনের উদ্দেশ্যে ঘোড়া চালাতে, হাঁটতে, বোলিং করতে, বা অন্য কোনো ব্যায়াম করতে দেখিনি। তিনি ভাবতেন যে, পড়ার বাইরে কাটানো সবটুকু সময়ই অপচয় মাত্র, তিনি পড়ার সাথে এতটাই নিবিড় থাকতেন যে, টার্ম পরীক্ষার সময়টুকু ব্যতীত তিনি কদাচিৎ তার কক্ষ ত্যাগ করতেন...যেখানে খুব কম সংখ্যক ছাত্রই তার কথা শুনতে যেত, এবং তার চেয়েও আরো কমসংখ্যক ছাত্র তাকে উপলব্ধি করতে পারত, ফলে অবসর সময়গুলো তার কেটে যেত শ্রোতার অভাবে, চারপার্শ্বের দেয়ালগুলোর উদ্দেশ্যে পাঠ করে।

কেপলার ও নিউটন উভয়ের ছাত্ররা কখনো জানতে পারেনি তারা কী হারিয়েছে।

নিউটন আবিষ্কার করেন জড়তার সূত্র, যদি কোনো কিছু কোনো গতিশীল বস্তুকে প্রভাবিত না করে এবং একে এর পথ থেকে বিচ্যুত না করে তবে এটি সরল রেখায় সমবেগে গতিশীল থাকার প্রবণতা দেখায়। নিউটনের কাছে মনে হয়েছিল যে, চাঁদ এর কক্ষপথের স্পর্শক বরাবর সরলরেখায় ছুটে যাবে, যদি না অন্যকোনো বল সর্বদা পথটিকে প্রায় একটি বৃত্তে পরিণত করে, একে টেনে আনে পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে। নিউটন এই বলটিকে অভিহিত করলেন মহাকর্ষ রূপে, এবং বিশ্বাস করতেন যে এটি দূর হতে ক্রিয়া করে। পৃথিবী এবং চাঁদকে ভৌতভাবে কোনো

banglainternet.com

কিছুই সংযুক্ত করে না। এবং তথাপি পৃথিবী সর্বদা চাঁদকে আকর্ষণ করছে আমাদের দিকে। কেপলারের তৃতীয় সূত্র ব্যবহার করে, নিউটন গাণিতিকভাবে মহাকর্ষ* বলের প্রকৃতি সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন। তিনি দেখালেন, যে বলটি একটি আপেলকে আকর্ষণ করে পৃথিবীর দিকে সেটিই চাঁদকে ধরে রাখে তার কক্ষপথে এবং সুদূর গ্রহ বৃহস্পতির সদ্য আবিষ্কৃত উপগ্রহগুলোর এদের কক্ষপথসমূহে আবর্তনের জন্য সেই বলটিই দায়ী।

বস্তুনিচয় নিচে পতিত হচ্ছে কালের প্রারম্ভ থেকে। অর্থাৎ মানব ইতিহাসে পুরোটা সময় ধরে বিশ্বাস করা হত যে, চাঁদ পৃথিবীর চারদিকে আবর্তিত হয়। নিউটন ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি প্রথম বুঝতে পারলেন যে, এই দুটি ঘটনা একই কারণের ফলাফল। এটিই হল নিউটনীয় মহাকর্ষের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত 'সার্বজনীন' কথাটির অর্থ। মহাকর্ষের একই সূত্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্রই প্রযোজ্য।

এটি হল বিপরীত বর্গীয় সূত্র। বলটি দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতে পরিবর্তিত হয়। যদি দুটি বস্তুকে দ্বিগুণ দূরত্বে সরানো হয়, তবে যে মহাকর্ষ এদেরকে পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ করে তার মান পূর্বের তুলনায় এক-চতুর্থাংশ হবে। যদি এদেরকে দশগুণ দূরত্বে সরানো হয় তবে মহাকর্ষের মান দশের বর্গ, $১০^২ = ১০০$ গুণ কমে যাবে। পরিষ্কারভাবেই, বলটি অবশ্যই কোনো একভাবে ব্যস্তানুপাতিক—অর্থাৎ দূরত্বের বৃদ্ধির সাথে হ্রাস পাবে। যদি বলটি সমানুপাতিক হত, বৃদ্ধি পেত দূরত্বের সাথে তখন সবচেয়ে বেশি বল ক্রিয়া করত সবচেয়ে দূরের বস্তুর উপর, এবং আমি মনে করি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল বস্তুকণা নিজেদেরকে আবিষ্কার করত একটি একক মহাজাগতিক পিণ্ডে পরিণত হওয়ার জন্য দ্রুতবেগে ধাবমান রূপে। না, মহাকর্ষ কমে যায় দূরত্বের সাথে, এই কারণে একটি ধূমকেতু বা গ্রহ যখন সূর্য থেকে দূরে থাকে তখন এটি ধীরে চলে এবং যখন সূর্যের কাছে থাকে তখন দ্রুত চলে—সূর্য থেকে যত দূরে থাকবে এটি তত কম মহাকর্ষ অনুভব করবে।

গ্রহগুলোর গতি সংক্রান্ত কেপলারের তিনটি সূত্রকেই প্রতিপাদন করা যায় নিউটনীয় নীতিমালা হতে। কেপলারের সূত্রগুলো ছিল পরীক্ষালব্ধ, যেগুলোর ভিত্তি ছিল টাইকো ব্রাহের কষ্টসহিষ্ণু পর্যবেক্ষণসমূহ। নিউটনের সূত্রগুলো ছিল তাত্ত্বিক, সাধারণ গাণিতিক নির্যাস যেগুলো হতে টাইকোর সব পরিমাপ শেষপর্যন্ত নির্ণয় করা যেত। প্রিন্সিপিয়াতে অকপট গর্ববোধ নিয়ে নিউটন লিখলেন যে এই সূত্রগুলো হতে, 'এখন আমি জগতের ব্যবস্থাটির কাঠামো প্রতিপাদন করতে পারি।'

তার পরবর্তী জীবনে, নিউটন 'রয়েল সোসাইটি'-র সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন, যেটি ছিল বিজ্ঞানীদের একটি সংঘ এবং ছিলেন 'মাস্টার অব দ্য মিন্ট',

* দুঃখজনকভাবে, নিউটন তার কালজয়ী গ্রন্থ 'প্রিন্সিপিয়া'-তে কেপলারের প্রতি ঋণের কথা উল্লেখ করেননি। কিন্তু ১৬৮৬ সালে এডমুন্ড হ্যালির কাছে লিখিত এক চিঠিতে মহাকর্ষ সংক্রান্ত তার সূত্র সম্বন্ধে বলেন : 'আমি দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি যে, আমি প্রায় বিশ বছর পূর্বে কেপলারের উপপাদ্য থেকে এটি আহরণ করি।'

যেখানে তিনি তার সামর্থ্য প্রয়োগ করলেন জাল মুদ্রার প্রকাশ নিরুদ্ধ করার জন্য। তার স্বভাবের অস্থিরচিত্ততা এবং বিচ্ছিন্নতা-প্রবণ দিকটির বিকাশ ঘটল ; তিনি সেই সকল বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টাসমূহ বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিলেন যেগুলো অন্য বিজ্ঞানীদের সাথে তাকে নিয়ে আসছিল একটি বিবাদপূর্ণ বিরোধে, বিশেষত অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রসমূহে ; এবং এমন সব লোক ছিল যারা ছড়িয়ে দিল যে, তিনি সপ্তদশ শতাব্দীর মুখোমুখি হলেন এক 'স্নায়বিক বৈকল্য' নিয়ে। যা হোক, নিউটন আলকেমি এবং রসায়নের মধ্যকার সীমারেখা নিয়ে আজীবন গবেষণা চালিয়ে গেলেন এবং সাম্প্রতিক কিছু সাক্ষ্য ইঙ্গিত দেয় যে, তিনি ভারি ধাতব বস্তুর বিষক্রিয়ার মতো কোনো মনোরোগে ভুগছিলেন না, যা স্বল্প পরিমাণ আর্সেনিক এবং পারদের নিয়মিত গলাধঃকরণ থেকে উৎপন্ন হয়। এটি সেই সময়ের রাসায়নবিদদের কাছে স্বাদ অনুধাবনের জন্য একটি বিশ্লেষণধর্মী পদ্ধতি হিসেবে বহুল ব্যবহৃত ছিল।

এতদসত্ত্বেও তার বিপুল বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতা বজায় থাকল অপ্রতিরোধ্যভাবে। ১৬৯৬ সনে সুইস গণিতজ্ঞ জোহান বার্নোলি তার সহকর্মীদেরকে ব্র্যাকিস্টোক্রোন সমস্যা নামে একটি অমীমাংসিত সমস্যা সমাধান করতে চ্যালেঞ্জ জানালেন, পার্শ্বীয়ভাবে পরস্পর থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বে অবস্থিত দুটি বিন্দুর সংযোগকারী বক্ররেখাটির উল্লেখ করে, যে পথে শুধুমাত্র মহাকর্ষের প্রভাবে একটি বস্তু স্বল্পতম সময়ে পতিত হবে।

প্রকৃতপক্ষে বার্নোলি ছয় মাসের একটি চূড়ান্ত সময়সীমা বেধে দিলেন, কিন্তু লিবনিজের অনুরোধে এটি বর্ধিত করলেন দেড় বছর পর্যন্ত, যিনি ছিলেন তার সময়ের অন্যতম প্রধান বিদ্বান, এবং যিনি নিউটনের উপর নির্ভর না করে ডিফারেনশিয়াল ও ইন্টিগ্যাল ক্যালকুলাস আবিষ্কার করেন। চ্যালেঞ্জটি নিউটনের কাছে দেয়া হল ১৬৯৭ সালের ২৯শে জুনের বিকেল ৪টায়। পরদিন ভোরে কাজের উদ্দেশ্যে যাওয়ার পূর্বেই তিনি 'calculus of variations' নামে গণিতের এক সম্পূর্ণ নতুন শাখা আবিষ্কার করলেন, একে ব্যবহার করলেন ব্যাকিস্টোক্রোন সমস্যা সমাধানের জন্য এবং সমাধানটি পাঠিয়ে দিলেন এবং নামহীনভাবে, নিউটনের অনুরোধে তা প্রকাশিত হল। কিন্তু কাজটির চমৎকারিত্ব এবং মৌলিকতা এর লেখকের পরিচয়ের সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করল। যখন বার্নোলি সমাধানটি দেখলেন, তিনি মন্তব্য করলেন, 'আমরা নখর দেখেই চিনতে পারি সিংহকে।' তখন নিউটনের বয়স পঞ্চান্ন বছর।

তার শেষ বছরগুলোতে প্রধান বুদ্ধিবৃত্তিক অনুসন্ধান ছিল প্রাচীন সভ্যতাগুলোর সময়ানুক্রমের সামঞ্জস্য ও প্রাচীন ইতিহাসবেত্তা ম্যানিথো, স্ট্র্যাবো এবং এরাটোস্থেনেসের ঐতিহ্য মেনে। তার শেষ মরণোত্তর কাজ, 'The Chronology of Ancient Kingdoms Amended'-এ, আমরা খুঁজে পাই ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহের পুনরাবৃত্তিমূলক জ্যোতির্তাত্ত্বিক ক্রমাঙ্কন ; সলোমন মন্দিরের একটি

banglainternet.com

স্থাপত্যকলা সংক্রান্ত পুনঃনির্মাণ ; একটি উল্কানিমূলক দাবি যে, সকল 'উত্তর গোলার্ধ' নক্ষত্রপুঞ্জের নামকরণ করা হয়েছে জ্যাসন এবং আর্গোনটদের গ্রিক কাহিনীর ব্যক্তিত্ব, বস্তু ও ঘটনার মাধ্যমে ; এবং সঙ্গতিপূর্ণ ধারণা যে, নিউটনের নিজের একমাত্র ব্যতিক্রমটি ব্যতীত সকল সভ্যতার দেবতাগণ ছিল স্রেফ প্রাচীন রাজা এবং বীরগণ যেগুলো পরবর্তী প্রজন্ম কর্তৃক অগ্রাহ্য হল।

কেপলার এবং নিউটন প্রতিনিধিত্ব করলেন মানব ইতিহাসের এক জটিল ক্রান্তিকালের, এই আবিষ্কারটি যে বেশ সহজ গাণিতিক সূত্র বিরাজ করে প্রকৃতির সর্বত্র ; অর্থাৎ একই সূত্র পৃথিবী এবং নভোমণ্ডল, উভয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ; এবং আমরা যেভাবে চিন্তা করি ও প্রকৃতি যেভাবে কাজ করে তার মাঝে রয়েছে এক ঐকতান। তারা অকুণ্ঠিতভাবে সম্মান দেখালেন পর্যবেক্ষণমূলক উপাত্তের নির্ভুলতার প্রতি, এবং অতি নিখুঁতভাবে গ্রহগুলোর গতি অনুমান করার ক্ষেত্রে তাদের সামর্থ্য এই সাক্ষ্যটি প্রদান করল যে, মানুষ এক অপ্রত্যাশিত গভীরতায় পৌঁছে উপলব্ধি করতে পারে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে। আমাদের আধুনিক বৈশ্বিক সভ্যতা, পৃথিবী সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মহাবিশ্ব জুড়ে আমাদের বর্তমান অভিযান—এসব কিছুই তাদের অন্তর্দৃষ্টির কাছে গভীরভাবে ঋণী।

নিউটন তার আবিষ্কারগুলো নিয়ে সদা সতর্ক থাকতেন এবং তার বৈজ্ঞানিক সহকর্মীদেরকে চরম প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করতেন। বিপরীতবর্গীয় সূত্র আবিষ্কারের পর এটি প্রকাশ করতে এক বা দুই যুগ অপেক্ষা করার তিনি কোনো কারণ খুঁজে পেলেন না। কিন্তু প্রকৃতির মহিমা এবং জটিলতার সামনে, টলেমি এবং কেপলারের মতো, তিনিও ছিলেন, উৎফুল্ল, সমর্পিত ও নিরহঙ্কার। তিনি তার মৃত্যুর কিছু পূর্বে লিখলেন, 'আমি জানি না আমি পৃথিবীর কাছে কতটুকু, কিন্তু আমি আমার কাছে এক বালকের মতো, যে খেলা করছে সমুদ্রের বেলাভূমিতে, কখনো কখনো খুঁজে পাচ্ছে এক মসৃণতর নুড়ি বা সাধারণের চেয়ে সুন্দরতর কোনো ঝিনুকের খোলস, অথচ সত্যের মহাসাগরটি আমার সামনে অনাবিষ্কৃতই রয়ে গেল।'

চতুর্থ অধ্যায়
স্বর্গ এবং নরক

স্বর্গ এবং নরকের দরজাগুলো খুব কাছাকাছি এবং দেখতে একই রকম।
—নিকোস কাজানজাকিস, দ্য লাস্ট টেম্পটেশন অব ক্রাইস্ট্

পৃথিবী হল এক মনোরম, কম বা বেশি সৌম্য এক স্থান। বস্তুনিচয় পরিবর্তিত হয়, কিন্তু ধীরে ধীরে। আমরা সারাটা জীবন কাটিয়ে দিই এবং কখনোই মোকাবেলা করি না ঝড়ের চাইতে প্রলয়ংকরতর কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এবং তাই আমরা হয়ে পড়ি আত্মতুষ্ট, আয়েশী এবং ভাবনাহীন। কিন্তু প্রকৃতির ইতিহাসে রেকর্ডগুলো সুস্পষ্ট। গ্রহসমূহে সংঘটিত হয়েছে ধ্বংসযজ্ঞ। এমনকি আমরা মানুষেরা আমাদের নিজেদের বিপর্যয় ডেকে আনার জন্য অর্জন করেছি সন্দেহজনক প্রযুক্তিগত সাফল্য, ইচ্ছাকৃত এবং অসাবধানগত। অন্য গ্রহগুলোর ভূ-দৃশ্যে যেখানে অতীতের রেকর্ডসমূহ অপরিবর্তিত অবস্থায় আছে, সেখানে বড়ো রকমের দুর্যোগের প্রচুর সাক্ষ্য বর্তমান। এসব কিছুই সময়ের মাপ-দণ্ডের বিষয়। যে ঘটনাটি একশত বছরের মধ্যে অচিন্ত্যনীয়, সেটি একশত মিলিয়ন বছরের মধ্যে ছিল অনিবার্য। এমনকি পৃথিবীতে, এমনকি আমাদের নিজ শতাব্দীতে, অনেক উদ্ভট প্রাকৃতিক ঘটনা ঘটেছে।

১৯০৮ সালের ৩০ জুনের সকালের দিকে সাইবেরিয়াতে, আকাশে দ্রুত গতিতে ছুটে যেতে দেখা গেল একটি অগ্নিপিণ্ডকে। যেখানে এটি দিগন্তকে স্পর্শ করল, সেখানে সংঘটিত হল এক ভয়ংকর বিস্ফোরণ। এটি এর অগ্নিদাহ ছড়িয়ে ঘটনাস্থলের নিকটবর্তী প্রায় ২০০০ বর্গ কিলোমিটার বনাঞ্চল ও হাজার হাজার বৃক্ষ পুড়িয়ে ফেলল। এটি উৎপন্ন করল একটি বায়ুমণ্ডলীয় ঘাত-তরঙ্গ যা পৃথিবীকে দুবার চক্রবদ্ধ করল। এরপর দুদিন ধরে, বায়ুমণ্ডলে এত বেশি সূক্ষ্ম ধূলিকণা ছিল যে, ১০,০০০ কিলোমিটার দূরের লন্ডন শহরের রাস্তাঘাটে রাতের বেলায় বিচ্ছুরিত আলোতে যে কেউ পড়তে পারত খবরের কাগজ।

জারের অধীন রুশ সরকার এমন একটি ঘটনা পরীক্ষা করে দেখার প্রয়োজন বোধ করল না, যা সর্বোপরি, সংঘটিত হয়েছে বহুদূরে, সাইবেরিয়ার অনুন্নত টাংগাস জনগোষ্ঠীর মধ্যে। বিপ্লবের দশ বছর পর একদল অভিযাত্রী এল ভূমি

banglainternet.com

পরীক্ষা করতে এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষাৎকার নিতে। তারা যা উদ্‌ঘাটন করল তার কিছু নিম্নরূপ :

খুব ভোরে সবাই যখন একত্রে ঘুমিয়েছিল তাঁবুতে, এটি উড়ে এল বায়ুতে। যখন তারা বাইরে বিরিয়ে এল, পরিবারের সবার গায়ে কালশিরে পড়ে গেল, কিন্তু অ্যাকুলিনা ও আইভান প্রকৃতপক্ষে অজ্ঞান হয়ে পড়ল। যখন তারা জ্ঞান ফিরে পেল তারা প্রচণ্ড শোরগোল শুনতে পেল এবং তাদের চারদিকের বনগুলোকে জ্বলতে দেখল এবং এর বেশির ভাগ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

আমি সকালের নাস্তার সময়ে ভ্যানোভারার ব্যবসা কেন্দ্রে আমার বাড়ির ছাউনিতে বসেছিলাম এবং তাকিয়েছিলাম উত্তর দিকে। আমি সবেমাত্র পিপাটিকে ধাতব পাত দিয়ে বাঁধার জন্য কুড়ালটিকে উপরে তুলেছি, তখন হঠাৎ...আকাশটি দুভাগ হয়ে গেল, এবং বনের উপর দিয়ে আকাশের পুরো উত্তরাংশটুকু অগ্নি-আচ্ছাদিত বলে মনে হল। সেই মুহূর্তে আমি প্রচণ্ড তাপ অনুভব করলাম যেন আমার শার্টে আগুন ধরে গেছে...। আমি আমার শার্ট টেনে ছিঁড়ে ফেলতে এবং একে দূরে ছুঁড়ে মারতে চাইলাম কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে আকাশে বিস্ফোরণ ঘটল এবং ভয়ংকর শব্দ শোনা গেল। আমি ছাউনি হতে মাটিতে পড়ে গেলাম এবং কিছুক্ষণের জন্য আমি আমার জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম। আমার স্ত্রী দৌড়ে এল এবং আমাকে ঘরে নিয়ে গেল। বিস্ফোরণের পর পরই আকাশ হতে পাথর পতনের মতো বা গুলির শব্দের ন্যায় শব্দ শোনা গেল। পৃথিবী কেঁপে উঠল, এবং আমি যখন মাটিতে পড়ে ছিলাম তখন আমার মাথা ঢেকে রেখেছিলাম কারণ আমার ভয় ছিল যে পাথরগুলো হয়ত একে আঘাত করবে। সেই মুহূর্তে যখন আকাশ উন্মুক্ত হয়ে গেল, কামান থেকে যেমন বেরোয় তেমনি এক গরম বায়ু উত্তর দিক হতে এসে বয়ে গেল ঘরের ভিতর দিয়ে। এটি মাটির উপর এর চিহ্ন রেখে গেল...।

যখন আমি আমার লাঙলের পাশে বসলাম নাস্তা খাওয়ার জন্য, আমি শুনতে পেলাম হঠাৎ বিস্ফোরণের শব্দ, যেন গুলির শব্দ। আমার ঘোড়া লাফিয়ে উঠল। উত্তর দিকে বনের উপর দিক হতে একটি অগ্নিশিখা জ্বলে উঠল...। তখন আমি ফার বনটিকে বাতাসে আনত হয়ে যেতে দেখলাম এবং আমি একটি ঘূর্ণিঝড়ের আশঙ্কা করলাম। আমি দুহাতে লাঙলটিকে ধরে রাখলাম, যাতে এটিকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে না পারে। বাতাসের বেগ এত বেশি ছিল যে এটি ভূ-পৃষ্ঠ থেকে কিছু মাটি ছাড়িয়ে নিল, এবং তখন ঘূর্ণিঝড়টি আঙ্গারা হতে তাড়িয়ে নিয়ে এল জলরাশি। আমি এটি পরিষ্কারভাবেই দেখতে পেলাম, কারণ আমার জমিটি ছিল এক পাহাড়ের পাশে।

প্রচণ্ড শব্দে ঘোড়াগুলো এতটাই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল যে এদের কয়েকটি আতংকে চার পা এক সাথে তুলে ধেয়ে গেল, লাঙলগুলোকে টেনে নিল বিভিন্ন দিকে, এবং অন্যগুলো পড়ে গেল।

প্রথম ও দ্বিতীয় বিস্ফোরণের পর তুতারারা হতভম্ব হয়ে পড়ল, এবং যখন তৃতীয় বিস্ফোরণের শব্দটি হল, তারা দালান হতে পড়ে গেল পেছনের কাঠের সামগ্রীগুলোর

উপর। তাদের কেউ কেউ এতটাই অভিভূত এবং আতংকিত হয়ে পড়ল যে, আমাকে তাদেরকে শান্ত করতে এবং পুনঃনিশ্চয়তা দিতে হল। আমরা সকলে কাজ বন্ধ করে দিলাম এবং চলে গেলাম গ্রামে। সেখানে, স্থানীয় অধিবাসীদের সকলে আতংকে জড়ো হল সড়কে সড়কে, এবং আলাপ করছিল এই ঘটনা নিয়ে।

আমি ছিলাম মাঠে...এবং কেবলমাত্র একটি ঘোড়ার সাথে মই জুড়েছি এবং অন্য একটি যুক্ত করতে শুরু করেছি যখন আমি ডান দিকে একটি তীব্র গুলির শব্দের মতো কিছু শুনতে পেলাম। আমি তৎক্ষণাৎ ঘুরে গেলাম এবং একটি দীর্ঘ জ্বলন্ত বস্তুকে আকাশে উড়ে যেতে দেখলাম। পশ্চাৎ অংশের চাইতে সম্মুখ অংশটি ছিল অধিকতর প্রশস্ত এবং এর রং ছিল দিবালোকে আগুনের মতো। এটি সূর্যের চাইতে অনেক গুণ বড়ো ছিল কিন্তু অপেক্ষাকৃত অনুজ্জ্বল, তাই এর দিকে খালি চোখে তাকানো সম্ভব ছিল। পেছনে অগ্নিশিখাগুলো যে চিহ্ন-রেখা রেখে গেল তা ছিল ধূলির মতো। একে বেষ্টন করে ছিল সামান্য ধোঁয়া, এবং অগ্নিশিখাগুলো হতে পেছনে নির্গত হল নীল ফিতা সদৃশ প্রবাহ...। অগ্নিশিখাটি বিলীন হওয়ার পরপরই, গুলির চাইতেও তীব্রতর শব্দ শোনা গেল, কেঁপে উঠল ভূমি, এবং কেবিনের জানালার শার্সির কাচ ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল।

...আমি কান নদীর তীরে পশমি সুতা ধৌত করছিলাম। হঠাৎ কোনো ভয়ার্ত পাখির ডানার ঝাপটানোর মতো শব্দ শোনা গেল...এবং নদীর উপর একটি স্ফীতি সৃষ্টি হল। এরপর একটি বিস্ফোরণ ঘটল যার তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে, একজন কর্মী...পানিতে পড়ে গেল।

এই অসাধারণ ঘটনাটিকে বলা হয় 'টাংগাস্কা ঘটনা'। কিছু বিজ্ঞানী বলেন যে, এটি সংঘটিত হয়েছিল প্রচণ্ড বেগে ধাবিত এক টুকরা অ্যান্টিম্যাটার বা প্রতিবস্তু দ্বারা যা পৃথিবীর সাধারণ বস্তুর সংস্পর্শে এসে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে, বিলীন হয়ে গেছে গামা রশ্মি রূপে। কিন্তু ঘটনাস্থলে তেজস্ক্রিয়তার অনুপস্থিতি এই ব্যাখ্যাটিকে সমর্থন করে না। অন্য স্বতঃসিদ্ধ মতে, একটি ছোটো আকৃতির কৃষ্ণবিবর সাইবেরিয়াতে পৃথিবীকে ভেদ করে অন্যপার্শ্ব দিয়ে বেরিয়ে গেছে। কিন্তু বায়ুমণ্ডলীয় ঘাত-তরঙ্গের রেকর্ডসমূহ এমন কোনো ইঙ্গিত দেয় না যে, সেদিন পরে কোনো বস্তু উত্তর আটলান্টিক দিয়ে তীব্র শব্দ তুলে চলে গেছে। হয়ত এটি ছিল অকল্পনীয় অগ্রসর কোনো বহির্জাগতিক সভ্যতার চরম যান্ত্রিক গোলোযোগ আক্রান্ত কোনো নভোযান, যা কোনো অপরিচিত গ্রহের সুদূর স্থানে বিধ্বস্ত হয়। কিন্তু ঘটনাস্থলে এরূপ কোনো যানের লক্ষণ পাওয়া যায়নি। এই প্রতিটি ধারণা প্রস্তাব করা হয়েছে, এদের কিছু কিছু বেশ গুরুত্বের সাথে। কিন্তু প্রাপ্ত প্রমাণাদি এদের কোনোটিকেই সমর্থন করেনি। টাংগাস্কা ঘটনার মূল বিষয় হল যে, এটি ছিল একটি প্রচণ্ড বিস্ফোরণ, একটি প্রবল ঘাত-তরঙ্গ, এক ব্যাপক দাবানল, এবং তবুও ঘটনাস্থলে সৃষ্টি হল না কোনো গহ্বর। মনে হয় কেবল একটি ব্যাখ্যাই সকল সত্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ : ১৯০৮ সালে একটি ধূমকেতু আঘাত করেছিল পৃথিবীকে।

banglainternet.com

গ্রহগুলোর মধ্যবর্তী বিশাল শূন্যস্থানে রয়েছে অনেক বস্তু, কিছু শিলাময়, কিছু ধাতব, কিছু অতিশয় শীতল, কিছু অংশত জৈব অণু দ্বারা গঠিত। এদের আকৃতি ধূলিকণা হতে নিকারাগুয়া বা ভুটানের আকৃতির সমান হতে পারে। এবং কখনো কখনো, দুর্ঘটনাক্রমে, এদের গতিপথে এসে পড়ে কোনো গ্রহ। 'টাংগাস্কা ঘটনা' সম্ভবত একটি অতিশয় শীতল ধূমকেতুর খণ্ডাংশ যা চওড়ায় প্রায় একশত মিটার—একটি ফুটবল মাঠের আকৃতি—ওজনে প্রায় এক মিলিয়ন টন, প্রতি সেকেন্ডে ৩০ কিলোমিটার বেগে গতিশীল, ঘণ্টায় ৭০,০০০ মাইল।

আজকের দিনে যদি এমন কোনো ঘটনা ঘটত তবে হয়ত এটিকে ভুলভাবে নেয়া হত, মুহূর্তের আতংকে হয়ত ভাবা হত, কোনো পারমাণবিক বিস্ফোরণ। ধূমকেতুর আঘাত এবং অগ্নিপিণ্ড একটি এক মেগাটন নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণের সকল ফলাফলই প্রদর্শন করতে পারত, এমনকি মাশরুম মেঘ, কেবলমাত্র দুটি ব্যতিক্রম ব্যতীত : কোনো গামা বিকিরণ বা তেজস্ক্রিয় নির্গমন। একটি বিরল কিন্তু প্রাকৃতিক ঘটনা, একটি মোটামুটি আকৃতির ধূমকেতু-খণ্ডাংশ কি একটি পারমাণবিক যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেবে? এক অদ্ভুত দৃশ্যকল্প : একটি ক্ষুদ্র ধূমকেতু আঘাত করল পৃথিবীকে, যদিও এরকম রয়েছে মিলিয়ন সংখ্যক, এবং আমাদের সভ্যতার সাড়াটি হল অনতিবিলম্বে নিজেকে ধ্বংস করা। এটি আমাদের জন্য হতে পারে একটি চমৎকার ধারণা যদি আমরা যেমনটি করে থাকি তার চাইতে আরো কিছুটা ভালোভাবে অনুধাবন করতে পারি ধূমকেতু, সংঘর্ষ ও বিপর্যয়সমূহকে। উদাহরণ স্বরূপ, একটি আমেরিকান Vela উপগ্রহ ১৯৭৯ সালের ২২ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ আটলান্টিক এবং পশ্চিম ভারত মহাসাগরের সন্নিহিত অঞ্চল থেকে আগত আলোর একটি তীব্র ডাবল ফ্ল্যাশ শনাক্ত করে। প্রাথমিক অনুমান ছিল এই যে, এটি ছিল দক্ষিণ আফ্রিকা বা ইজরাইলের পারমাণবিক অস্ত্রের একটি কম মাত্রার (দুই কিলোটন, হিরোশিমা বোমার এক-ষষ্ঠমাংশ ক্ষমতা সম্পন্ন) গোপন পরীক্ষা। বিশ্বময় এর রাজনৈতিক ফলাফল বিবেচনা করা হল গুরুত্বের সাথে। কিন্তু কী হত যদি এটি এর পরিবর্তে ঘটে থাকত কোনো ক্ষুদ্র গ্রহানু বা কোনো ধূমকেতুর খণ্ডাংশের আঘাতের ফলে? যেহেতু বায়ুবাহিত উড়ন্ত বস্তুসমূহ আলোক ঝলকানিগুলোর আশেপাশের বায়ুতে অস্বাভাবিক তেজস্ক্রিয়তার কোনো চিহ্ন রেখে গেল না, এটি একটি প্রকৃত সম্ভাবনাই হতে পারে এবং পারমাণবিক অস্ত্রের যুগে শূন্য থেকে আমরা আঘাত স্থলকে যতটুকু পর্যবেক্ষণ করি তার চাইতে অধিক না করার বিপদকে সূচিত করে।

একটি ধূমকেতু মূলত গঠিত হয় বরফ দ্বারা—জলীয় (H_20) বরফ, সাথে থাকে সামান্য মিথেন (CH_4) বরফ এবং কিছুটা অ্যামোনিয়া (NH_3) বরফ। একটি মাঝারি ধূমকেতু-খণ্ডাংশ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে আঘাত করে উৎপন্ন করবে একটি অতি উজ্জ্বল অগ্নিপিণ্ড এবং একটি প্রবল বায়ু-তরঙ্গ, যা পুড়িয়ে ফেলবে গাছপালা, বনভূমি এবং সেই শব্দ শোনা যাবে পৃথিবীময়। কিন্তু একটি মাটিতে তেমন কোনো

গহ্বর সৃষ্টি নাও করতে পারে। প্রবেশের সময়েই সকল বরফ গলে যাবে। ধূমকেতুর অবশিষ্টাংশের কয়েকটি টুকরাই শনাক্তযোগ্য থাকবে—হয়ত ধূমকেতুর নিউক্লিয়াসের অ-বরফ অংশগুলো হতে ক্ষুদ্র কণাগুলোর অতি সামান্য কিছু। সম্প্রতি সোভিয়েত বিজ্ঞানী ই. সবোটোভিচ্ টাংগাস্কার ঘটনাস্থলটি জুড়ে ছড়িয়ে থাকা প্রচুর সংখ্যক হীরক-খণ্ড শনাক্ত করেছেন। এরই মধ্যে জানা গেছে যে, আঘাতের পর অবশিষ্ট উল্কাপিণ্ডে এরূপ হীরকের অস্তিত্ব থাকে, এবং সেগুলো হয়ত ধূমকেতু থেকেই জাত।

অনেক পরিষ্কার রাতে, যখন আপনি ধৈর্যের সাথে তাকাবেন আকাশের দিকে, আপনি দেখতে পাবেন যে, একটি নিঃসঙ্গ উল্কা অল্প সময়ের জন্য উপরে আলো ছড়িয়ে যাচ্ছে। প্রতি বছর কিছু বিশেষ রাতে আপনি দেখতে পাবেন উল্কাবৃষ্টি—একটি প্রাকৃতিক আতশবাজি প্রদর্শন, এক নভোমণ্ডলীয় বিনোদন। এই উল্কাসমূহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধূলিকণা দ্বারা গঠিত, যেগুলো সরিষা বীজের চাইতেও ছোটো। এরা সবেগে ছুটে আসা তারার চাইতে পড়ন্ত তুলোর সাথে বেশি সাদৃশ্য বহন করে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশের পর তারা ক্ষণিকের জন্য থাকে উজ্জ্বল, অতঃপর প্রায় ১০০ কিলোমিটার উপরে সংঘর্ষের ফলে এরা উত্তপ্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। উল্কাসমূহ হল ধূমকেতুগুলোর অবশিষ্টাংশ।* প্রাচীন ধূমকেতুসমূহ সূর্যের পাশ দিয়ে পুনঃ পুনঃ যাতায়াতের ফলে উত্তপ্ত, বাষ্পীভূত এবং খণ্ডিত হয়ে পড়ে। ধ্বংসাবশেষগুলো ছড়িয়ে পড়ে সম্পূর্ণ ধূমকেতু-কক্ষটি পূর্ণ করার জন্য। যেখানে সেই কক্ষপথটি পৃথিবীর কক্ষপথকে ছেদ করে, সেখানে আমরা দেখতে পাই এক ঝাঁক উল্কা। ঝাঁকটির কিছু অংশ সর্বদাই পৃথিবীর কক্ষপথের একই অবস্থানে থাকে, তাই উল্কা-বৃষ্টিটি সর্বদাই দৃষ্ট হয় প্রতি বছরের একই দিনে। ১৯০৮ সালের ৩০ জুন ছিল বিটা টৌরিড উল্কা পতনের দিন, যা 'কমেট এংকি'-এর কক্ষপথের সাথে সংশ্লিষ্ট। 'টাংগাস্কা ঘটনা'টির কারণ ছিল হয়ত 'কমেট এংকি'-র একটি পুরু খণ্ড, যে সকল ক্ষুদ্র কণিকা উজ্জ্বল ও নিরাপদ উল্কাবৃষ্টি ঘটায় তাদের চেয়ে যথেষ্ট বড়ো কোনো খণ্ড।

ধূমকেতুগুলো সর্বদাই জাগিয়ে তোলে ভয়, ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধা এবং কুসংস্কার। তাদের অনিয়মিত আবির্ভাবসমূহ বিরক্তিকরভাবে চ্যালেঞ্জ জানাল এক অপরিবর্তনীয় ও স্বর্গীয় শৃঙ্খলাময় 'বিশ্বব্রহ্মাণ্ড'-এর ধারণাকে। এটি অবোধগম্য

---

* উল্কা এবং উল্কাপিণ্ডসমূহ যে ধূমকেতুগুলোর সাথে সম্পর্কিত তা প্রথম প্রস্তাবিত হল আলেকজান্ডার ভন হামবোল্ট কর্তৃক, তার ব্যাপক-ভিত্তিক বিজ্ঞান-জনপ্রিয়করনের অংশ হিসেবে। এটি 'কসমস' (Kosmos) নামে প্রকাশিত হয় ১৮৪৫ হতে ১৮৬২ সাল পর্যন্ত। হামবোল্টের প্রথম দিককার লেখাগুলোই তরুণ চার্লস ডারউইনকে উস্কে দিল এমন এক জীবনযাত্রায় যেখানে সমন্বয় ঘটল ভৌগোলিক অভিযান এবং প্রাকৃতিক ইতিহাসের। এর অল্প কাল পরেই একজন প্রকৃতিবিদ হিসেবে বিদেশগামী জাহাজ, এইচ. এম. এস. বিগল-এ যোগদান করলেন, যে ঘটনাটি সূত্রপাত ঘটাল 'দ্য অরিজিন অব স্পিসিস'-এর।

banglainternet.com

রয়ে গেল যে, দুগ্ধ-ধবল অগ্নিশিখার একটি দৃষ্টিনন্দন চিহ্ন, তারাগুলোর সাথে উদিত হল এবং অস্ত গেল রাতের পর রাত ধরে, সেখানে কোনো কারণ পাওয়া গেল না, মানবীয় সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া গেল না। কাজেই এই ধারণাটি জেগে উঠল যে, ধূমকেতুসমূহ হল বিপর্যয়ের সূচক, স্বর্গীয় ক্রোধের পূর্বলক্ষণ—অর্থাৎ তারা ভবিষ্যদ্বাণী করত রাজকুমারদের মৃত্যুর, রাজত্বের পতনের। ব্যাবলনীয়রা ভেবেছিল যে, ধূমকেতুরা হল স্বর্গীয় শ্মশ্রু। গ্রিকরা ভেবেছিল বহমান চুল, আরবরা ভেবেছিল জ্বলন্ত তরবারি। টলেমির সময়ে ধূমকেতুসমূহকে বিস্তারিতভাবে শ্রেণীবিন্যস্ত করা হয়েছিল, যেমন, 'রশ্মি', 'ট্রাম্পেট', 'পাত্র' এবং আরো অনেক কিছু, এদের আকৃতি অনুযায়ী। টলেমি ভেবেছিলেন যে, ধূমকেতুসমূহ নিয়ে আসে যুদ্ধ, উত্তপ্ত আবহাওয়া এবং 'অস্বস্তিকর অবস্থা'। ধূমকেতু সংক্রান্ত কিছু মধ্যযুগীয় চিত্রমালা অশনাক্তকৃত উড়ন্ত ক্রুসিফিক্স্ (যিশুখ্রিষ্টের আকৃতি সংবলিত ক্রুশের মডেল)-এর সাথে সাদৃশ্য বহন করে। আন্দ্রিয়াস সেলিচিয়াস নামে একজন লুথারান 'সুপারিনটেন্ডেন্ট' বা ম্যাগডেবার্গের বিশপ ১৫৭৮ সালে প্রকাশ করলেন একটি 'থিওলজিক্যাল রিমাইন্ডার অব দ্য নিউ কমেট' যা এই উৎসাহী দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করল যে, 'ঈশ্বরের মুখের সামনে মানুষের পাপের ধোঁয়া, জেগে উঠছে প্রতিদিন, প্রতি ঘন্টায়, প্রতি মুহূর্তে, দুর্গন্ধ ও আতংকে পরিপূর্ণ হয়ে, এবং পেঁচানো ও বিণুনি করা চুলসহ ক্রমশ পুরু হয়ে গঠন করছে একটি ধূমকেতু, যা অবশেষে 'সর্বময় স্বর্গীয় বিচারক'-এর উত্তপ্ত ও অগ্নিময় ক্রোধ দ্বারা প্রজ্বলিত হয়ে উঠে।' কিন্তু অন্যরা এর বিরোধিতা করে বলল যে, যদি ধূমকেতুগুলো পাপের ধোঁয়াই হয়ে থাকবে, তবে আকাশ সর্বদাই এদের দ্বারা জ্বলন্ত হয়ে থাকত।

হ্যালি'র (বা অন্যকোনো) ধূমকেতু আবির্ভাবের সবচেয়ে প্রাচীন রেকর্ড পাওয়া যায় প্রিন্স হুয়াই নান-এর চীনা বইতে, যিনি ইনের ঝু-এর বিপক্ষে রাজা য়ু-এর অগ্রযাত্রায় একজন অনুচর ছিলেন। বছরটি ছিল ১০৫৭ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দ। জেরুজালেমে একটি পূর্ণ বছর ধরে একটি তরবারি ঝুলিয়ে রাখার ক্ষেত্রে জোসেফাসের কীর্তির সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হল ৬৬ সালে পৃথিবীর দিকে হ্যালির ধূমকেতুর এগিয়ে আসা। ১০৬৬ সালে নরম্যানগণ লক্ষ করল হ্যালি'র ধূমকেতুর আর একটি প্রত্যাবর্তন। সেকালের একটি খবরের কাগজ, 'Bayeux Tapestry'-তে ধূমকেতুর কথাটি যথাসময়ে উল্লেখিত হল। ১৩০১ সালে, আধুনিক বাস্তববাদী চিত্রকলার অন্যতম পুরোধা, গিয়োটো, হ্যালি ধূমকেতুর আরো একটি আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করেন এবং যিশুর জন্ম সংক্রান্ত একটি চিত্রকর্মে তা প্রকাশ করেন। ১৪৬৬-এর 'গ্রেট কমেট'—হ্যালি'র ধূমকেতুর আরো একটি প্রত্যাবর্তন আতংকিত করে তুলেছিল খ্রিষ্টীয় ইয়োরোপকে ; খ্রিষ্টানরা ভয় পেয়েছিল যে ঈশ্বর, যিনি পাঠান ধূমকেতুসমূহকে, হয়ত চলে গেছেন তুর্কিদের পক্ষে, যারা সবেমাত্র দখল করে নিয়েছিল কনস্টান্টিনোপল।

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর পুরোধা জ্যোতির্বিদগণ আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন ধূমকেতুর ব্যাপারে এবং এমনকি নিউটনও এদের ব্যাপারে লোভ সম্বরণ করতে পারেননি। কেপলার ধূমকেতুসমূহকে বর্ণনা করলেন শূন্যে সমুদ্রে মাছের মতো সম্মুখে দ্রুত বেগে ধাবমান রূপে, কিন্তু সূর্যালোক কর্তৃক অপচিত হয়, কারণ ধূমকেতুর পেছনের অংশটি সূর্য থেকে সর্বদাই দূরে সরে থাকে। ডেভিড হিউম, অনেক বিবেচনায় যিনি একজন আপসহীন যুক্তিবাদী, নিদেনপক্ষে এই ভাবনাটি নিয়ে ঠাট্টা করেন যে, ধূমকেতুসমূহ হল পুনঃ উৎপাদনযোগ্য কোষ—গ্রহ-ব্যবস্থার ডিম বা শুক্রাণু, অর্থাৎ গ্রহসমূহ উৎপাদিত হয় এক ধরনের আন্তঃনাক্ষত্রিক সেক্স দ্বারা। তার প্রতিফলক দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কারের পূর্বে, একজন আন্ডারগ্র্যাজুয়েট হিসেবে, নিউটন রাতের পর রাত নিদ্রাহীনভাবে কাটিয়েছেন খালি চোখে আকাশে ধূমকেতু দেখার জন্য, এদেরকে এমন ঐকান্তিকতার সাথে খুঁজলেন যে, তিনি চরম পরিশ্রান্তিতে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। টাইকো এবং কেপলারকে অনুসরণ করে নিউটন উপসংহার টানলেন যে, পৃথিবী থেকে দৃষ্ট ধূমকেতুগুলো আমাদের বায়ুমণ্ডলের মধ্যে চলাচল করে না, যেমনটি ভেবেছিলেন এরিস্টটল এবং অন্যরা। উপরন্তু এগুলো চাঁদের তুলনায় দূরতর, যদিও শনির তুলনায় নিকটতর। গ্রহগুলোর মতো ধূমকেতুগুলোও প্রতিফলিত সূর্যালোক দ্বারা আলোকিত হয়, 'এবং এগুলোকে অনেকেই স্থির তারার মতো সুদূর মনে করে ভুল করে ; যদি তা-ই হয়ে থাকত তবে, আমাদের গ্রহগুলো স্থির তারাগুলো থেকে যে পরিমাণ আলো গ্রহণ করে থাকে, ধূমকেতুসমূহ সূর্য থেকে এর চাইতে অধিক আলো গ্রহণ করতে পারত না।' তিনি দেখালেন যে, ধূমকেতুগুলো গ্রহসমূহের মতোই উপবৃত্তাকার কক্ষপথে আবর্তিত হয় : 'ধূমকেতুগুলো হল এক ধরনের গ্রহ যেগুলো সূর্যের চারদিকে অতি উৎকেন্দ্রিক কক্ষপথে আবর্তিত হয়।' এই রহস্য উন্মোচন, নিয়মিত ধূমকেতু-কক্ষপথের পূর্বাভাস,—১৭০৭ সালে তার বন্ধু এডমন্ড হ্যালিকে এটি হিসেব করতে সমর্থ করল যে, ১৫৩১, ১৬০৭ এবং ১৬৮২ সালের ধূমকেতুগুলো ছিল ৭৫ বছর ব্যবধানে একই ধূমকেতুর আবির্ভাব, এবং ধারণা করলেন যে, এর পুনরাবির্ভাব ঘটবে ১৭৫৮ সালে। ধূমকেতুটি সময়মতোই আবির্ভূত হল এবং এটির নামকরণ করা হল তার নামে তার মৃত্যুর পর। হ্যালি ধূমকেতু মানব-ইতিহাসে একটি অভিনব ভূমিকা পালন করেছে, এবং হয়ত ১৯৮৬ সালে এর পুনরাবির্ভাবের সময় ধূমকেতু অনুসন্ধানের জন্য প্রথম নভোযানের লক্ষ্যবস্তু হবে এটিই।

আধুনিক গ্রহ-বিজ্ঞানীরা কখনো কখনো মতামত দেন যে, কোনো গ্রহের সাথে কোনো ধূমকেতুর সংঘর্ষ গ্রহটির বায়ুমণ্ডলে তাৎপর্যময় ভূমিকা রাখতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, মঙ্গল গ্রহের বায়ুমণ্ডলের সকল পানির ব্যাখ্যা দেয়া যেতে পারে একটি ক্ষুদ্রাকায় ধূমকেতুর সাম্প্রতিক আঘাত দ্বারা। নিউটন লক্ষ করেন যে, ধূমকেতুগুলোর পশ্চাদভাগের পদার্থ আন্তঃগ্রহ স্থানে অপচিত হয়ে যায়, ধূমকেতু

banglainternet.com

থেকে হারিয়ে যায় এবং ধীরে ধীরে মহাকর্ষের মাধ্যমে নিকটবর্তী গ্রহগুলোর দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, পৃথিবীর পানি ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে, 'শোষিত হয়ে যায় উদ্ভিদ জগৎ এবং পচনের পেছনে এবং পৃথিবী হয়ে যাচ্ছে বিশুষ্ক... । প্রবাহী তরল যদি সরবরাহ ছাড়া কেবল ব্যবহৃত হতেই থাকে, তবে তা ক্রমশ কমে যেতে বাধ্য এবং অবশেষে একেবারেই নিঃশেষিত হয়ে যাবে।' নিউটন হয়ত বিশ্বাস করতেন যে, পৃথিবীর মহাসাগরগুলো ধূমকেতু থেকে জাত, এবং আমাদের গ্রহের উপর ধূমকেতু পদার্থ পতিত হয় বলেই প্রাণের অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি হয়। এক অতীন্দ্রিয় স্বপ্ন-কল্পনার মাঝে তিনি আরো এগিয়ে গেলেন : 'আমি আরো ধারণা করি যে, মূলত ধূমকেতুসমূহ থেকে আসে আত্মাগুলো, যা প্রকৃতপক্ষে আমাদের বায়ুমণ্ডলের ক্ষুদ্রতম কিন্তু সবচেয়ে নিগূঢ় এবং প্রয়োজনীয়, এবং আমাদের সাথে সকল প্রাণীকে রক্ষা করার জন্য যা অত্যাবশ্যক।'

১৮৬৮ সালে জ্যোতির্বিদ উইলিয়াম হুগিন্স একটি ধূমকেতুর বর্ণালির কিছু বৈশিষ্ট্য এবং প্রাকৃতিক বা 'Olefiant gas'-এর বর্ণালির মাঝে সাদৃশ্য খুঁজে পেলেন। পরবর্তী বছরেই হুগিন্স ধূমকেতুসমূহে জৈব পদার্থের সন্ধান পেলেন, ধূমকেতুগুলোর পশ্চাদ্‌ভাগে শনাক্ত করলেন সায়ানোজেন, CN যা একটি কার্বন ও একটি নাইট্রোজেন পরমাণু দ্বারা গঠিত, সেই আণবিক ক্ষুদ্রাংশ যা সৃষ্টি করে সায়ানাইড। ১৯১০ সালে পৃথিবী যখন হ্যালি'র ধূমকেতুর পশ্চাদ্‌ভাগের ভিতর দিয়ে প্রায় চলে যাওয়ার উপক্রম করছিল, অনেক মানুষ আতংকিত হয়ে পড়েছিল। তারা খেয়াল করল না এই সত্যটি যে, কোন ধূমকেতুর পশ্চাদ্‌ভাগটি চরমভাবে বিস্তৃত : একটি ধূমকেতুর পশ্চাদ্‌ভাগের বিষ থেকে উদ্ভুত বিপদ, এমনকি ১৯১০ সালে বৃহৎ শহরগুলোর শিল্পায়ন জনিত দূষণ অপেক্ষা কম ঝুঁকিপূর্ণ।

কিন্তু তা কাউকে আশ্বস্ত করল না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ১৯১০ সালের ১৬ মে San Fransisco Cronicle-এর শিরোনামের মধ্যে ছিল, 'Comet Camera as Big as a House', 'Comet Comes and Husband Reforms', 'Comet Parties Now Fad in New York।' 'লস এঞ্জেলেস এক্সামিনার' গ্রহণ করল অপেক্ষাকৃত হালকা ভাষ্য : 'Say ! Has That Comet Cyanogened You Yet ?... Entire Human Race Due for Free Gaseous Bath', 'Expect 'High Jinks' ', ' 'Many Feel Cyanogen Tang', 'Victim Climbs Trees, Tries to Phone Comet'. ১৯১০ সালে সায়ানোজেন দূষণ থেকে পৃথিবী মুক্তি পাওয়ার পূর্বে আনন্দ-উৎসব হল। উদ্যোক্তারা ফেরি করল ধূমকেতু প্রতিরোধক পিল এবং গ্যাস-মুখোশ, দ্বিতীয়টি ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের যুদ্ধক্ষেত্রের আতংকজনক হুঁশিয়ারি।

ধূমকেতু সম্বন্ধে কিছু সন্দেহ চলে এসেছে আমাদের কাল পর্যন্ত। ১৯৫৭ সালে, 'University of Chicago's Yerkes Observatory'-তে আমি ছিলাম একজন গ্র্যাজুয়েট ছাত্র। মানমন্দিরে একাকী এক রাতের শেষাংশে, আমি পুনঃ পুনঃ শুনতে

পেলাম টেলিফোনের রিং। যখন আমি উত্তর দিলাম, একটি কণ্ঠস্বর এর মদোন্মত্ততার অবস্থা উপেক্ষা করে বলল, 'লেমি, আপনি কথা বলছেন একজন জ্যোতির্বিদের সাথে।' 'আমি কি আপনাকে সাহায্য করতে পারি ?' 'ভাল কথা, আমরা উইলমিটিতে একটি গার্ডেন-পার্টি আয়োজন করেছি এবং আকাশে বিশেষ কিছু একটা দেখা যাচ্ছে। মজার ব্যাপার হল, যদি আপনি সোজা এর দিকে তাকান তবে এটি দূরে সরে যায়। কিন্তু যদি আপনি এর দিকে না তাকান তবে এটি এর অবস্থাতেই থাকে।' রেটিনার সবচেয়ে সংবেদী অংশটুকু দৃষ্টি ক্ষেত্রের কেন্দ্রে অবস্থিত নয়। আপনি আপনার দৃষ্টিকে সামান্য ব্যাহত করে দেখতে পারেন অনুজ্জ্বল নক্ষত্রগুলোকে। আমি জানতাম যে, এ সময়ে আকাশে ছিল খালি চোখে দর্শনযোগ্য একটি নব আবিষ্কৃত ধূমকেতু অ্যারেন্ড-রোলান্ড। তাই আমি তাকে বললাম যে, তিনি হয়ত কোনো ধূমকেতু দেখছিলেন। এরপর দীর্ঘ নীরবতা, এরপর ভেসে এল একটি প্রশ্ন : 'ধূমকেতু কী ?' আমি উত্তর দিলাম, 'ধূমকেতু হল এক মাইল চওড়া একটি তুষার-বল।' এরপর আরো দীর্ঘ এক বিরতি, যারপর অপর প্রান্ত থেকে এল একটি অনুরোধ, 'লেমি, আলাপ করুন কোনো প্রকৃত জ্যোতির্বিদের সাথে।' ১৯৮৬ সালে হ্যালি'র ধূমকেতুর পুনরাবির্ভাব ঘটবে, আমি ভেবে বিস্মিত হই কোন রাজনৈতিক নেতারা এটিকে ভয় পাবেন, কী হেয়ালিপনা চাপিয়ে দেয়া হবে আমাদের উপর।

যখন গ্রহগুলো উপবৃত্তাকার কক্ষপথে সূর্যের চারদিকে আবর্তিত হয় তখন কক্ষপথগুলো খুব বেশি উপবৃত্তাকার থাকে না। প্রথম দর্শনে, মোটামুটিভাবে বৃত্ত থেকে আলাদা করা যায় না। ধূমকেতুগুলোর—বিশেষত দীর্ঘ-পর্যায়কালবিশিষ্ট ধূমকেতুগুলোর রয়েছে সুস্পষ্টভাবে উপবৃত্তাকার কক্ষপথ। অন্তঃস্থ সৌর জগতে গ্রহগুলো হল পুরনোকালের, ধূমকেতুগুলো নবাগত। গ্রহগুলোর কক্ষপথসমূহ কেন প্রায় বৃত্তাকার এবং পরস্পরের নিকট থেকে পরিষ্কারভাবেই আলাদা ? এই কারণে যে, গ্রহগুলোর যদি খুব উপবৃত্তাকার কক্ষপথ থাকত তবে তাদের গতিপথসমূহ পরস্পরকে ছেদ করত, আজ হোক, কাল হোক, একটি সংঘর্ষ ঘটতই। সৌর জগতের আদি ইতিহাসে সম্ভবত অনেক গ্রহ গঠিত হওয়ার প্রক্রিয়াধীন ছিল। যেগুলোর ছিল পরস্পরকে ছেদকারী কক্ষপথ সেগুলো সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার এবং নিজেদেরকে ধ্বংস করার প্রবণতা দেখাল। যেগুলোর ছিল বৃত্তাকার কক্ষপথ সেগুলো বিকশিত হল এবং টিকে গেল। বর্তমান গ্রহগুলোর কক্ষপথসমূহ হল এই সব সংঘর্ষময় প্রাকৃতিক নির্বাচনে টিকে থাকা গ্রহগুলোর কক্ষপথসমূহ, সৌরজগতের স্থিতিশীল মধ্যযুগটিতে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল আদি বিপর্যয়ের ঘটনাসমূহ।

সৌরজগতের সর্ববহিঃস্থ অংশে, গ্রহগুলো থেকে বহু দূরের আধো-আঁধারে, রয়েছে এক ট্রিলিয়ন ধূমকেতু-কেন্দ্রিকার এক বিশাল গোলীয় মেঘ, যা ইন্ডিয়ানাপলিস

banglainternet.com

৫০০*-এর কোনো রেসিং কারের চাইতে খুব বেশি দ্রুত সূর্যের চারদিকে পরিক্রমণ করছে না। একটি মাঝারি আকৃতির ধূমকেতু দেখতে হবে এক কিলোমিটার চওড়া একটি বিশাল আকৃতির পড়ন্ত তুষার-বলের মতো। বেশির ভাগই প্লুটো কর্তৃক চিহ্নিত সীমারেখাকে কখনোই ভেদ করে না। কিন্তু মাঝে মাঝে কোনো অতিক্রমকারী নক্ষত্র ধূমকেতু-মেঘে সৃষ্টি করে মহাকর্ষীয় আকস্মিক বেগ এবং আন্দোলন এবং ধূমকেতুর একটি দল নিজেদেরকে আবিষ্কার করে এক উপবৃত্তাকার কক্ষপথে, সূর্যের দিকে অগ্রসরমান রূপে। বৃহস্পতি এবং শনির সাথে মহাকর্ষীয় ক্রিয়ায় এর গতিপথ আরো পরিবর্তিত হওয়ার পর, প্রতি এক শতাব্দী বা এর কাছাকাছি সময় ব্যবধানে এটি নিজেকে আবিষ্কার করে সৌর জগতের অন্তঃস্থ অংশের দিকে ধাবমান রূপে। বৃহস্পতি এবং মঙ্গলের কক্ষপথের মাঝামাঝি স্থানে এটি উত্তপ্ত ও বাষ্পীভূত হতে শুরু করে। সৌর বায়ুমণ্ডল থেকে বাইরের দিকে বাহিত হতে থাকে পদার্থসমূহ, সৌর বায়ুপ্রবাহ ধুলোবালি ও বরফের কণাসমূহকে বয়ে নিয়ে যায় ধূমকেতুর পেছনে, সৃষ্টি করে একটি প্রাথমিক লেজ। যদি বৃহস্পতি গ্রহটি এক মিটার প্রশস্ত হত, তবে আমাদের ধূমকেতু হত ধূলিকণা হতেও ক্ষুদ্র-তর, কিন্তু যখন এটি পরিপূর্ণ রূপ লাভ করে, তখন এর লেজটি হয় গ্রহদের মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান বড়ো। যখন এটি এর কক্ষপথে পৃথিবী হতে দৃষ্টিগোচর হয়, তখন এটি পৃথিবীবাসীদের মাঝে উদ্দীপ্ত করে কুসংস্কারাচ্ছন্ন উত্তেজনার প্রবাহ। তবে শেষপর্যন্ত তারা বুঝতে পারে যে, এটি তাদের বায়ুমণ্ডলে বাস করে না, বরং অন্য গ্রহদের মাঝে কোথাও। তারা এর কক্ষপথটি হিসেব করতে পারে। এবং হয়ত শীঘ্রই কোনো একদিন নক্ষত্র রাজ্য হতে আগত এই আগন্তুককে জয় করার জন্য তারা পাঠাবে কোনো ক্ষুদ্র মহাকাশ যান।

আগে বা পরে যখনই হোক, ধূমকেতুগুলো গ্রহদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। পৃথিবী এবং এর সহচর চাঁদের উপর আঘাত হানবে ধূমকেতু, ক্ষুদ্র গ্রহাণু এবং সৌর

* সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব, r = ১ অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিট = ১৫০,০০০,০০০ কিলোমিটার। এর প্রায় বৃত্তীয় কক্ষপথটির পরিধি, $2\pi r = 10^9$ কিলোমিটার। আমাদের গ্রহটি এই পথে বছরে একবার পূর্ণ আবর্তন সম্পন্ন করে। এক বছর = $\pi \times 10^7$ সেকেন্ড। কাজেই পৃথিবীর বৃত্তীয় গতি = (10^9 কিলোমিটার)/ ($\pi \times 10^7$ সেকেন্ড) ≈ ৩০ কিলোমিটার/ সেকেন্ড। এখন বিবেচনা করুন, প্রদক্ষিণরত ধূমকেতুসমূহের গোলকীয় শেলগুলোকে, অনেক জ্যোতির্বিদ যেগুলোকে সৌরমণ্ডল থেকে প্রায় ১০০,০০০ অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিট দূরে পরিভ্রমণরত বলে বিশ্বাস করেন, যা নিকটতম নক্ষত্রের দূরত্বের প্রায় অর্ধেকের সমান। কেপলারের তৃতীয় সূত্র হতে পাওয়া যায় যে, এদের যে কোনো একটির সূর্যের চারদিকে আবর্তনকাল প্রায় $(10^5)^{3/2} = 10^{7.5} = \pi \times 10^7$ বা ৩০ মিলিয়ন বছর। যদি আপনি বাস করেন সৌর জগতের বহির্সীমার দিকে তবে সূর্যের চারদিকে একবার আবর্তনের সময়টি হবে দীর্ঘ। ধূমকেতুর কক্ষপথ প্রায় $2\pi a = 2\pi \times 10^5 \times 1.5 \times 10^8$ কিলোমিটার ≈ 10^{14} কিলোমিটার দূরে, এবং তাই এর দ্রুতি কেবল 10^{14} কিলোমিটার / 10^{15} সেকেন্ড = ০.১ কিলোমিটার/ সেকেন্ড ≈ ২২০ মাইল/ ঘণ্টা।

জগতের গঠন হতে পতিত ধ্বংসাবশেষগুলো। বৃহৎ বস্তুর চেয়ে ক্ষুদ্র বস্তুর সংখ্যা বেশি, তাই বৃহৎ বস্তু অপেক্ষা ক্ষুদ্র বস্তুর আঘাতের সংখ্যাও বেশি। টাংগাস্কায় যা ঘটেছিল, তেমনি ক্ষুদ্র কোনো ধূমকেতু-খণ্ডের পৃথিবীতে আঘাত করার সম্ভাবনা, প্রতি এক হাজার বছরে একবার। হ্যালি'র ধূমকেতুর মতো বৃহৎ কোনো ধূমকেতুর সাথে সংঘর্ষের সম্ভাবনা প্রতি এক বিলিয়ন বছরে মাত্র একবার, যার কেন্দ্রিকা সম্ভবত বিশ কিলোমিটার চওড়া।

যখন কোনো ক্ষুদ্র, বরফময় বস্তু কোনো গ্রহ বা উপগ্রহের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, এটি হয়ত তেমন বড়ো কোনো ক্ষত সৃষ্টি করে না। কিন্তু আঘাতকারী বস্তুটি যদি অপেক্ষাকৃত বড়ো হয় বা মূলত শিলাখণ্ড দ্বারা গঠিত হয়, তখন সংঘর্ষ স্থলে একটি বিস্ফোরণ সংঘটিত হয় যা সৃষ্টি করে একটি অর্ধগোলকীয় গর্ত, যাকে বলা হয় সংঘর্ষজনিত গহ্বর। এবং কোনো প্রক্রিয়া যদি গহ্বরগুলোকে ঘষে দূর না করে বা কোনো কিছু দ্বারা পূর্ণ না করে, তবে এটি বিলিয়ন বিলিয়ন বছর ধরে টিকে থাকতে পারে। চাঁদে প্রায় কোনো ক্ষয়ই সংঘটিত হয় না এবং যখন আমরা এর পৃষ্ঠদেশ পরীক্ষা করি, আমরা একে সংঘর্ষ-গহ্বরে আচ্ছাদিত রূপে দেখতে পাই, অপেক্ষাকৃত বিরল ধূমকেতু ও গ্রহাণুর ধ্বংসাবশেষের কারণে সৃষ্ট গহ্বর-সংখ্যার চাইতে যা অনেক বেশি, যেগুলো এখন অন্তঃস্থ সৌরজগতকে পূর্ণ করে রাখে। চন্দ্রপৃষ্ঠ সুনিশ্চিত সাক্ষ্য দেয় পূর্বের কোনো এক কালে গ্রহসমূহের ধ্বংস-বৃত্তান্তের, যা ঘটেছিল আজ থেকে বিলিয়ন বিলিয়ন বছর পূর্বে।

সংঘর্ষ-গহ্বরসমূহ কেবল চাঁদেই সীমাবদ্ধ নয়। আমরা এদের সন্ধান পাই অন্তঃস্থ সৌর জগতের সর্বত্র—সূর্যের নিকটতম গ্রহ বুধ হতে মেঘাচ্ছাদিত শুক্র পর্যন্ত, মঙ্গল ও এর ক্ষুদ্র উপগ্রহদ্বয় ফোবোস ও ডিমোস পর্যন্ত। এগুলো হল পার্থিব গ্রহ, আমাদের গ্রহ-পরিবার, যার গ্রহসমূহ কম বা বেশি পৃথিবীর মতোই। এদের রয়েছে কঠিন পৃষ্ঠদেশ, অভ্যন্তরভাগ শিলা ও লোহায় তৈরি, এবং বায়ুমণ্ডলের চাপ প্রায় শূন্য থেকে পৃথিবীর তুলনায় নব্বই গুণ পর্যন্ত বিস্তৃত। এরা ছড়িয়ে আছে আলো এবং তাপের উৎস সূর্যের চারদিকে, অনেকটা আগুনের চারপাশে সাজানো তাঁবুর মতো। গ্রহগুলোর বয়স প্রায় ৪.৬ বিলিয়ন বছর। চাঁদের মতো, এরা সকলেই সৌরজগতের আদি ইতিহাসের সংঘর্ষ-বিপর্যয়ের কালের সাক্ষ্য বহন করে।

মঙ্গল অতিক্রম করার পর আমরা প্রবেশ করি সম্পূর্ণ ভিন্নতর এক ব্যবস্থায়—বৃহস্পতি এবং অন্যান্য বৃহৎ বা দেবরাজের গ্রহসমূহে। এগুলো হল বিশাল গ্রহ, মূলত হাইড্রোজেন এবং হিলিয়াম দ্বারা গঠিত, সাথে রয়েছে মিথেন, অ্যামোনিয়া এবং জলীয় বাষ্পের মতো কিছু হাইড্রোজেন-সমৃদ্ধ গ্যাস। এখানে নেই কোনো কঠিন পৃষ্ঠদেশ, আছে কেবল বায়ুমণ্ডল এবং বিচিত্র বর্ণের মেঘ। এগুলো বৃহৎ আকৃতির গ্রহ, পৃথিবীর মতো কোনো ক্ষুদ্র গ্রহ নয়। বৃহস্পতির ভিতর রাখা যাবে

banglainternet.com

এক হাজারটি পৃথিবী। যদি কোনো ধূমকেতু বা গ্রহাণু বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডলে পতিত হয়, তবে আমরা দৃশ্যমান গহ্বর আশা করতে পারি না, মেঘের মাঝে শুধু দেখব এক ক্ষণস্থায়ী ভাঙন। তবুও, আমরা জানি যে, বহিঃস্থ সৌরজগতেরও রয়েছে সংঘর্ষের অনেক বিলিয়ন বছরের ইতিহাস—কারণ বৃহস্পতির রয়েছে এক ডজনেরও অধিক সংখ্যক উপগ্রহের এক বিশাল ব্যবস্থা, যাদের পাঁচটিকে মহাকাশযান ভয়েজার খুব কাছ থেকে পরীক্ষা করেছে। এখানেও আমরা খুঁজে পাই অতীত বিপর্যয়ের সাক্ষ্য। যখন সৌর জগতের পুরোটাতে অনুসন্ধান শেষ হবে, তখন হয়ত আমরা সংঘর্ষ-বিপর্যয়ের সাক্ষ্য পেয়ে যাব নয়টি গ্রহতেই, বুধ থেকে শুক্র পর্যন্ত, এবং সকল ক্ষুদ্র উপগ্রহ, ধূমকেতু এবং গ্রহাণুর মাঝে।

পৃথিবী থেকে দূরবীক্ষণ যন্ত্রে দৃশ্যমান চাঁদের নিকট-অংশটিতে রয়েছে প্রায় ১০,০০০টি গহ্বর। এদের বেশির ভাগই হল চাঁদের প্রাচীন পার্বত্য এলাকায় এবং যাদের সৃষ্টিকালটি চাঁদের চূড়ান্ত অবয়ব প্রাপ্তি হতে আন্তগ্রহ ধ্বংসাবশেষ পর্যন্ত ব্যাপ্ত। 'মারিয়া' (যা 'সমুদ্র'-এর ল্যাটিন রূপ)-তে রয়েছে এক কিলোমিটারেরও অধিক চাওড়া প্রায় এক হাজার গহ্বর। এই নিচু অঞ্চলটি, হয়ত লাভা দ্বারা প্লাবিত হয়েছিল চাঁদ গঠিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই, যা পূর্ব থেকে অস্তিমান গর্তগুলোকে ছেয়ে থাকে। তাই, এখন চাঁদে গহ্বর উৎপন্ন হওয়ার হার মোটামুটিভাবে প্রায় ১০^{৯} বছর/১০^{৪} গহ্বর, = ১০^{৫} বছর/গহ্বর, অর্থাৎ দুটি গহ্বর সৃষ্টির মধ্যবর্তী সময় ব্যবধান ১০,০০০ বছর। যেহেতু আজকের তুলনায় কয়েক বিলিয়ন বছর পূর্বে অধিক সংখ্যক আন্তগ্রহ ধ্বংসাবশেষ ছিল, তাই চাঁদে নতুন একটি গহ্বরের সৃষ্টি দেখতে হলে আমাদেরকে হয়ত অপেক্ষা করতে হবে দশ হাজার বছরেরও অধিক সময় ধরে। চাঁদ অপেক্ষা পৃথিবী পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল বেশি বলে আমাদের গ্রহে এক কিলোমিটার চওড়া কোনো গহ্বর সৃষ্টি করার মতো কোনো সংঘর্ষের জন্য অপেক্ষা করতে হবে দশ হাজার বছরের মতো। অ্যারিজোনার এক কিলোমিটার চওড়া 'মিটিওর ক্র্যাটার' সংঘর্ষ-গহ্বরটি বিশ বা ত্রিশ হাজার বছরের পুরনো বলে বিবেচনা করা হয়, পৃথিবী থেকে পর্যবেক্ষণসমূহ এরূপ স্থূল হিসেবের সাথে একমত পোষণ করে।

চাঁদের সাথে কোনো ক্ষুদ্র ধূমকেতু বা গ্রহাণুর প্রকৃত সংঘর্ষকালে ঘটতে পারে ক্ষণস্থায়ী বিস্ফোরণ যা পৃথিবী থেকে দৃষ্টিগোচর হওয়ার জন্য যথেষ্ট উজ্জ্বল। আমরা কল্পনা করতে পারি দশ হাজার বছর পূর্বে আমাদের পূর্বসূরিরা কোনো এক রাতে অলসভাবে তাকিয়ে ছিল আকাশ পানে এবং লক্ষ করছিল যে, চাঁদের অনালোকিত অংশ হতে জেগে উঠছিল অদ্ভুত মেঘ। কিন্তু আমাদের আশা করা উচিত নয় যে, এমন একটি ঘটনা ঘটে থাকবে ঐতিহাসিক কালে। এর সম্ভাব্যতা একশত ভাগের একভাগ। এতদ্‌সত্ত্বেও রয়েছে একটি ঐতিহাসিক তথ্য যা প্রকৃতপক্ষে পৃথিবী হতে খালি চোখে চাঁদের কোনো সংঘর্ষকে বর্ণনা করে : ১৭৭৮ সালের ২৫ জুনে পাঁচজন

ব্রিটিশ সন্ন্যাসী একটি অসামান্য বিষয় উল্লেখ করেন, যা পরবর্তীতে ক্যান্টারব্যুরির গের্ভেজের কালানুক্রমিক ঘটনাপঞ্জিতে নথিভুক্ত হয়, যাকে সাধারণত তাঁর সময়ের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ঘটনাবলির একজন বিশ্বস্ত প্রতিবেদক বলে বিবেচনা করা হয়। তিনি এসব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ঘটনার সত্যতার ব্যাপারে শপথ বাক্য পাঠ করিয়ে প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষাৎকার নিতেন। কালক্রমিক ঘটনাপঞ্জিটি বর্ণনা করে :

> তখন ছিল এক উজ্জ্বল চাঁদ, এবং সেই অবস্থায় চন্দ্রশিখাগুলো হেলে ছিল পূর্ব দিকে। হঠাৎ উপরের শিখাটি দুভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। বিভাজনের মধ্যবিন্দু হতে, একটি উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা উৎসারিত হল, উদ্‌গত হল অগ্নি, উত্তপ্ত কয়লা, এবং স্ফুলিঙ্গ।

জ্যোতির্বিদ ডেরেল মুলহল্যান্ড এবং ওডাইল ক্যালেম হিসেব করেছেন যে, একটি চান্দ্র-অভিঘাত বা চান্দ্র-সংঘর্ষ উৎপন্ন করে ধুলো-মেঘ, যা চন্দ্র-পৃষ্ঠ হতে উত্থিত হয় এবং ক্যান্টারব্যুরি সন্ন্যাসীদের বর্ণনার সাথে এদের যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে।

যদি এমন একটি গহ্বর সৃষ্টি হত ৮০০ বছর পূর্বে, তবে গহ্বরটি এখনো দৃশ্যমান থাকত। বায়ু এবং পানির অনুপস্থিতিতে চাঁদে ক্ষয়ের প্রক্রিয়া এত ধীর যে, এমনকি কয়েক বিলিয়ন বছরের পুরনো গহ্বরগুলো এখনো তুলনামূলকভাবে সুরক্ষিত। গের্ভেজ কর্তৃক নথিভুক্ত বর্ণনা হতে, চাঁদের পর্যবেক্ষণস্থলসমূহকে চিহ্নিত করা সম্ভব। সংঘর্ষগুলো সৃষ্টি করে বিভিন্ন রশ্মি, বিস্ফোরণকালে নির্গত হয় সূক্ষ্ম ধুলোর রেখাসদৃশ লেজ। এরূপ রশ্মিগুলো চাঁদের নবীনতম গহ্বরসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট—উদাহরণস্বরূপ, অ্যারিস্টার্কাস, কোপার্নিকাস ও কেপলারের নামানুসারে নামকরণ করা গহ্বরগুলো। চাঁদের গহ্বরগুলো ক্ষয় সহ্য করতে পারলেও, রশ্মিসমূহ খুবই সরু হওয়ার ফলে তা পারে না। কিন্তু কালের সাথে সাথে, এমনকি পতিত উল্কার আঘাতে—শূন্যে জেগে উঠে সূক্ষ্ম ধূলিকণা—রশ্মিগুলোকে আলোড়িত এবং আচ্ছাদিত করে ফেলে এবং ক্রমশ এরা বিলীন হয়ে যায়। কাজেই রশ্মিগুলো হল একটি সাম্প্রতিক অভিঘাতের সাক্ষ্য।

উল্কা-বিজ্ঞানী জ্যাক হ্যারটাং উল্লেখ করেছেন যে, যথেষ্ট রশ্মি ব্যবস্থাসহ একটি অতি সাম্প্রতিক ও নবীন গহ্বর অবস্থান করে ক্যান্টারব্যুরি সন্ন্যাসিগণ কর্তৃক নির্দেশিত চাঁদের বিশেষ স্থানটিতেই। ষোড়শ শতাব্দীর রোমান ক্যাথলিক মনীষীর নামানুসারে একে বলা হয় 'জিয়োর্দানো ব্রুনো', যিনি বিশ্বাস করতেন যে, গ্রহগুলো সংখ্যায় অসীম এবং এদের অনেকগুলো বসতিময়। এটিসহ আরো কিছু অপরাধের কারণে তাকে ১৬০০ সালে পুড়িয়ে মারা হয়।

এই ব্যাখ্যার সাথে সাযুজ্যপূর্ণ আরো একটি সাক্ষ্য-রেখা বর্ণনা করেছেন ক্যালেম এবং মুলহল্যান্ড। যখন কোনো বস্তু চাঁদকে আঘাত করে দ্রুত বেগে, তখন এটি চাঁদে সামান্য কম্পন সৃষ্টি করে। শেষপর্যন্ত কম্পনটি থেমে যায়, কিন্তু তা আট শত বছরের চাইতে কম সময়ে নয়। লেজার প্রতিফলন পদ্ধতিতে এমন একটি

banglainternet.com

কম্পন অনুধাবন করা সম্ভব। অ্যাপোলো নভোচারীরা চাঁদের এরূপ কিছু ঘটনাস্থলে লেজার প্রতিফলক যন্ত্র নামক কিছু প্রতিফলক স্থাপন করেন। যখন পৃথিবী হতে আগত কোনো লেজার রশ্মি প্রতিফলকটিকে আঘাত করে এবং ফিরে আসে, যাওয়া-আসার সময়টুকু পরিমাপ করা যায় যথেষ্ট সূক্ষ্মভাবে। এই সময়কে আলোর বেগ দ্বারা গুণ করে আমরা সমান সূক্ষ্মভাবে নির্ণয় করতে পারি পৃথিবী হতে চাঁদের দূরত্ব। বছরের পর বছর ধরে এরূপ পরিমাপসমূহ উন্মোচিত করে যে, চাঁদ একটি নির্দিষ্ট পর্যায়কাল (প্রায় তিন বছর) এবং বিস্তার (প্রায় তিন মিটার) সহ ঘূর্ণনশীল বা কম্পনশীল, সেই ধারণাটির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ যে 'জিয়োর্দানো ব্রুনো' গহ্বরটি বেরিয়ে এসেছিল এক হাজার বছরেরও কম সময় পূর্বে।

এই সাক্ষ্যগুলোর সবকটিই অনুমানসিদ্ধ এবং পরোক্ষ। আমি যেমনটি বলেছি যে, এমন একটি ঘটনা ঐতিহাসিক সময়ে ঘটে থাকার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু এই সাক্ষ্যটি দিক-নির্দেশনামূলক। কারণ, 'টাংগাস্কা ঘটনা' এবং 'মিটিওর ক্র্যাটার, অ্যারিজোনা' আমাদেরকে মনে করিয়ে দেয় যে, সকল অভিঘাত-বিপর্যয় সৌর জগতের আদি ইতিহাসে সংঘটিত হয়নি। কিন্তু চান্দ্র গহ্বরসমূহের খুব অল্প কয়েকটির রয়েছে ব্যাপক রশ্মি ব্যবস্থা, যা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, এমনকি চাঁদেও কিছু ক্ষয় সংঘটিত হয়।* কোন গহ্বরটি কোনটিকে ঢেকে ফেলে এবং চান্দ্র স্তরবিন্যাসের অন্যান্য লক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে, আমরা পুনর্গঠন করতে পারি অভিঘাত এবং বন্যাগুলোর পরম্পরা, যেগুলোর মধ্যে সম্ভবত 'ক্র্যাটার ব্রুনো' হল সবচেয়ে সাম্প্রতিক।

পৃথিবী চাঁদের অতি নিকটে। যদি চাঁদ অভিঘাতের গহ্বর দ্বারা এত বেশি জর্জরিত হয়ে থাকে তবে, পৃথিবী এটি থেকে কীভাবে বেঁচে গেল? এখানে 'উল্কা-গহ্বর' এত বিরল কেন? ধূমকেতু এবং গ্রহাণুগুলো কি মনে করে যে, কোনো বসতিময় গ্রহে আঘাত করাটা সমীচীন নয়? এরকম একটি সংযম অসঙ্গত হওয়াই স্বাভাবিক। সম্ভাব্য একমাত্র ব্যাখ্যাটি হল যে, পৃথিবী এবং চাঁদ উভয় স্থানে অভিঘাত গহ্বরগুলো একই হারে সৃষ্টি হয়, কিন্তু বায়ুহীন, পানিহীন চাঁদে এরা সংরক্ষিত থাকে বহুকাল ধরে, আর পৃথিবীর ধীর ক্ষয় প্রক্রিয়া এদেরকে মুছে ফেলে বা ভরাট করে ফেলে। ধাবমান জলরাশি, বায়ু তাড়িত বালি এবং পর্বত-নির্মাণ খুব ধীর প্রক্রিয়া। কিন্তু মিলিয়ন বা বিলিয়ন বছরে এরা এমনকি বিশাল অভিঘাতের দাগগুলোকে মুছে ফেলতে সমর্থ।

যে কোনো উপগ্রহ বা গ্রহে থাকবে শূন্য থেকে অভিঘাতের মতো বহিঃস্থ প্রক্রিয়া, এবং ভূমিকম্পের মতো অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া ; থাকবে অগ্নিগিরির অগ্ন্যুৎপাতের মতো দ্রুত ও বিপর্যয়মূলক ঘটনা, এবং ক্ষুদ্র বায়ু তাড়িত ধূলিকণার

* মঙ্গল গ্রহে, যেখানে ক্ষয় খুব প্রবল, যদিও রয়েছে অনেক গহ্বর, প্রকৃতপক্ষে কোনো রশ্মি-গহ্বর নেই, যেমনটি আমরা আশা করি।

মাধ্যমে ভূপৃষ্ঠে দাগ ফেলে দেয়ার মতো বিরক্তিকর রকমের ধীর প্রক্রিয়াসমূহ। বহিঃস্থ নাকি অন্তঃস্থ প্রক্রিয়াগুলো ; বিরল ও তীব্র কিংবা সাধারণ ও অগোচর ঘটনাগুলো, কারা বেশি প্রভাব বিস্তার করে তার কোনো সাধারণ উত্তর নেই। চাঁদে বাইরের বিপর্যয়মূলক ঘটনাগুলোর নিয়ন্ত্রণ বেশি ; পৃথিবীতে প্রাধান্য বজায় রাখে অভ্যন্তরীণ ধীর প্রক্রিয়াগুলো। মঙ্গলে রয়েছে দুধরনের প্রভাবই।

মঙ্গল এবং বৃহস্পতির কক্ষদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে রয়েছে অসংখ্য গ্রহাণু, যেগুলো হল ক্ষুদ্র পার্থিব গ্রহ। এদের বৃহত্তমটি হল কয়েকশত কিলোমিটার চওড়া। অনেকগুলো আয়তাকার এবং এরা দ্রুত পতিত হচ্ছে শূন্যের ভিতর দিয়ে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে মনে হয় যে, দুই বা ততোধিক গ্রহাণু পারস্পরিক কক্ষপথ মেনে চলে। গ্রহাণুগুলোর মধ্যে প্রায়শই সংঘর্ষ সংঘটিত হয়, এবং মাঝে মাঝে একটি খণ্ডাংশ ছুটে আসে এবং দৈবভাবে অভিগৃহীত হয় পৃথিবীতে, মাটিতে পতিত হয় উল্কাপিণ্ড রূপে। আমাদের জাদুঘরগুলোর তাকসমূহে দূর জগতের খণ্ডাংশগুলো প্রদর্শিত হয়। গ্রহাণু-বেল্ট হল এক বিশাল যাঁতা-কল, উৎপন্ন করে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর ধুলোর কণিকা। গ্রহগুলোর পৃষ্ঠসমূহে সাম্প্রতিক গহ্বরগুলোর জন্য মূলত দায়ী হল বিশাল গ্রহাণু-খণ্ড এবং ধূমকেতুসমূহ। গ্রহাণু-বলয় হতে পারে এমন এক স্থান যেখানে একদা নিকটবর্তী বিশাল গ্রহ বৃহস্পতির মহাকর্ষের প্রভাবে কোনো গ্রহ গঠিত হতে বাধা পেয়েছিল ; অথবা এটি হতে পারে এমন কোনো গ্রহের ছিন্ন-ভিন্ন অবশেষ, যা নিজে থেকেই বিস্ফোরিত হয়েছিল। এটিকে অসম্ভব মনে হয়, কারণ পৃথিবীর কোনো বিজ্ঞানী জানেন না কীভাবে একটি গ্রহ নিজে নিজে বিস্ফোরিত হতে পারে।

শনির বলয়গুলোর কিছুটা সাদৃশ্য রয়েছে গ্রহাণু-বেল্টের সাথে : ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ক্ষুদ্র বরফময় উপগ্রহ গ্রহটির চারদিকে আবর্তিত হচ্ছে। এরা হয়ত উপস্থাপন করে সেইসব ধ্বংসাবশেষ যেগুলো নিকটবর্তী কোনো উপগ্রহে একীভূত হওয়ার কালে শনির মহাকর্ষ দ্বারা প্রতিহত হয়েছিল। অথবা এরা হল কোনো উপগ্রহের অবশিষ্টাংশ যা খুব কাছাকাছি ভ্রমণ করতে গিয়ে মহাকর্ষীয় বল দ্বারা টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল। বিকল্পরূপে, এরা হতে পারে টাইটানের মতো শনির কোনো উপগ্রহ হতে নির্গত পদার্থ এবং গ্রহটির বায়ুমণ্ডলে পড়ন্ত পদার্থের মধ্যে সুস্থিত অবস্থা। কেবল সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে যে, বৃহস্পতি এবং ইয়োরেনাসেরও রয়েছে বলয়-ব্যবস্থা, এবং পৃথিবী থেকে সেগুলো প্রায় অদর্শনযোগ্য। নেপচুনে কোনো বলয় রয়েছে কিনা তা গ্রহ-বিজ্ঞানীদের কাছে একটি প্রধান সমস্যা। মহাবিশ্বময় বৃহস্পতি-গোত্রীয় গ্রহগুলোর জন্য বলয়সমূহ হয়ত এক বৈশিষ্ট্যসূচক অলংকার।

শনি হতে শুক্র পর্যন্ত সাম্প্রতিক প্রধান সংঘর্ষগুলোর কথা উল্লেখিত হয়— 'Worlds in Collision' নামক জনপ্রিয় পুস্তকে, যা ১৯৫০ সালে প্রকাশিত হয় মনঃ চিকিৎসক ইমানুয়েল ভেলিকোভস্কি কর্তৃক। তিনি প্রস্তাব করলেন যে, গ্রহাদির

banglainternet.com

ভরসম্পন্ন একটি বস্তু কোনো একভাবে উৎপন্ন হয় বৃহস্পতি-ব্যবস্থায়। প্রায় ৩৫০০ বছর পূর্বে এটি অতি দ্রুত বেগে ছুটে যায় অন্তঃসৌর জগতের দিকে এবং পৃথিবী ও মঙ্গলের সাথে উপর্যুপরি সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, এর ফলাফল রূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল লোহিত সাগর, যে কারণে মোসেজ এবং ইসরাইলাইটগণ ফারাও থেকে পালিয়ে যেতে পারল, এবং জোসুয়ার নির্দেশ আর পৃথিবীর ঘূর্ণনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারল না। তিনি বলেন যে, এর ফলে ব্যাপক অগ্ন্যুৎপাত এবং বন্যার সৃষ্টি হয়।* ভেলিকোভস্কি ভাবলেন যে, এক জটিল আন্তঃগ্রহ বিলিয়ার্ড খেলার পর, ধূমকেতুটি একটি স্থায়ী ও প্রায় বৃত্তীয় কক্ষপথ গ্রহণ করল, পরিণত হল শুক্র গ্রহে—তার দাবি মতে যেটি এর পূর্বে কখনো অস্তিত্বশীল ছিল না।

অন্যকোনো এক স্থানে আমি কোনো এক মাত্রায় আলোচনা করেছি যে, প্রায় নিশ্চিতভাবেই এই ধারণাসমূহ ছিল ভুল। জ্যোতির্বিদগণের আপত্তি প্রধান সংঘর্ষগুলোর ব্যাপারে নয়, শুধুমাত্র প্রধান সাম্প্রতিক সংঘর্ষগুলোর ব্যাপারে। সৌর জগতের যে কোনো মডেলে, গ্রহগুলোর আকৃতিকে এদের কক্ষপথের একই স্কেলে দেখানো অসম্ভব, কারণ তখন গ্রহগুলো দেখতে অতি ক্ষুদ্র হয়ে যাবে। যদি গ্রহগুলোকে স্কেলে ধূলিকণার মতো দেখানো হয়, আমরা সহজেই দেখতে পাব যে, কয়েক হাজার বছরের মধ্যে পৃথিবীর সাথে কোনো একটি বিশেষ ধূমকেতুর সংঘর্ষ ঘটার সম্ভাবনা খুবই কম। উপরন্তু, শুক্র হল একটি শিলাময় এবং ধাতব, স্বল্প-হাইড্রোজেন গ্রহ, অথচ বৃহস্পতি—যেখান থেকে এটি আসে বলে ভেলিকোভস্কি ধারণা করেছিলেন—মূলত হাইড্রোজেন দ্বারা গঠিত। ধূমকেতু বা গ্রহের উদগিরণ ঘটানোর মতো কোনো শক্তির উৎস নেই বৃহস্পতির। যদি কোনো কিছু পৃথিবীর পার্শ্ব দিয়ে চলে যায়, তবে এটি থামাতে পারবে না পৃথিবীর ঘূর্ণনকে, সে আবারও প্রতি চব্বিশ ঘণ্টায় একবার করে ঘুরতে থাকবে। কোনো ভূ-তাত্ত্বিক সাক্ষ্য ৩৫০০ বছর পূর্বে অগ্ন্যুৎপাত বা বন্যার কোনো অস্বাভাবিক হারকে সমর্থন করে না। শুক্রকে উল্লেখ করে কিছু মেসোপোটেমীয় শিলালিপি রয়েছে যেগুলো শুক্র কখন ধূমকেতু থেকে গ্রহতে পরিণত হল ভেলিকোভস্কি কর্তৃক বর্ণিত সময়কালের চাইতে তা আরো পূর্বতন বলে প্রমাণিত করে।** এটি খুবই অস্বাভাবিক যে, এমন একটি যথার্থ উপবৃত্তাকার কক্ষ পথের বস্তু এত দ্রুত একালের শুক্রের প্রায় বৃত্তাকার কক্ষপথে প্রবেশ করবে।

* আমি যতটুকু জানি, ধূমকেতু আবির্ভাবের মধ্যবর্তিতা দ্বারা তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠা কোনো ঐতিহাসিক ঘটনার অনাধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার প্রথম প্রচেষ্টা ছিল এডমুন্ড হ্যালি'র এই প্রস্তাবটি যে, নোয়ার প্লাবন ছিল 'একটি ধূমকেতুর আঘাত।'

** 'অ্যাডা' সিলিন্ডার সিল, খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দের মধ্যভাগ থেকে বলে যার তারিখ উল্লেখিত, তা মূলত উপস্থাপন করে ভোরের নক্ষত্র শুক্রের দেবী, ইনানাকে, এবং এটি ব্যাবিলনীয় ইশতারের পূর্বসূচক।

বিজ্ঞানী এবং অ-বিজ্ঞানীগণ কর্তৃক প্রস্তাবিত অনেক প্রকল্পই ভুল প্রমাণিত হয়। কিন্তু বিজ্ঞান হল এক স্ব-সংশোধনী প্রক্রিয়া। নতুন ধারণাসমূহকে গৃহীত হতে হলে পার হতে হয় সাক্ষ্য-প্রমাণের কঠোর ধাপসমূহ। ভেলিকোভস্কির কাজের সবচেয়ে খারাপ দিকটি এই নয় যে, তার প্রকল্পগুলো ছিল ভুল বা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত সত্যগুলোর সাথে বিরোধিতাপূর্ণ, কিন্তু এই যে, কিছু লোক যারা নিজেদেরকে বিজ্ঞানী বলে দাবি করে, ভেলিকোভস্কির কাজকে অবদমিত করার প্রয়াস পেল। মুক্ত অনুসন্ধান দ্বারা বিজ্ঞান সৃষ্ট এবং এটি এর কাছে নিবেদিত : যত উদ্ভটই হোক না কেন, যে কোনো প্রকল্পের ধারণাসমূহ এদের যোগ্যতা অনুযায়ী বিবেচিত হওয়ার দাবি রাখে। অস্বস্তিকর ধারণাসমূহ ধর্ম বা রাজনীতিতে অবদমিত হতে পারে, কিন্তু এটি জ্ঞানের পথ নয় ; বিজ্ঞানের প্রচেষ্টায় এর কোনো স্থান নেই। আমরা আগে ভাগে জানি না কে আবিষ্কার করবে নতুন মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি।

শুক্রের রয়েছে প্রায় পৃথিবীর মতোই ভর*, আকৃতি এবং ঘনত্ব। নিকটতম গ্রহ হওয়ার কারণে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে একে পৃথিবীর বোন বলে ভাবা হয়েছে। আমাদের বোন-গ্রহটি প্রকৃতপক্ষে কেমন ? হয়ত বা এক স্নিগ্ধ ও উষ্ণ গ্রহ, পৃথিবীর তুলনায় কিছুটা উষ্ণতর, কারণ এটি সূর্যের নিকটতর ? এতে কি রয়েছে অভিঘাত-গহ্বর, অথবা এগুলোর সবই ধীরে ধীরে ক্ষয় হয়ে গেছে ? সেখানে কি রয়েছে আগ্নেয়গিরি ? পর্বতমালা ? মহাসাগর ? প্রাণ ?

১৬০৯ সালে গ্যালিলিও হলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি দূরবীক্ষণ যন্ত্রের ভিতর দিয়ে তাকালেন শুক্রের দিকে। তিনি দেখতে পেলেন চরমভাবে বৈশিষ্ট্যহীন একটি চাকতি। গ্যালিলিও লক্ষ করলেন যে, চাঁদের মতো এটি এগিয়ে গেল বিভিন্ন দশার ভিতর দিয়ে, একটি সরু অর্ধ-চন্দ্রাকৃতি দশা থেকে পূর্ণ-চাকতির দশায়, এবং একই কারণে : আমরা কখনো মূলত তাকিয়ে থাকি শুক্রের রাত্রি-অংশের দিকে এবং কখনো মূলত দিবা-অংশের দিকে, এমন এক পর্যবেক্ষণ যা শেষপর্যন্ত এই দৃষ্টিভঙ্গিটিকে শক্তিশালী করল যে, পৃথিবী সূর্যের চারদিকে আবর্তিত হয় এবং এর বিপরীতটি ঘটে না। আলোক দূরবীক্ষণ যন্ত্রসমূহ বৃহত্তর এবং এদের রেজোলূশন (বা চূড়ান্ত পার্থক্যকরণ ক্ষমতা) উন্নত হয়ে উঠার ফলে, এদেরকে নিয়মসিদ্ধভাবে ঘুরিয়ে দেয়া হল শুক্রের দিকে। কিন্তু এগুলো গ্যালিলিও'রটির চাইতে উৎকৃষ্টতর কিছু দিল না। শুক্র স্পষ্টতই আচ্ছাদিত ছিল অন্ধকারময় মেঘের এক পুরু স্তর দ্বারা। ভোর বা সন্ধ্যার আকাশে যখন আমরা এই গ্রহটির দিকে তাকাই, আমরা দেখতে থাকি শুক্রের মেঘমালা থেকে প্রতিফলিত, সূর্যালোককে। কিন্তু এদের আবিষ্কারের অনেক শতাব্দী পরেও, সেই মেঘমালার গঠনশৈলী আমাদের কাছে পুরোপুরি অজানা রয়ে গেছে।

* প্রসঙ্গক্রমে, এটি আমাদের জ্ঞাত সবচেয়ে ভারী ধূমকেতুটির তুলনায় প্রায় ৩০ মিলিয়ন গুণ ভারী।

banglainternet.com

শুক্র গ্রহে দর্শনগ্রাহ্য কোনো কিছু না পাওয়ার ফলে কিছু বিজ্ঞানী পৌঁছলেন এক কৌতূহলোদ্দীপক উপসংহারে যে, এর পৃষ্ঠটি একটি জলাভূমি, অনেকটা কার্বনিফেরাস যুগের পৃথিবীর মতো। মতামতটি—যদি আমরা একে এরূপ একটি শব্দ দ্বারা যথার্থভাবে প্রকাশ করতে পরি—তবে তা হবে এরকম :

'আমি শুক্রে কোনো কিছু দেখতে পাই না।'

'কেন নয় ?'

'কারণ এটি পুরোপুরি মেঘাচ্ছাদিত।'

'মেঘগুলো কিসের তৈরি ?'

'অবশ্যই, পানি।'

'তবে শুক্রের মেঘগুলো পৃথিবীর মেঘগুলোর তুলনায় পুরু কেন ?'

'কারণ সেখানে রয়েছে অধিক পরিমাণ মেঘ।'

'কিন্তু মেঘে যদি অধিক জলীয় বাষ্প থাকে, তবে পৃষ্ঠদেশে থাকবে অধিক পানি। কি জাতীয় পৃষ্ঠ বেশি ভেজা ?'

'জলাভূমি।'

এবং যদি জলাভূমিই থাকবে তবে শুক্রে কেন থাকবে না সায়াকেড্‌স এবং ফড়িং এবং হয়ত ডাইনোসর ?

পর্যবেক্ষণ : শুক্রে কিছুই দেখা গেল না। উপসংহার : এটি অবশ্যই প্রাণ দ্বারা আচ্ছাদিত। শুক্রের বৈশিষ্ট্যহীন মেঘ প্রতিফলিত করল আমাদের নিজস্ব প্রবণতাসমূহকেই। আমরা জীবিত, এবং আমরা অন্যত্র প্রাণের ধারণা দ্বারা অনুরণিত হই। কিন্তু কেবলমাত্র সাক্ষ্যসমূহের সযত্ন সঞ্চয়ন এবং মূল্যায়নই আমাদেরকে বলতে পারে কোনো গ্রহ বসতিপূর্ণ কি না। শুক্র আমাদের প্রবণতাসমূহের প্রতি বাধিত নয়।

শুক্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রকৃত ইঙ্গিত পাওয়া গেল কাচের তৈরি একটি প্রিজম বা একটি সমতল পৃষ্ঠ দ্বারা কাজ করার সময়, যাকে বলা হয় অপবর্তন গ্রেটিং, যা সূক্ষ্ম, সমান ব্যবধানে অবস্থিত রেখা দ্বারা দাগাঙ্কিত থাকে। যখন সাধারণ সাদা আলোর তীব্র আলোক রশ্মি সরু চিরের ভিতর দিয়ে অতিক্রম করে এবং অতঃপর প্রিজম বা গ্রেটিং-এর ভিতর দিয়ে এটি বিভিন্ন বর্ণধারক একটি রংধনুতে পরিণত হয়, তাকে বলা হয় বর্ণালি। বর্ণালিটি দৃশ্যমান আলোর উচ্চ কম্পাংক থেকে নিম্ন কম্পাংকের* দিকে যায়—বেগুনি, নীল, সবুজ, হলুদ, কমলা এবং লাল। যেহেতু আমরা এই বর্ণগুলো দেখতে পাই, একে বলা হয় দৃশ্যমান আলোর বর্ণালি। কিন্তু আমাদের দৃশ্যমান বর্ণালির ক্ষুদ্র অংশটির বাইরেও রয়েছে আরো অনেক আলো। বেগুনির চাইতেও অধিক কম্পাংকে রয়েছে অতিবেগুনি নামক একটি বর্ণালির অংশ :

* আলো একটি তরঙ্গ গতি ; এর কম্পাংক হল তরঙ্গ শীর্ষের সংখ্যা, ধরুন, যেগুলো কোনো গ্রাহক যন্ত্রে, যেমন রেটিনাতে প্রবেশ করে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে, যেমন প্রতি সেকেন্ডে। কম্পাংক যত বেশি, বিকিরণের শক্তি তত বেশি।

আলোর এক যথার্থ রূপ, যা মৃত্যু ডেকে আনে অণুজীবদের। এটি আমাদের কাছে অদৃশ্য কিন্তু সহজেই ভ্রমর এবং আলোক-তড়িৎ কোষের পক্ষে দ্রুত শনাক্তকরণযোগ্য। আমরা যা কিছু দেখতে পাই তাছাড়াও এ জগতে রয়েছে অনেক কিছু। অতিবেগুনির সীমানার বাইরে রয়েছে বর্ণালির এক্স-রশ্মির অংশটুকু, এবং এক্স-রশ্মির পর রয়েছে গামা রশ্মি। লালের অন্যপার্শ্বে নিম্ন কম্পাংকে, রয়েছে বর্ণালির অবলোহিত অংশ। এটি আবিষ্কৃত হয়েছিল একটি সুবেদী থার্মোমিটারকে এমন কিছুতে স্থাপন করে যা আমাদের চোখে লাল অপেক্ষা বেশি গাঢ়। তাপমাত্রা বাড়তে থাকল। থার্মোমিটারের উপর আপতিত হতে লাগল আলো, যদিও তা আমাদের চোখে দৃশ্যমান ছিল না। র‍্যাটলস্নেইক্‌স এবং ডোপায়িত অর্ধপরিবাহী অবলোহিত বিকিরণকে যথার্থভাবে শনাক্ত করতে পারে। অবলোহিতের পর রয়েছে বেতার তরঙ্গের বিশাল বর্ণালি অঞ্চল। গামা রশ্মি থেকে বেতার তরঙ্গ পর্যন্ত, সবগুলোই হল সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ আলোর প্রকরণ। জ্যোতির্বিদ্যাতে এদের সবগুলোই তাৎপর্যময়। কিন্তু আমাদের চোখের সামর্থ্যের সীমাবদ্ধতার কারণে, সেই ক্ষুদ্র রংধনু ব্যান্ডটির প্রতি আমাদের রয়েছে এক কুসংস্কার, এক পক্ষপাত, যাকে আমরা বলি দৃশ্যমান আলোর বর্ণালি।

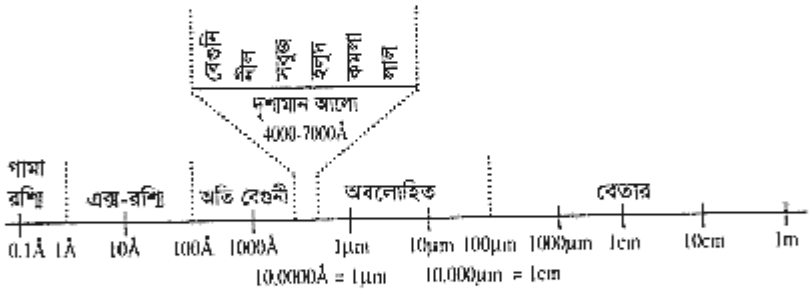

তড়িৎ চুম্বকীয় বর্ণালির ছকবদ্ধ চিত্র। আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য পরিমাপ করা হয় অ্যাংস্ট্রম (Å), মাইক্রোমিটার (μm), সেন্টিমিটার (cm)এবং মিটারে (m)।

১৮৪৪ সালে, দার্শনিক অগাস্তে কঁতে এমন এক ধরনের জ্ঞানের উদাহরণ অনুসন্ধান করছিলেন যা সর্বদাই থাকবে লুকোনো। তিনি নির্বাচন করলেন সুদূর নক্ষত্র ও গ্রহদের গঠন। তিনি ভাবলেন যে, আমরা কখনোই এগুলোতে শারীরিকভাবে ভ্রমণ করতে পারবো না, এবং তার কাছে মনে হল যে, হাতে কোনো নমুনা না থাকায় আমরা এদের গঠন সম্পর্কিত যে কোনো জ্ঞানের প্রতি চিরদিন অনীহা প্রকাশ করব। কিন্তু কঁতের মৃত্যুর মাত্র তিন বছর পর, এটি আবিষ্কৃত হল যে, দূরের বস্তুগুলোর রসায়ন নির্ণয় করার জন্য ব্যবহৃত হতে পারে বর্ণালি। বিভিন্ন অণু এবং রাসায়নিক বস্তু আলোর বিভিন্ন কম্পাংক বা বর্ণ শোষণ করে, কখনো

banglainternet.com

বর্ণালির দৃশ্যমান অংশে এবং কখনো বা অন্যকোনো অংশে। কোনো গ্রহের বায়ুমণ্ডলের বর্ণালিতে, একটি একক গাঢ় রেখা উপস্থাপন করে এমন একটি চিরের প্রতিবিম্ব যেখানে আলো পতিত হয় না, অন্য গ্রহের বায়ুমণ্ডলের ভিতর দিয়ে সংক্ষিপ্ত ভ্রমণের সময় ঘটে সূর্যালোকের শোষণ। এরূপ প্রতিটি রেখা সৃষ্টি হয় একটি বিশেষ অণু বা পরমাণু দ্বারা। প্রতিটি পদার্থের রয়েছে বৈশিষ্ট্যসূচক বর্ণালি-চিহ্ন। শুক্রের গ্যাসসমূহকে ৬০ মিলিয়ন কিলোমিটার দূরে অবস্থিত পৃথিবী হতে শনাক্ত করা যায়। আমরা ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি সূর্য (যেখানে পাওয়া গিয়েছিল হিলিয়াম, যার নামকরণ করা হয় গ্রিক সূর্য-দেবতা হেলিওসের নামানুসারে)-এর গঠন সম্পর্কে ; ইয়োরোপিয়াম সমৃদ্ধ ম্যাগনেটিক A নক্ষত্র সম্পর্কে ; এক শত বিলিয়ন নক্ষত্রের সামগ্রিক আলোর মাধ্যমে সংশ্লেষিত সুদূর গ্যালাক্সিসমূহ সম্পর্কে। জ্যোতির্তাত্ত্বিক বর্ণালিতত্ত্ব প্রায় এক জাদুকরী পদ্ধতি। এটি আমাকেও বিস্মিত করে। অগাস্তে কঁতে বেছে নিয়েছিলেন সবিশেষ দুর্ভাগ্যজনক উদাহরণ।

যদি শুক্র গ্রহটি জলে সিক্ত হয়েই থাকত, তবে এর বর্ণালিতে জলীয় বাষ্প রেখা দৃশ্যমান হত। কিন্তু ১৯২০ সালে 'মাউন্ট উইল্‌সন মানমন্দির'-এ প্রথম বর্ণালিভাত্ত্বিক অনুসন্ধানসমূহ শুক্রের মেঘমালার উপর জলীয় বাষ্পের কোনো ইঙ্গিত বা চিহ্ন খুঁজে পেল না, যা একে একটি শুষ্ক, মরুভূমি সদৃশ পৃষ্ঠ বলে সূচিত করল, যার উপরে আরোপিত ছিল সূক্ষ্ম ও ধাবমান সিলিকেট ধূলিকণার মেঘ। আরো অনুসন্ধান এর বায়ুমণ্ডলে প্রচুর পরিমাণ কার্বন ডাই অক্সাইডের উপস্থিতি প্রকাশ করল, যা কিছু বিজ্ঞানীর কাছে এই অর্থ বয়ে আনল যে, গ্রহটির সমস্ত পানি হাইড্রোকার্বনগুলোর সাথে যুক্ত হয়ে কার্বন ডাই অক্সাইড গঠন করে, এবং তাই শুক্র গ্রহটি যেন এক সর্বব্যাপী তৈল ক্ষেত্র, গ্রহ-ব্যাপী এক পেট্রোলিয়াম-সমুদ্র। অন্যরা উপসংহার টানলেন যে, মেঘগুলো খুব ঠাণ্ডা বলে এদের উপর কোনো জলীয় বাষ্প ছিল না, অর্থাৎ সব পানি ঘনীভূত হয়ে পানির ফোঁটায় পরিণত হয়, যার একই বর্ণালি-রেখার বিন্যাস জলীয় বাষ্পের মতো নয়। তারা বললেন যে, গ্রহটি পুরোপুরিভাবে পানিতে আচ্ছাদিত—হয়ত ভোভারের উঁচু পাহাড়ের মতো চুনা পাথরের আবরণময় একটি দ্বীপ ব্যতীত। কিন্তু বায়ুমণ্ডলে প্রচুর পরিমাণ কার্বন ডাই অক্সাইডের কারণে সমুদ্রের পানি সাধারণ পানি নয় ; ভৌত রসায়ন অনুযায়ী তা ছিল কার্বন ডাই অক্সাইডযুক্ত পানি। তারা প্রস্তাব করলেন যে, শুক্রের ছিল সেল্টজারের এক বিশাল মহাসাগর।

প্রকৃত অবস্থানের সংকেতটি বর্ণালির দৃশ্যমান বা নিকট-অবলোহিত অংশের বর্ণালি-তাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ থেকে আসেনি, বরং এসেছিল বেতার অঞ্চল থেকে। একটি বেতার দূরবীক্ষণ যন্ত্র এর কাজে ক্যামেরার চাইতে লাইট-মিটারের সাথেই বেশি সাদৃশ্য বহন করে। আপনি একে আকাশের বেশ খোলা দিকে স্থাপন করুন এবং একটি বিশেষ বেতার কম্পাংকে কতটুকু শক্তি পৃথিবীতে নেমে আসছে এটি তা রেকর্ড করে রাখে। বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনের কিছু বৈচিত্র্যে সঞ্চালিত বেতার

সংকেতে আমরা অভ্যস্ত—যেমন, যারা রেডিও বা টেলিভিশন সম্প্রচার কেন্দ্রে কাজ করেন। প্রাকৃতিক বস্তুগুলোর বেতার তরঙ্গ নির্গত করার আরো অনেক কারণ আছে। একটি হল যে, এরা উত্তপ্ত। এবং ১৯৫৬ সালে, যখন একটি আদি বেতার দূরবীক্ষণ যন্ত্রকে ঘুরিয়ে দেয়া হল শুক্রের দিকে, আবিষ্কৃত হল যে এটি নিঃসরণ ঘটায় বেতার তরঙ্গের, যেন এটি অতি উচ্চ তাপমাত্রায় আছে। কিন্তু প্রকৃত বাস্তবতা হল যে, যখন ভিনেরা সিরিজের সোভিয়েত মহাকাশযান নিকটতম গ্রহটির অন্ধকার মেঘমালাকে প্রথম ভেদ করল এবং এর রহস্যময় ও অগম্য পৃষ্ঠে অবতরণ করল, তখন শুক্রের পৃষ্ঠটি বিস্ময়কর রকমের উত্তপ্ত বলে প্রমাণিত হল। শুক্রগ্রহটি যেন ঝলসানো উত্তাপের আধার। নেই কোনো জলাভূমি, কোনো তৈলক্ষেত্র বা কোনো সেল্টজার মহাসাগর। অপ্রতুল উপাত্ত দিয়ে ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছানো খুব সহজ।

যখন আমি স্বাগত জানাই আমার কোনো বান্ধবীকে, আমি তাকে দেখি দৃশ্যমান আলোতে, যা হয়ত সূর্য থেকে বা কোনো ভাস্বর বাতি থেকে আগত। আলোক রশ্মিসমূহ আমার বান্ধবীর কাছ থেকে ফিরে আসে এবং আঘাত করে আমার চোখে। কিন্তু প্রাচীনকালের মানুষেরা, এমনকি ইউক্লিডের মতো ব্যক্তিও বিশ্বাস করতেন যে, আমাদের চোখ থেকে কোনো একভাবে নিঃসৃত আলোক রশ্মি দ্বারা আমরা দেখতে পাই এবং রশ্মিসমূহ দৃষ্ট বস্তুটিকে বোধগম্য ও সক্রিয়ভাবে স্পর্শ করে। এটি একটি প্রাকৃতিক ধারণা এবং এখনো এটির মুখোমুখি হওয়া যায়, যদিও এটি কোনো অন্ধকার কক্ষে বস্তুসমূহকে দেখতে না পাওয়ার কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারে না। আজ আমরা সমন্বয় ঘটাই একটি লেজার এবং একটি আলোক-কোষের, অথবা একটি রাডার ট্রান্সমিটার এবং একটি বেতার দূরবীক্ষণ যন্ত্রের, এবং এভাবে আলো এবং দূরবর্তী বস্তুর মধ্যে সক্রিয় সংযোগ ঘটে। রাডার জ্যোতির্বিদ্যায়, পৃথিবীতে স্থাপিত একটি দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা সঞ্চালিত করা হয় বেতার তরঙ্গ, হয়ত আঘাত করে শুক্রের সেই গোলার্ধটিকে যা তখন পৃথিবীর দিকে ঘুরে ছিল, এবং তরঙ্গটি ফিরে আসে। অনেক তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে শুক্রের মেঘমালা এবং বায়ুমণ্ডল বেতার তরঙ্গের প্রতি পুরোপুরি স্বচ্ছ মাধ্যমের মতো আচরণ করে। পৃষ্ঠের কিছু স্থান এদেরকে শোষণ করবে অথবা, যদি তারা খুব অমসৃণ হয়, তবে তারা এদেরকে পার্শ্ব বরাবর ছড়িয়ে দেবে এবং এ কারণে বেতার তরঙ্গের জন্য অন্ধকার বলে মনে হবে। শুক্রের ঘূর্ণনের সাথে এর পৃষ্ঠদেশের অস্বচ্ছ চলমান বৈশিষ্ট্যসমূহ অনুসরণ করে প্রথমবারের এর দিনের দৈর্ঘ্য নির্ভরযোগ্যভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছিল—শুক্র এর নিজ অক্ষে একবার আবর্তিত হতে কতক্ষণ সময় নেয়। দেখা যায় যে, নক্ষত্রদের সাপেক্ষে, শুক্র একটি পূর্ণ আবর্তন সম্পন্ন করে ২৪৩ পৃথিবী দিবসে, কিন্তু পশ্চাৎ-দিকে, অন্তঃসৌর জগতের অন্য সকল গ্রহের বিপরীত দিকে। এর ফলে, সূর্য পশ্চিম দিকে উদিত হয় এবং পূর্বদিকে অস্ত যায়, সূর্যোদয় থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত সময় লাগে ১১৮ পৃথিবী-দিবস। অধিকন্তু, এটি যতবার আমাদের

banglainternet.com

গ্রহের নিকটতম অবস্থানে আসে ততবারই প্রায় একই পার্শ্ব উপস্থাপন করে। তবে, পৃথিবীর মহাকর্ষ শুক্রকে ঠেলে দিয়েছে এই পৃথিবী-বদ্ধ ঘূর্ণন হারে, এটি দ্রুত ঘটানো সম্ভব ছিল না। শুক্র স্রেফ কয়েক হাজার বছরের পুরনো নয়, এটি অবশ্যই অন্তঃসৌর জগতের অন্যান্য বস্তুর মতোই পুরনো।

শুক্রের রাডার চিত্রও পাওয়া গেছে কিছু ভূমি-ভিত্তিক রাডার দূরবীক্ষণ যন্ত্র থেকে, কিছু গ্রহটির চারপাশের কক্ষপথে স্থাপিত 'পাইওনিয়ার ভেনাস' মহাকাশযান থেকে। এগুলো দেখিয়েছে অভিঘাত গহ্বরের উৎসাহব্যঞ্জক প্রমাণ। চাঁদের পার্বত্যাঞ্চলের সাথে বিশদভাবে শুক্রে না খুব বড়ো না খুব ছোটো গহ্বর এত বেশি সংখ্যক যে, শুক্র আমাদেরকে এটিই বলছে যে, সে অতি পুরনো। কিন্তু শুক্রের গহ্বরগুলো যথেষ্ট অগভীর, যেন পৃষ্ঠের উচ্চ তাপমাত্রা এমন এক ধরনের শিলা উৎপন্ন করেছে যা দীর্ঘকাল ধরে টফি বা পুটির মতো বাহিত হয়ে ক্রমশ নরম করে ফেলে উপাদানসমূহকে। এখানে রয়েছে তিব্বতীয় মালভূমির দ্বিগুণ উচ্চতা সম্পন্ন ভূমিরূপ, পৃষ্ঠদেশে ফাটলের ফলে সৃষ্ট বিশাল উপত্যকা, সম্ভবত অতিকায় আগ্নেয়গিরিসমূহ এবং এভারেস্টের মতো উঁচু একটি পর্বত। এখন আমরা আমাদের সামনে দেখতে পেলাম এমন এক জগৎকে যা পূর্বে পুরোপুরি লুকোনো ছিল মেঘের আড়ালে—এর বৈশিষ্ট্যগুলো প্রথম উদ্‌ঘাটিত হল রাডার এবং মহাকাশযানগুলো কর্তৃক।

বেতার জ্যোতির্বিদ্যা হতে নিরূপিত এবং প্রত্যক্ষ নভোযান-পরিমাপ দ্বারা নিশ্চিতকৃত তথ্য মতে শুক্রের পৃষ্ঠ-তাপমাত্রার মান প্রায় ৪৮০°C বা ৯০০°F, যা আমাদের গৃহস্থালিতে ব্যবহৃত ওভেনের তুলনায় উত্তপ্ত। পৃষ্ঠের চাপটি ৯০ বায়ুমণ্ডলীয় চাপ, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে আমরা যে চাপ অনুভব করি তার তুলনায় ৯০ গুণ, যা মহাসাগরের পৃষ্ঠের এক কিলোমিটার পানির চাপের সমতুল্য। শুক্রের উপর দীর্ঘক্ষণ টিকে থাকতে গেলে একটি মহাকাশযানকে হতে হবে হিমায়িত এবং গভীরে নিমজ্জনযোগ্য।

সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রায় এক ডজন মহাকাশযান প্রবেশ করেছে শুক্রের আবহমণ্ডলে এবং ভেদ করেছে এর মেঘমালাকে ; প্রকৃত পক্ষে এদের খুব অল্প কয়েকটি শুক্রের পৃষ্ঠদেশে* এক ঘণ্টার মতো টিকে থাকতে

* পাইওনিয়ার ভেনাস ছিল ১৯৭৮-৭৯ তে এক সফল মার্কিন মিশন, যাতে সমন্বিত ছিল একটি অর্বিটার এবং চারটি বায়ুমণ্ডলীয় এন্ট্রি প্রোব, যাদের দুটি টিকে থাকতে পেরেছিল শুক্রের পৃষ্ঠদেশের রুক্ষতার সামনে অল্প সময়ের জন্য। গ্রহগুলোতে অনুসন্ধানের জন্য নভোযান নামানোর ক্ষেত্রে রয়েছে অনেক অপ্রত্যাশিত বিষয়। এটি সেগুলোর অন্যতম : পাইওনিয়ার এন্ট্রি প্রোবগুলোর একটিতে যে সকল যন্ত্রপাতি সংযুক্ত করা হয়েছিল সেগুলোর মধ্যে ছিল একটি 'নিট ফ্লাক্স রেডিওমিটার', যেটি নির্মিত হয়েছিল শুক্রের বায়ুমণ্ডলের প্রতিটি অবস্থানে উপরে এবং নিচে প্রবাহমান অবলোহিত শক্তির পরিমাণকে একই সাথে পরিমাপ করার উদ্দেশ্যে।

পেরেছে। সোভিয়েতের ভিনেরা সিরিজের দুটি মহাকাশযান সেখানে ছবি তুলেছে। আমাদেরকে অনুসরণ করতে হবে এ সকল পথিকৃৎ অভিযানের পদচিহ্নসমূহকে এবং ভ্রমণ করতে হবে অন্য গ্রহে।

সাধারণ দৃশ্যমান আলোতে শুক্রের হালকা হরিদ্রাভ মেঘমালা দৃষ্টিগোচর হয়ে উঠে, কিন্তু গ্যালিলিও প্রথম যেমনটি লক্ষ করেছিলেন, এরা কার্যত আদৌ তেমনি কোনো বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে না। তবে যদি ক্যামরা ধরা হয় অতিবেগুনি রশ্মিতে, আমরা সুউচ্চ বায়ুমণ্ডলে দেখতে পাই, এক শোভন এবং ঘূর্ণি তোলা আবহাওয়া ব্যবস্থা, যেখানে বাতাসের বেগ প্রায় ১০০ মাইল/ সেকেন্ড, অর্থাৎ প্রায় ২২০ মাইল/ঘণ্টা। শুক্রের আবহ মণ্ডলের প্রায় ৯৬% হল কার্বন ডাই অক্সাইড। রয়েছে সামান্য পরিমাণ নাইট্রোজেন, জলীয় বাষ্প, আর্গন, কার্বন মনো অক্সাইড, এবং অন্যান্য আরো কিছু গ্যাস, কিন্তু যে হাইড্রোকার্বন বা কার্বোহাইড্রেট সেখানে রয়েছে তা প্রতি মিলিয়নে ০.১ ভাগেরও কম। শুক্রের মেঘগুলো মূলত সালফিউরিক এসিডের এক ঘন দ্রবণ। রয়েছে সামান্য পরিমাণ হাইড্রোক্লোরিক এবং হাইড্রোফ্লোরিক এসিডও। এমনকি এর সুউচ্চ, ঠাণ্ডা মেঘমালাতেও শুক্র পুরোপুরি এক অবাসযোগ্য জঘন্য স্থান।

দৃশ্যমান মেঘের স্তরের উপরে, প্রায় ৭০ কি. মি. উচ্চতায়, রয়েছে বিভিন্ন বস্তুকণার এক নিরবচ্ছিন্ন কুয়াশা। ৬০ কি. মি. উচ্চতায় আমরা ডুবে যাই মেঘের স্তরে এবং আমরা নিজেদেরকে আবিষ্কার করি ঘন সালফিউরিক এসিডের ফোঁটার মাঝে। আমরা যতই গভীরে যাই, মেঘ কণাগুলো ততই বড়ো হওয়ার প্রবণতা দেখায়। সামান্য পরিমাণ তীব্র সালফার ডাই অক্সাইড (SO_2) গ্যাস রয়েছে অপেক্ষাকৃত নিচের বায়ুমণ্ডলে। এটি বাহিত হয় মেঘের উপরেও, ভেঙে পড়ে সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মির দ্বারা এবং সেখানে পানির সাথে পুনর্মিলিত হয়ে গঠন করে সালফিউরিক এসিড—যা ঘনীভূত হয়ে পরিণত হয় ফোঁটায়, জমাট বাঁধে এবং নিম্ন উচ্চতায় তাপ দ্বারা বিশ্লেষিত হয়ে পুনরায় পরিণত হয় SO_2 এবং পানিতে, পূর্ণ করে চক্রটি। শুক্র গ্রহে অনবরত হচ্ছে সালফিউরিক এসিডের বৃষ্টি, গ্রহটির সর্বত্র, এবং একটি ফোঁটাও কখনো পৌঁছতে পারে না এর পৃষ্ঠ দেশে।

সালফার-বর্ণের কুয়াশা নিচের দিকে শুক্রের পৃষ্ঠ হতে প্রায় ৪৫ কিলোমিটার উপর পর্যন্ত বিস্তৃত, যেখানে আমরা প্রবেশ করি এক ঘন কিন্তু স্ফটিক-স্বচ্ছ বায়ুমণ্ডলে। তবে বায়ুমণ্ডলীয় চাপ এত বেশি যে, আমরা পৃষ্ঠটি দেখতে পাই না।

যন্ত্রটির প্রয়োজন পড়ল একটি মজবুত জানালার যা অবলোহিত বিকিরণের জন্যও স্বচ্ছ। আনা হল একটি ১৩.৫ ক্যারেট হীরক এবং স্থাপন করা হল কাঙ্ক্ষিত জানালাটিতে। কিন্তু ঠিকাদারকে দিতে হল ১২,০০০ মার্কিন ডলার আমদানি-কর। শেষ পর্যন্ত, যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক বিভাগ সিদ্ধান্ত নিল যে, হীরকটি শুক্রের উদ্দেশে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর পৃথিবীতে ব্যবসার জন্য এটিকে আর পাওয়া যাবে না এবং তারা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে করের টাকা ফিরিয়ে দিল।

banglainternet.com

সূর্যালোক বায়ুমণ্ডলীয় অণুসমূহ দ্বারা প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে যতক্ষণ না আমরা এর পৃষ্ঠ থেকে প্রাপ্ত সকল প্রতিবিম্ব হারিয়ে না ফেলি। এখানে নেই কোনো ধুলো বা কোনো মেঘ, শুধুমাত্র একটি বায়ুমণ্ডল স্পষ্টতই ঘনতর হয়ে উঠছিল। উপরস্থ মেঘের মাধ্যমে যথেষ্ট আলোক সঞ্চালিত হচ্ছিল, পৃথিবীর একটি মেঘাচ্ছন্ন দিনের মতোই।

ঝলসে দেয়ার মতো তাপ, প্রচণ্ড চাপ, ক্ষতিকর গ্যাসসমূহ এবং সবকিছু যখন ব্যাপ্ত হয়ে পড়ছে এক লালাভ বিকিরণের আতংকের মাঝে, তখন শুক্রকে নরকের প্রতিমূর্তির তুলনায় প্রেমের দেবীর সাথে কম সাদৃশ্য বহন করে বলে মনে হয়। আমরা যতটা অনুধাবন করতে পারি তা হল যে, এর পৃষ্ঠদেশের সামান্য কিছু অংশে হলেও ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বিভিন্ন আকৃতির নরম শিলাখণ্ড, এক প্রতিকূল স্থান, শূন্য ভূ-দৃশ্যাবলি যার বৈচিত্র্য শুধু এখানে-সেখানে রয়েছে পড়ে থাকা কোনো সুদূর গ্রহের ধ্বংসোন্মুখ মহাকাশযানের ক্ষয়ে যাওয়া অবশেষ, যা পুরু, মেঘাচ্ছন্ন ও বিষাক্ত বায়ুমণ্ডলের* মধ্য দিয়ে একেবারেই দৃশ্যমান নয়।

শুক্র হল গ্রহময় এক ধরনের দুর্যোগের মতো। এখন এটি যথেষ্ট স্পষ্ট যে, এক বড়ো রকমের গ্রিন হাউজ প্রতিক্রিয়ার কারণেই পৃষ্ঠদেশের এই উচ্চ তাপমাত্রার উদ্ভব। সূর্যালোক প্রবেশ করে শুক্রের বায়ুমণ্ডল এবং মেঘের ভিতর দিয়ে যা দৃশ্যমান আলোর জন্য অর্ধ-স্বচ্ছ এবং তা পৃষ্ঠদেশে পৌছায়। পৃষ্ঠটি উত্তপ্ত হয়ে শোষিত তাপ পুনরায় শূন্যে ফিরিয়ে দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু শুক্র যেহেতু সূর্য অপেক্ষা শীতলতর, এটি বর্ণালির দৃশ্যমান অংশের চাইতে অবলোহিত অংশের

* এই স্থানান্তরশীল ভূ-দৃশ্যাবলিতে কোনো কিছু জীবিত থাকার কথা নয়, এমনকি আমাদের চাইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের প্রাণীরও নয়। জৈব এবং কল্পনাযোগ্য অন্যান্য জীববৈজ্ঞানিক অণুসমূহ স্রেফ টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। কিন্তু প্রশ্রয় হিসেবে, আমরা কল্পনা করে নিই যে, এরূপ একটি গ্রহে একদা বুদ্ধিমান প্রাণীর বিবর্তন ঘটেছিল। তবে এটি কি তখন বিজ্ঞান উদ্ভাবন করেছিল ? পৃথিবীতে বিজ্ঞানের বিকাশ প্রণোদিত হয় মূলত গ্রহ ও নক্ষত্রসমূহের পর্যবেক্ষণ দ্বারা। শুক্র সম্পূর্ণভাবে মেঘাচ্ছাদিত। রাত্রি অতিশয় দীর্ঘ—প্রায় ৫৯ টি পৃথিবী-রাত্রির সমান—কিন্তু কেউ যদি শুক্রের নৈশ-আকাশের পানে তাকায় তবে জ্যোতির্তাত্ত্বিক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কিছুই দৃষ্টিগোচর হবে না। এমন কি দিনের সূর্যও দেখা যাবে না ; এর আলো সারা আকাশময় ছড়িয়ে পড়বে এবং শোষিত হয়ে যাবে—যেমনটি, স্কিউবা ডাইভারগণ সমুদ্রের তলদেশে দেখতে পায় এক সুষম আচ্ছাদনময় বিকিরণ। শুক্রে যদি কোনো বেতার দূরবীক্ষণ যন্ত্র নির্মাণ করা যেত তবে তা সূর্য, পৃথিবী এবং অন্যান্য দূরের বস্তুসমূহকে শনাক্ত করতে পারত। যদি জ্যোতির্পদার্থের বিকাশ ঘটত, নক্ষত্রদের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যেত পদার্থবিদ্যার নিয়ম হতে, কিন্তু সেগুলো হত কেবল তাত্ত্বিক গঠন। আমি কখনো কখনো ভেবে বিস্মিত হই যে, কোনো একদিন শুক্র-গ্রহের বুদ্ধিমান প্রাণীরা যদি আকাশে উড়ার প্রযুক্তি রপ্ত করে, উড়ে যায় ঘন বায়ুতে, ভেদ করে তাদের ৪৫ কিলোমিটার উপরে বিরাজমান রহস্যময় মেঘকে এবং শেষ পর্যন্ত বেরিয়ে আসে মেঘ অতিক্রম করে, তাকায় উপরের দিকে এবং প্রথমবারের মতো লক্ষ্য করে সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্রময় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে তখন তাদের প্রতিক্রিয়া কী হবে।

বিকিরণই বেশি ঘটায়। তবে শুক্রের বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাই অক্সাইড এবং জলীয় বাষ্প* অবলোহিত বিকিরণের প্রতি প্রায় পুরোপুরি অসচ্ছ, ফলে সূর্যের তাপ যথেষ্ট পরিমাণে আবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং পৃষ্ঠদেশের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়—যতক্ষণ না এই অবলোহিত বিকিরণের কিছু অংশ এই চরমভাবাপন্ন বায়ুমণ্ডল হতে ক্ষীণ ধারায় বেরিয়ে আসে যা—নিচের বায়ুমণ্ডল ও পৃষ্ঠদেশে শোষিত সূর্যালোকের সাথে ভারসাম্য নিয়ে আসে।

আমাদের প্রতিবেশী গ্রহটি নিদারুণ যন্ত্রণাদায়ক এক স্থান। তবু আমরা ফিরে যাব শুক্রে। এটি এর নিজের মতো করেই উপভোগ্য। গ্রিক এবং নর্স পুরাণে অনেক পৌরাণিক বীর নরকে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করেছেন। আমাদের এই গ্রহটি সম্বন্ধেও জানার অনেক কিছু রয়ে গেছে, নরকের সাথে তুলনা করলে যা এক স্বর্গের মতোই।

অর্ধ-মানব অর্ধ-সিংহ, স্ফিংক্স তৈরি করা হয়েছিল ৫৫০০ বছর পূর্বে। এর মুখাবয়ব একদা ছিল সতেজ এবং পরিচ্ছন্ন ভাবে উপস্থাপিত। হাজার হাজার বছর ধরে মিশরীয় মরুভূমির বালিঝড় দ্বারা এবং মাঝে মাঝে বৃষ্টি দ্বারা এটি এখন হয়ে গেছে নরম এবং অনুজ্জ্বল। নিউইয়র্ক নগরীতে 'ক্লিওপেট্রার সুচ' নামে একটি স্তম্ভ আছে, যা এসেছিল মিশর হতে। নগরীর সেন্ট্রাল পার্কে মাত্র একশত বছরে এর খোদাইসমূহ প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, কুয়াশা এবং শিল্পদূষণে—শুক্রের বায়ুমণ্ডলের রাসায়নিক ক্ষয়ের মতো। পৃথিবীর ক্ষয় ধীরে ধীরে মুছে ফেলে সব তথ্য, কিন্তু

* এখনো সামান্য অনিশ্চয়তা রয়ে গেছে শুক্রে জলীয়-বাষ্পের প্রভূতলতার ব্যাপারে। পাইওনিয়ার ভেনাস এন্ট্রি প্রোবের গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফ অনুযায়ী, নিম্ন বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ শতকরা এক ভাগের কয়েক দশমাংশের মতো। অন্যদিকে, সোভিয়েত এন্ট্রি যানবাহন ভেনেরাস-১১ এবং ১২ অনুযায়ী এর পরিমাণ শতকরা এক ভাগের এক শতাংশের মতো। যদি প্রথম মাত্রাটি গ্রহণ করা হয় তবে কার্বন ডাই অক্সাইড এবং জলীয়-বাষ্প শুক্রের পৃষ্ঠদেশ হতে প্রায় সকল তাপ বিকিরণকে আটকে দিতে সমর্থ হবে এবং শুক্রের পৃষ্ঠদেশের তাপমাত্রাকে ৪৮০°C এ ধরে রাখতে পারবে। যদি দ্বিতীয় মাত্রাটি গ্রহণ করা হয় —আমার ধারণা, এটি অপেক্ষাকৃত বিশ্বাসযোগ্য পরিমাণ—তবে, কার্বন ডাই অক্সাইড এবং জলীয়-বাষ্প পৃষ্ঠদেশের তাপমাত্রাটিকে কেবল ৩৮০°C এ ধরে রাখতে পারবে, এবং বায়ুমণ্ডলীয় গ্রিন-হাউজের অবশিষ্ট অবলোহিত কম্পাংকের বিকিরণসমূহকে ধরে রাখার জন্য প্রয়োজন পড়বে আরো কিছু বায়ুমণ্ডলীয় উপাদানের। শুক্রের বায়ুমণ্ডলে শনাক্তকৃত সামান্য পরিমাণ SO_2, CO এবং HCl-ই এই উদ্দেশ্য সাধনে সমর্থ হবে বলে মনে করা হয়। সাম্প্রতিক আমেরিকান এবং সোভিয়েত মিশনসমূহ এটি নিশ্চিত করেছে যে, পৃষ্ঠদেশের উচ্চ তাপমাত্রার কারণ হল গ্রিন-হাউজ ক্রিয়া। এটি অপেক্ষাকৃত বিশ্বাসযোগ্য পরিমাণ—তবে, কার্বন ডাই অক্সাইড এবং জলীয়-বাষ্প পৃষ্ঠদেশের তাপমাত্রাটিকে কেবল ৩৮০°C এ ধরে রাখতে পারবে, এবং বায়ুমণ্ডলীয় গ্রিন-হাউজের অবশিষ্ট অবলোহিত কম্পাংকের বিকিরণসমূহকে ধরে রাখার জন্য প্রয়োজন পড়বে আরো কিছু বায়ুমণ্ডলীয় উপাদানের। শুক্রের বায়ুমণ্ডলে শনাক্তকৃত সামান্য পরিমাণ SO_2, CO এবং HCl-ই এই উদ্দেশ্য সাধনে সমর্থ হবে বলে মনে করা হয়। সাম্প্রতিক আমেরিকান এবং সোভিয়েত মিশনসমূহ এটি নিশ্চিত করেছে যে, পৃষ্ঠদেশের উচ্চ তাপমাত্রার কারণ হল গ্রিন-হাউজ ক্রিয়া।

banglainternet.com

যেহেতু এগুলো পর্যায়ক্রমে ঘটে—বৃষ্টির ফোঁটার টুপটাপ শব্দ, বালি-কণার আঘাত—এ সকল প্রক্রিয়ার চিহ্ন হারিয়ে যেতে পারে। বিশাল কাঠামোসমূহ, যেমন পর্বতমালা, টিকে থাকে মিলিয়ন মিলিয়ন বছর ধরে ; অপেক্ষাকৃত ছোটো অভিঘাত গহ্বরগুলো, হয়ত একশত হাজার বছর ; মানুষ কর্তৃক সৃষ্ট বৃহৎ মাত্রার বস্তুসমূহ কেবল কয়েক হাজার* বছর। এমন ধীর এবং সুষম ক্ষয় ছাড়াও ধ্বংস সাধিত হয় ছোটো-বড়ো বিভিন্ন বিপর্যয়ের মাধ্যমে। স্ফিংক্সটির একটি নাক এখন আর নেই। কারো মতে, মুহূর্তের অলস অসতর্কতায় ম্যামেলিউক তুর্কিদের কেউ একজন এতে গুলি করে, অন্যরা বলেন, কোনো নেপোলিয়নীয় সৈন্য।

শুক্রগ্রহে, পৃথিবীতে এবং সৌরজগতের অন্য যে কোনো স্থানে, রয়েছে দুর্যোগমূলক ধ্বংসযজ্ঞের সাক্ষ্য, যেগুলোকে ছাপিয়ে যায় অপেক্ষাকৃত ধীরগতির ও সুষম প্রক্রিয়াগুলো : উদাহরণ স্বরূপ, পৃথিবীতে, বৃষ্টিপাত, বহমান জলধারা যা মিশে যায় নদী ও স্রোতস্বিনীসমূহের সাথে এবং সৃষ্টি করে বিশাল পাললিক অববাহিকাগুলো, মঙ্গল গ্রহে, প্রাচীন নদীসমূহের অবশিষ্টাংশ যেগুলো জেগে উঠে সম্ভবত ভূমির নিচ থেকে ; বৃহস্পতির উপগ্রহ আইও-তে, যেগুলোকে মনে হয় প্রবাহমান তরল সালফার কর্তৃক সৃষ্ট বিশাল চ্যানেলসমূহ। পৃথিবীতে—এবং শুক্র ও বৃহস্পতির উষ্ণ বায়ুমণ্ডলে রয়েছে শক্তিশালী সব আবহাওয়া ব্যবস্থা। পৃথিবী এবং মঙ্গলে রয়েছে বালিঝড় ; বৃহস্পতি, শুক্র এবং পৃথিবীতে রয়েছে বিজলিচমক। পৃথিবী ও আইও-তে আগ্নেয়গিরিগুলো বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে দেয় ধ্বংসাবশেষ। অভ্যন্তরীণ ভূ-তাত্ত্বিক প্রক্রিয়াগুলো ধীরে ধীরে শুক্র, মঙ্গল, গ্যানিমিড, ইয়োরোপা এবং এমনকি পৃথিবীরও পৃষ্ঠদেশকে বিকৃত করে ফেলে। হিমবাহসমূহ, যারা তাদের ধীরতার জন্য প্রবাদপ্রতিম, পৃথিবী এবং সম্ভবত মঙ্গলেও প্রাকৃতিক ভূ-দৃশ্যে বড়ো রকমের পরিবর্তন সাধন করে। প্রক্রিয়াসমূহের সকল কালে একই রূপ হওয়ার প্রয়োজন নেই। ইয়োরোপের বেশিরভাগ অঞ্চল একদা বরফে আচ্ছাদিত ছিল। কয়েক মিলিয়ন বছর পূর্বে শিকাগো শহরের বর্তমান স্থানটি তিন কিলোমিটার পুরু হিম-স্তরের নিচে চাপা পড়েছিল। মঙ্গল গ্রহে এবং সৌরজগতের অন্যত্র, আমরা এমন সব বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই যেগুলো আজ উৎপন্ন করা সম্ভব নয়, প্রাকৃতিক ভূ-দৃশ্যগুলো গঠিত হয়েছিল শত শত মিলিয়ন বা বিলিয়ন বছর পূর্বে, যখন গ্রহগুলোর জলবায়ু ছিল সম্ভবত খুবই ভিন্নরকম।

পৃথিবীর ভূ-দৃশ্যাবলি এবং জলবায়ু পরিবর্তনের পেছনে অতিরিক্ত একটি কারণ আছে : বুদ্ধিমান প্রাণী, পরিবেশে বড়ো রকমের পরিবর্তন সাধনে সক্ষম।

* অধিকতর সঠিকভাবে বলতে গেলে, পৃথিবীতে প্রতি ৫০০,০০০ বছরে একবার সৃষ্টি হয় ১০ কিলোমিটার ব্যাসবিশিষ্ট কোনো অভিঘাত-গহ্বর ; ইয়োরোপ এবং উত্তর আমেরিকার মতো ভূ-তাত্ত্বিকভাবে স্থিতিশীল অঞ্চলগুলোতে এর আঘাতের চিহ্ন টিকে থাকবে প্রায় ৩০০ মিলিয়ন বছর। ক্ষুদ্রাকৃতির গহ্বরগুলো সৃষ্টি হওয়ার প্রবণতা অপেক্ষাকৃত বেশি এবং এগুলো ধ্বংসও হয় দ্রুত, বিশেষত ভূতাত্ত্বিকভাবে সক্রিয় অঞ্চলসমূহে।

শুক্রের মতো, কার্বন ডাই অক্সাইড এবং জলীয়বাষ্পের কারণে পৃথিবীতেও রয়েছে একটি গ্রিন হাউজ প্রতিক্রিয়া। যদি গ্রিন হাউজ ক্রিয়া না থাকত তবে পৃথিবীর সর্বব্যাপী তাপমাত্রা হত পানির হিমাংকের নিচে। এটি সমুদ্রগুলোকে তরল রাখে এবং জীবনযাপনকে সম্ভব করে তোলে। সামান্যমাত্রার গ্রিন হাউজ ক্রিয়া একটি মঙ্গলকর বিষয়। শুক্রের মতো, পৃথিবীও ধারণ করে কার্বন ডাই অক্সাইডের ৯০ বায়ুমণ্ডল ; কিন্তু এটি অবস্থান করে চুনাপাথর ও অন্যান্য কার্বোনেটের শক্ত স্তরে, বায়ুমণ্ডলে নয়। যদি পৃথিবীটি সূর্যের আর কিছুটা নিকটে থাকত, তবে এর তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেত। এটি পৃষ্ঠদেশের শিলাখণ্ডগুলো কিছু CO_2 বের করে দিত, উৎপন্ন হত আরো শক্তিশালী গ্রিন হাউজ ক্রিয়া, যা পরবর্তীতে পৃষ্ঠটিকে আরো অধিক উত্তপ্ত করে তুলত। একটি উষ্ণতর পৃষ্ঠদেশ অধিকতর কার্বোনেটকে বাষ্পায়িত করে CO_2 তে পরিণত করত, এবং অতি উচ্চ তাপমাত্রায় সম্ভাবনা থেকে যেত ভয়াবহ গ্রিন হাউজ ক্রিয়ার। শুক্রের আদি ইতিহাসে যে রকমটি ঘটেছিল বলে আমরা মনে করি, এবং এটি ঘটেছিল সূর্যের সাথে শুক্রের নৈকট্যের কারণে। শুক্রের পৃষ্ঠদেশের তাপমাত্রা একটি সতর্কতা স্বরূপ : আমাদের নিজেদেরটির মতো যে কোনো গ্রহে ঘটে যেতে পারে চরম বিপর্যয়।

আমাদের বর্তমান যন্ত্র-সভ্যতার প্রধান শক্তি-উৎস হল তথাকথিত জীবাশ্ম-জ্বালানি। আমরা পোড়াই কাঠ এবং তেল, কয়লা এবং প্রাকৃতিক গ্যাস, এবং, এই প্রক্রিয়ায়, বায়ুতে ত্যাগ করে মূলত CO_2 এর মতো অনাবশ্যক গ্যাসসমূহ। এর ফলে, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। একটি চরম গ্রিন হাউজ ক্রিয়ার সম্ভাব্যতা এই বলে যে, আমাদের সতর্ক হওয়া উচিত : এমনকি বৈশ্বিক তাপমাত্রার এক বা দুই ডিগ্রি বৃদ্ধিও ডেকে আনবে বিপর্যয়মূলক ফলাফলসমূহ। কয়লা, তেল এবং গ্যাসোলিন পোড়ানোর মাধ্যমে আমরা বায়ুমণ্ডলে যোগ করছি সালফিউরিক এসিড। শুক্রের মতো, আমাদের স্ট্র্যাটোস্ফেয়ারে এমনকি এখনি রয়েছে যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষুদ্র সালফিউরিক এসিড কণা। আমাদের প্রধান নগরীগুলো দূষিত হয়ে গেছে ক্ষতিকর অণুসমূহ দ্বারা। আমরা আমাদের ক্রিয়াকর্মের দীর্ঘমেয়াদী ফলাফলসমূহ অনুধাবন করতে পারি না।

কিন্তু বিপরীত ধারণাতেও, জলবায়ুতে বিঘ্ন সৃষ্টি করে চলেছি। হাজার হাজার বছর ধরে মানুষেরা জ্বালানির জন্য বনসমূহকে কেটে যাচ্ছে এবং এখনো গৃহপালিত পশুদের চড়ানো তৃণাঞ্চলসমূহকে নিধন করার জন্য উৎসাহ যুগিয়ে যাচ্ছে। 'চিরে ফেলা এবং কেটে ফেলা'-র কৃষিকাজ এবং শিল্প কারখানার জন্য গ্রীষ্মকালীন বন-নিধন এবং অতি-চড়ানো আজ ক্রমশ বর্ধনশীল। কিন্তু বনাঞ্চল তৃণভূমি অপেক্ষা ঘনতর, এবং তৃণভূমি মরুভূমি অপেক্ষা ঘনতর। এর ফলে, ভূমি কর্তৃক শোষিত সূর্যালোকের পরিমাণ ক্রমশ কমছে এবং ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তনের মাধ্যমে আমরা আমাদের গ্রহের পৃষ্ঠ-তাপমাত্রা ক্রমশ কমিয়ে ফেলছি। তাপমাত্রার এই

banglainternet.com

অবনমন হয়ত পোলার আইস ক্যাপের আকৃতি বাড়িয়ে দেবে, যা উজ্জ্বল বলে পৃথিবী হতে প্রতিফলিত করবে আরো বেশি সূর্যালোক, শুরু করবে কী চরম অ্যালবেডো* ক্রিয়া ?

আমাদের মনোরম নীল গ্রহটি আমাদের জানা একমাত্র আবাসস্থল। শুক্র অতি উত্তপ্ত। মঙ্গল অতিশয় ঠাণ্ডা। কিন্তু পৃথিবী হল যথোপযুক্ত, মানুষের জন্য এক স্বর্গ। সবচেয়ে বড়ো কথা হল আমরা এখানেই বিবর্তিত হয়েছি। কিন্তু আমাদের উপযোগী জলবায়ুটি হয়ত অস্থায়ী। আমরা আমাদের হতভাগ্য গ্রহটিকে মারাত্মক ও স্ববিরোধী উপায়সমূহের মাধ্যমে বিপন্ন করে তুলছি। পৃথিবীর পরিবেশকে শুক্রের গ্রহ-নরকে বা মঙ্গলের সর্বব্যাপী বরফ-যুগের দিকে ঠেলে দেয়ার বিপদ আছে কি ? সহজ উত্তরটি হল যে, কেউ জানে না। বৈশ্বিক জলবায়ুর পর্যবেক্ষণ, অন্য গ্রহগুলোর সাথে পৃথিবীর তুলনা—এসবই এখনো এদের আদিতম পর্যায়ে রয়ে গেছে। এদের পেছনে অর্থায়ন করা হয়েছে সামান্য এবং অনিচ্ছুকভাবে। আমাদের অজ্ঞতার ভেতর দিয়ে আমরা ক্ষতি করে যাচ্ছি নিজেদের, ভূমিকে উজ্জ্বল করার জন্য দূষিত করে ফেলছি বায়ুমণ্ডলকে, এই সত্যের প্রতি অসচেতন থেকে যে, এসবের দীর্ঘ-মেয়াদি ফলাফলসমূহ যথেষ্ট অজানা।

কয়েক মিলিয়ন বছর পূর্বে, যখন পৃথিবীতে মানুষের প্রথম উদ্ভব ঘটল, এটি তখনই এক মধ্যবয়সী গ্রহ, এর যৌবনের প্রলয় এবং সংযমহীনতা হতে চলে এসেছে ৪.৬ বিলিয়ন বছর দূরে। কিন্তু আমরা মানুষেরা এখন হয়ে দাঁড়িয়েছি এক নতুন এবং হয়ত নিয়ামক চরিত্র। আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি এবং আমাদের প্রযুক্তি আমাদেরকে দিয়েছে জলবায়ুকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা। আমরা এই ক্ষমতাকে কীভাবে ব্যবহার করব ? আমরা কি কিছু বিষয়ে পুরো আমাদের সেই অজ্ঞতা ও আত্মতুষ্টিকে মেনে নিতে চাই যা সমগ্র মানব-পরিবারটিকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে ? আমরা কি স্বল্প-মেয়াদি সুবিধাগুলোকে পৃথিবীর মঙ্গলের চাইতে অধিক মূল্য দেব ? নাকি, আমরা চিন্তা করব দীর্ঘমেয়াদি ফলাফলের দৃষ্টিভঙ্গিতে, আমাদের সন্তান এবং তাদের সন্তানদেরও স্বার্থ বিবেচনা করে, আমাদের গ্রহের জটিল জীবন-রক্ষাকারী ব্যবস্থাসমূহকে উপলব্ধি ও সংরক্ষণ করে ? পৃথিবী এক ক্ষুদ্র এবং ভঙ্গুর জগৎ। এর লালন-পালনের প্রয়োজন রয়েছে।

* অ্যালবেডো হল কোনো গ্রহে আঘাতকারী সূর্যালোকের প্রতিফলিত অংশ যা শূন্যে ফিরে যায়। পৃথিবীর অ্যালবেডোর মান শতকরা ৩০ থেকে ৩৫ ভাগ। সূর্যালোকের অবশিষ্ট অংশ মাটি দ্বারা শোষিত হয় এবং এটি ভূ-পৃষ্ঠের গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য দায়ী।

পঞ্চম অধ্যায়
এক লোহিত গ্রহের জন্য নীল

দেবতাদের ফলবাগানে, তিনি লক্ষ্য করেন নালাসমূহকে...

—এনুমা এলিশ, গ্রীষ্ম,
২৫০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ।

এমন এক মানুষ যিনি কোপার্নিকাসের মতাদর্শাবলম্বী, অর্থাৎ আমাদের পৃথিবীটি হল এক গ্রহ, যা সূর্যের চারদিকে আবর্তিত হয় এবং সূর্য দ্বারা আলোকিত হয়, অন্য গ্রহগুলোর মতোই, কখনো এমন কল্পনা জাগে যে,... অবশিষ্ট গ্রহগুলোর রয়েছে তাদের নিজস্ব সাজ-সজ্জা, শুধু তা-ই নয়, সেখানকার অধিবাসীদেরও, যেমনটি রয়েছে আমাদের পৃথিবীতে...। কিন্তু সর্বদাই দক্ষ ছিলাম এই উপসংহারে পৌঁছতে যে, সেখানে প্রকৃতি কিসে সন্তুষ্ট তার অনুসন্ধান করা বৃথা, এই দেখে যে সেই অনুসন্ধানের কোনো শেষ পাওয়া যাবে না...কিন্তু কিছু আগে এই বিষয়ে গুরুত্বের সাথে ভাবতে গিয়ে (এমন নয় যে, আমি নিজেকে সেই সকল মহান মানুষদের [অতীতের] তুলনায় অধিক দ্রুত বিবেচনা করলাম, কিন্তু তাদের বেশিরভাগের পর জন্মানোর সুবিধা পেলাম) এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম না যে 'অনুসন্ধানটি' তেমন অ-অনুশীলনযোগ্য নয় বা সেই পথটিতে অসুবিধার কারণে থেমে যেতে হবে, কিন্তু সম্ভাব্য 'অনুমান'-এর জন্য চমৎকার অবস্থা ছিল।

—ক্রিশ্চিয়ান হাইগেন্স, 'গ্রহ জগৎ নিয়ে নতুন অনুমানসমূহ, তাদের অধিবাসী এবং উৎপাদনগুলো।'
১৬৯০ সাল

গল্পটি এমন যে, বহু বছর পূর্বে একজন বিখ্যাত সংবাদপত্র-প্রকাশক একজন নামি জ্যোতির্বিদের কাছে একটি টেলিগ্রাম পাঠালেন : 'মঙ্গলে প্রাণ আছে কিনা তার উপর পাঁচশত শব্দের একটি লেখা পাঠান।' জ্যোতির্বিদটি দায়িত্বপূর্ণভাবে উত্তর দিলেন : 'কেউ জানে না, কেউ জানে না, কেউ জানে না...।' ২৫০ বার।

একজন বিশেষজ্ঞ কর্তৃক এমন এক অনড় অবস্থানের দাবির মাধ্যমে অজ্ঞতার এই স্বীকারোক্তি সত্ত্বেও, কেউ কর্ণপাত করল না, এবং সেই সময় থেকে এখন পর্যন্ত, আমরা শুনতে পাই তাদের প্রভুত্বব্যঞ্জক ঘোষণা যারা মঙ্গলে প্রাণের সম্ভাবনা খোঁজেন এবং তাদের যারা এ সম্ভাবনাকে বাতিল করে দেন। কিছু লোক খুবই প্রার্থনা করেন যে, মঙ্গলে যেন প্রাণ থাকে এবং কিছু লোকের আকাঙ্ক্ষা যেন মঙ্গলে কোনো প্রাণ না থাকে। দুটো দলই খুব ভারি। এই শক্তিশালী আবেগ দ্ব্যর্থকতার

banglainternet.com

প্রতি সহনশীলতাকে যথেষ্ট কমিয়ে দিয়েছে যা বিজ্ঞানের জন্য অত্যাবশ্যক। মনে হয় এমন অনেক লোক আছে যারা স্রেফ একটি উত্তরের উদগ্রীব অপেক্ষায় আছে, যে কোনো উত্তর এবং এভাবে একই সময়ে দুটি পরস্পর বর্জনশীল সম্ভাব্যতার বোঝা মাথায় রাখাকে এড়িয়ে চলে। কিছু বিজ্ঞানী এমন সব সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বিশ্বাস করেন যে মঙ্গলে প্রাণ আছে, যেগুলো পরবর্তীতে অসারতম বলে প্রমাণিত হয়েছে। অন্যরা এই উপসংহারে পৌঁছেছেন যে, গ্রহটিতে প্রাণের কোনো অস্তিত্ব নেই, প্রাণের একটি বিশেষ প্রকাশের জন্য একটি প্রাথমিক অনুসন্ধান অসফল বা দ্ব্যর্থবোধক প্রতিপন্ন হয়েছে। লোহিত গ্রহটির ক্ষেত্রে নীলসমূহ ভূমিকা রেখেছে একাধিকবার।

কেন মঙ্গলবাসীরা? শনিবাসী বা প্লুটোবাসীদের নিয়ে নয়, মঙ্গলবাসীদের নিয়ে কেন এত বেশি নিবিড় অনুমান এবং অতি উৎসাহী অলীক কল্পনা? কারণ প্রথম দৃষ্টিতে মঙ্গলকে খুবই পৃথিবী-সদৃশ বলে মনে হয়। এটি হল নিকটতম গ্রহ যার পৃষ্ঠদেশকে আমরা দেখতে পাই। রয়েছে পোলার আইস ক্যাপ, ধাবমান সাদা মেঘ, তীব্র ধূলি-ঝড়, এর লোহিত পৃষ্ঠদেশে রয়েছে ঋতু অনুযায়ী পরিবর্তনশীল বিন্যাস, এমনকি চব্বিশ ঘণ্টার একদিন। একে একটি বসতি-পূর্ণ গ্রহ বলে ভাবার পেছনে এগুলোই প্রণোদনা। মঙ্গল হয়ে উঠেছে এক ধরনের পৌরাণিক ক্ষেত্র যার উপর আমরা আরোপ করেছি আমাদের পার্থিব আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ভয়সমূহকে। কিন্তু এর পক্ষে ও বিপক্ষে আমাদের মনস্তাত্ত্বিক প্রবণতাসমূহ যেন আমাদেরকে ভুল পথে না নিয়ে যায়। সাক্ষ্যটিই হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সাক্ষ্যটি এখনো পাওয়া যায়নি। প্রকৃত মঙ্গল হল এক বিস্ময়ের জগৎ। এর সম্বন্ধে আমাদের অতীত উপলব্ধির চাইতে এর ভবিষ্যৎ-সম্ভাবনা অনেক বেশি উৎসাহ-ব্যঞ্জক। আমাদের কালে মঙ্গলের বালি সরাতে পেরেছি, আমরা সেখানে একটি উপস্থিতি প্রতিষ্ঠা করেছি, আমরা পূর্ণ করেছি স্বপ্নের একটি শতাব্দী।

> ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ বছরগুলোতে কেউ বিশ্বাস করতে পারত না যে এই বিশ্বটিকে সূক্ষ্ম এবং নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে এমন সব বুদ্ধিমান সত্তা যারা মানুষের চাইতে শ্রেষ্ঠতর এবং তাদের মতো করে মরণশীল; অর্থাৎ মানুষ যেমন তাদের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকে, তাদেরকে তেমনি সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষণ করা হল, হয়ত তেমনি সূক্ষ্মভাবে যেমন অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা একজন মানুষ পরীক্ষণ করতে পারে সেই সব ক্ষণস্থায়ী সৃষ্টিগুলোকে যেগুলো ঝাঁক বেঁধে চলে এবং এক ফোঁটা পানির মধ্যে বংশবৃদ্ধি করতে পারে। অসীম তৃপ্তি নিয়ে মানুষ তাদের বিষয়গুলোর জন্য ছুটে বেড়াল এই ভূ-গোলকের সর্বত্র, বস্তুর উপর তাদের সাম্রাজ্যের নিশ্চয়তার প্রশান্তিতে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে ইনফিউসরিয়া সম্ভবত একই আচরণ করে। মহাশূন্যের প্রাচীনতর গ্রহগুলোতে মানুষের বিপদের উৎস সম্বন্ধে কেউ কোনো চিন্তা করল না, অথবা সেখানে প্রাণের ধারণাকে অসম্ভব বিবেচনা করে তা বাতিল করার চিন্তা করল

> না। সেই সকল সুদূর দিনের কিছু মানসিক অভ্যাস স্মরণ করাটা হবে বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। এমনকি, পার্থিব মানুষেরা কল্পনা করল যে, মঙ্গলে হয়ত রয়েছে অন্য মানুষেরা, যারা হয়ত তাদের তুলনায় হীনতর এবং একটি মিশনারি উদ্যোগকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত থাকবে। তবু মহাশূন্যের বিশাল দূরত্বে, তাদের মন আমাদের মনের প্রতি দেখাবে সেই প্রবণতা যা আমরা দেখিয়ে থাকি বিলুপ্ত প্রাণীদের প্রতি, তাদের বুদ্ধিমত্তা ব্যাপক, ধীরস্থির এবং সহানুভূতিহীন, পৃথিবীকে দেখে শত্রুর চোখে, এবং ধীরে, কিন্তু নিশ্চিতভাবেই পরিকল্পনা করে আমাদের বিরুদ্ধে।

১৮৯৭ সালে প্রকাশিত এইচ. জি. ওয়েল্‌স-এর ক্ল্যাসিক সায়েন্স ফিকশন, 'দ্য ওয়্যার অব দ্য ওয়ার্ল্ডস'-এর এই প্রথম লাইনগুলো তাদের শিকার ক্ষমতাকে বজায় রাখে আজকের দিন* পর্যন্ত। আমাদের ইতিহাসের পুরোটার মধ্যে, এমন একটি ভয় বা আশা বিরাজমান ছিল যে, পৃথিবীর বাইরে হয়ত প্রাণের অস্তিত্ব আছে। গত একশত বছরে, সেই পূর্ববোধ আমাদের দৃষ্টিকে নিবদ্ধ করেছে রাতের আকাশে আলোর এক উজ্জ্বল লাল বিন্দুতে। 'দ্য ওয়্যার অব দ্য ওয়ার্ল্ডস' প্রকাশিত হওয়ার তিন বছর পূর্বে পার্সিভাল লাওয়েল নামে একজন বোস্টোনিয়ান স্থাপন করলেন একটি গুরুত্বপূর্ণ মানমন্দির, যেখানে মঙ্গলে প্রাণের অস্তিত্বের সমর্থনে সবচেয়ে স্পষ্ট দাবি বিকশিত হয়েছিল। যুবক বয়সে সৌখিনতার বশেই লাওয়েল জ্যোতির্বিদ্যা চর্চা শুরু করেন, চলে যান হার্ভার্ডে, কোরিয়াতে নিযুক্তি পান এক আধা-সরকারি কূটনৈতিক কাজে, এবং অন্যত্র জড়িয়ে পড়েন সম্পদের সন্ধানে। ১৯১৬ সালে মৃত্যুর পূর্বে, গ্রহগুলোর প্রকৃতি ও বিবর্তন সংক্রান্ত আমাদের জ্ঞানের ক্ষেত্রে, সম্প্রসারণশীল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিরূপণের ক্ষেত্রে, এবং এক নিয়ামক উপায়ে প্লুটো গ্রহ আবিষ্কারের ক্ষেত্রে, (যার নামকরণ হয়েছিল তার নামে) তিনি অসামান্য অবদান রাখেন। প্লুটো (Pluto) নামটির প্রথম দুটি অক্ষর Percival Lowell-এর আদ্যক্ষরসমূহ। এর প্রতীক হল P, যা একটি গ্রহ সংক্রান্ত মনোগ্রাম।

কিন্তু লাওয়েলের আজীবন ভালোবাসা ছিল মঙ্গল গ্রহ। ১৮৭৭ সালে ইটালীয় জ্যোতির্বিদ গিওভান্নি স্কিয়াপ্যারেল্লি কর্তৃক মঙ্গলের ক্যানালির উপর প্রদত্ত ঘোষণায় তিনি চমকিত হয়ে উঠলেন। পৃথিবী হতে মঙ্গলের এক সুস্পষ্ট দৃশ্য গ্রহণকালে স্কিয়াপ্যারেল্লি একক এবং দ্বৈত সরলরেখাসমূহের এক জটিল নেটওয়ার্কের কথা উল্লেখ করলেন, যেগুলো আঁকাবাঁকাভাবে চলে গেছে গ্রহটির উজ্জ্বল ক্ষেত্রের উপর দিয়ে। ইটালিয়ান শব্দ 'Canali'-এর অর্থ হল চ্যানেল বা খাঁজ, কিন্তু অতি দ্রুত তা ইংরেজিতে অনূদিত হল, 'Canals' রূপে, এমন একটি শব্দ যার অর্থ হল 'বুদ্ধিদীপ্ত ডিজাইন'। মঙ্গল সংক্রান্ত এক বাতিক ছড়িয়ে পড়ল ইয়োরোপ এবং আমেরিকায়, এবং লাওয়েল নিজেকে আবিষ্কার করলেন এর তোড়ে ভেসে যেতে।

---

* ১৯৩৮ সালে, ওর্সন ওয়েলেস কর্তৃক সৃষ্ট একটি রেডিও ভার্সন, ইংল্যান্ড থেকে যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চল পর্যন্ত মঙ্গল গ্রহের বহিরাক্রমণকে প্রচার করে, এবং মিলিয়ন মিলিয়ন যুক্তরাষ্ট্রবাসী যুদ্ধ-আতংকে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল এই বিশ্বাসে যে, মঙ্গলবাসীরা প্রকৃতই আক্রমণ করবে।

banglainternet.com

১৮৯২ সালে, নিজের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসায়, স্কিয়াপ্যারেল্লি ঘোষণা করলেন যে, তিনি মঙ্গল পর্যবেক্ষণ করা ছেড়ে দেবেন। লাওয়েল সেই কাজটি করে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি চাইলেন একটি প্রথম শ্রেণীর পর্যবেক্ষণ-স্থান যা মেঘ বা নগরীর আলোসমূহ দ্বারা ব্যাঘাতগ্রস্ত হবে না এবং যার বৈশিষ্ট্য হবে চমৎকার 'দেখতে পাওয়া', একটি ধীর-স্থির বায়ুমণ্ডলের শর্ত, যার ভিতর দিয়ে কোনো দূরবীক্ষণ যন্ত্রে কোনো জ্যোতির্ভাত্ত্বিক প্রতিবিম্বের ঝিকমিক করাটা ন্যূনতম পর্যায়ে থাকে। খারাপ দেখতে পাওয়াটা উৎপন্ন হয় দূরবীক্ষণ যন্ত্রের উপর বায়ুমণ্ডলে ক্ষুদ্রমাত্রার অশান্ত অবস্থার কারণে এবং এটিই তারার ঝিকমিকের কারণ। লাওয়েল তার মানমন্দির নির্মাণ করলেন তার বাড়ি থেকে অনেক দূরে, অ্যারিজোনার* ফ্ল্যাগস্টাফের মার্স হিলে। তিনি মঙ্গলের পৃষ্ঠদেশের বৈশিষ্ট্যগুলোর চিত্র অংকন করলেন, বিশেষত ক্যানালসমূহের, যা তাকে সম্মোহিত করে ফেলল। এ জাতীয় পর্যবেক্ষণ সহজ ছিল না। অতি প্রত্যুষের হিম কনকনে ঠাণ্ডায় আপনি দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থাকুন দূরবীক্ষণ যন্ত্রে। প্রায়শই এই পর্যবেক্ষণটি হয় নিম্ন মানের এবং মঙ্গলের প্রতিবিম্বটি হয় অস্পষ্ট ও ত্রুটিযুক্ত। তখন আপনি অবশ্যই উপেক্ষা করবেন আপনি যা কিছু দেখেছেন। মাঝে মাঝে প্রতিবিম্বটি হয়ে উঠবে স্থির এবং মুহূর্তে, অদ্ভুত সুন্দরভাবে ভেসে উঠে গ্রহটির বৈশিষ্ট্যগুলো। এরপর আপনি স্মরণ করুন সানুগ্রহে আপনাকে কী দেয়া হয়েছে এবং একে সঠিকভাবে কাগজে লিপিবদ্ধ করুন। আপনার পূর্ব ধারণাসমূহ পাশেই স্থাপন করুন এবং খোলা মনে মঙ্গলের বিস্ময়সমূহ উপলব্ধি করুন।

পার্সিভাল লাওয়েলের নোট বুকসমূহ তিনি যা কিছু দেখেছেন তাদের ভাবনায় পূর্ণ : উজ্জ্বল এবং অন্ধকার অঞ্চলসমূহ, পোলার ক্যাপের একটি সংকেত, এবং ক্যানালসমূহ, ক্যানাল শোভিত এক গ্রহ। লাওয়েল বিশ্বাস করতেন যে, তিনি দেখছিলেন বিশাল সেচ পরিখাসমূহের সর্ব-বেষ্টনকারী নেটওয়ার্ক, যা গলন্ত পোলার ক্যাপগুলো হতে পানি বহন করছিল বিষুবীয় নগরীসমূহের তৃষ্ণার্ত অধিবাসীদের জন্য। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, গ্রহটিতে বাস করত অপেক্ষাকৃত প্রাচীন এবং জ্ঞানী এক প্রজাতি, হয়ত আমাদের তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, অন্ধকার অঞ্চলসমূহে ঋতুভিত্তিক পরিবর্তনগুলো ঘটত গাছপালার জন্য এবং মৃত্যুর ফলে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, মঙ্গল গ্রহটি ছিল খুবই পৃথিবী-সদৃশ। সার্বিকভাবে, তিনি খুব বেশিই বিশ্বাস করতেন।

* আইজাক নিউটন লিখলেন, 'দূরবীক্ষণ যন্ত্র তৈরির তত্ত্বটিকে যদি পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়িত করা যায়, তবু থেকে যাবে এমন কিছু সীমা যেখানে দূরবীক্ষণ যন্ত্র কাজ করতে পারবে না। কারণ, যে বায়ুর ভিতর দিয়ে আমরা তাকাই নক্ষত্রদের পানে, সেটি রয়েছে অনন্ত কম্পনের মাঝে...। একমাত্র প্রতিকার হল স্বচ্ছ ও শান্ত বায়ু, যা পাওয়া যেতে পারে উচ্চতম পর্বতগুলোর শীর্ষে, পুরু মেঘের অনেক উপরে।'

লাওয়েল সাফাই গাইলেন এমন এক মঙ্গলের যা ছিল সুপ্রাচীন, উষর এবং বিশুষ্ক এক মরু গ্রহ। তবুও এটি ছিল এক পৃথিবী-সদৃশ গ্রহ। লাওয়েলের মঙ্গল গ্রহটির এমন অনেক বৈশিষ্ট্য ছিল যেগুলোর মিল ছিল আমেরিকান সাউথওয়েস্টের বৈশেষ্ট্যের সাথে, যেখানে অবস্থিত ছিল লাওয়েল মান মন্দির। তিনি মঙ্গলের তাপমাত্রাকে কল্পনা করেন কিছুটা হিমেল বলে, কিন্তু তবুও 'ইংল্যান্ডের দক্ষিণাঞ্চল'-এর মতোই আরামপ্রদ ছিল। বায়ু ছিল হালকা, শ্বাস নেয়ার জন্য ছিল যথেষ্ট অক্সিজেন। পানি ছিল বিরল, খালসমূহের চমকপ্রদ অভিজাত নেটওয়ার্কটি সম্পূর্ণ গ্রহময় বহন করত প্রাণ-সঞ্চারী তরল।

অতীত-পর্যালোচনার মাঝে লাওয়েলের ধারণার প্রতি সবচেয়ে মারাত্মক চ্যালেঞ্জ এল এক অপ্রত্যাশিত উৎস থেকে। ১৯০৭ সালে, প্রাকৃতিক নির্বাচন দ্বারা বিবর্তনের সহ-আবিষ্কারক আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেসকে লাওয়েলের একটি বই মূল্যায়ন করতে বলা হল। তিনি যৌবনে ছিলেন একজন প্রকৌশলী এবং, সংবেদবিহীন প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয় জ্ঞানের মতো বিশ্বাসপ্রবণ বিষয়সমূহে আগ্রহ থাকলেও, মঙ্গলে বাসযাগ্যতা নিয়ে ছিলেন প্রশংসনীয় রকমের সংশয়ী। ওয়ালেস দেখালেন যে, মঙ্গলের গড় তাপমাত্রার হিসেবের ক্ষেত্রে লাওয়েল ভুল করেছিলেন ; ইংল্যান্ডের দক্ষিণাঞ্চলের মতো উষ্ণতা সম্পন্ন হওয়ার পরিবর্তে, কয়েকটি ব্যতিক্রম ব্যতীত, সর্বত্রই তাপমাত্রা ছিল পানির হিমাংকের নিচে। সেখানে থাকা উচিত এক চিরহিমায়িত অঞ্চল, ভূপৃষ্ঠের নিচে এক চিরহিমায়িত স্তর। লাওয়েল যেমনটি হিসেব করেছিলেন, বায়ু ছিল তার চাইতে অনেক হালকা। চাঁদের মতো মঙ্গলেও থাকা উচিত গহ্বরের প্রাচুর্য। খালসমূহে পানির জন্য :

> (পানির) অপ্রতুল উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করার জন্য যে কোনো প্রচেষ্টা, খালসমূহকে প্লাবিত কার মাধ্যমে বিষুব রেখা অতিক্রম করে বিপরীত গোলার্ধে চলে যাওয়ার মাধ্যমে, যেগুলো ঘটবে এমন সব মারাত্মক মরু অঞ্চলে ও মিঃ লাওয়েলের বর্ণনা মতে এমন এক আকাশে প্রকাশিত, যে তা হবে কোনো পাগলের কাজ, বুদ্ধিমান প্রাণীর নয়। এটি নিরাপদেই দাবি করা যায় যে, এমনকি এক ফোঁটা পানিও বাষ্পীভবন এড়াতে পারে না, এমনকি এর উৎস হতে একশত মাইল দূরে।

এই আলোড়ন সৃষ্টিকারী ও যথেষ্ট সঠিক ভৌত ব্যাখ্যাটি লেখা হয়েছিল ওয়ালেসের যখন চুরাশি বছর বয়স। তাঁর উপসংহার ছিল এই যে, মঙ্গলে প্রাণের অস্তিত্ব ছিল অসম্ভব, এর মাধ্যমে তিনি যেন জল-শক্তি বিজ্ঞানের ব্যাপারে একজন প্রকৌশলীর আগ্রহকেই প্রকাশ করলেন। অণুজীবগুলোর ব্যাপারে তিনি কোনো মতামত দিলেন না।

ওয়ালেসের সমালোচনা সত্ত্বেও, অন্যান্য জ্যোতির্বিদগণ লাওয়েলের মতোই চমৎকার দূরবীক্ষণযন্ত্র এবং পর্যবেক্ষণ স্থান ব্যবহার করে উপকথার মতো বর্ণিত সেই খালসমূহের কোনো অস্তিত্ব খুঁজে না পাওয়া সত্ত্বেও, সাধারণ মানুষের কাছে

www.internet.com

প্রিয় হয়ে উঠল লাওয়েলের মতামত। এর ছিল 'জেনেসিস'-এর মতোই পৌরাণিক গুণ। এর আবেদনের অংশ ছিল এই যে, ঊনবিংশ শতাব্দী ছিল প্রকৌশল উদ্ভাবনের কাল, যার অন্তর্ভুক্ত ছিল অসংখ্য খাল নির্মাণ : সুয়েজ খাল ; সম্পন্ন হয় ১৮৬৯ সালে ; করিন্থ খাল ১৮৯৩ সালে ; পানামা খাল, ১৯১৪ সালে ; ঘরের কাছেই, গ্রেট লেক লক্স, আপার নিউইয়র্ক স্টেটের বার্জ ক্যানাল্স এবং আমেরিকান সাউথ ওয়েস্টের সেচ খালসমূহ। যদি ইয়োরোপিয়ানগণ এবং আমেরিকানগণ এমন কৃতিত্বপূর্ণ কাজ সাধন করতে পারে, তবে মঙ্গলবাসীরা কেন পারবে না ? লোহিত গ্রহটির অব্যাহতভাবে শুষ্ক হয়ে পড়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামরত অপেক্ষাকৃত প্রাচীন ও জ্ঞানী প্রজাতিটি কি সেখানে আরো ব্যাপক কার্যক্রম চালাতে পারে না ?

এখন আমরা মঙ্গলের চারপাশের কক্ষপথে পাঠিয়েছি প্রাক্-পর্যবেক্ষণ উপগ্রহ। পুরো গ্রহটির মানচিত্র নেয়া হয়েছে। আমরা এর পৃষ্ঠে দুটো স্বয়ংক্রিয় গবেষণাগার অবতরণ করাতে পেরেছি। মঙ্গলের রহস্যগুলো গভীরতর হয়েছে লাওয়েলের দিনগুলো থেকে ; যদি আদৌ তা থেকে থাকে। লাওয়েলের দৃষ্ট যে কোনো দৃশ্যের চাইতে অধিকতর বিস্তারিত ছবিসমূহ দ্বারা আমরা খুঁজে পাইনি আস্ফালিত সেই ক্যানাল-নেটওয়ার্ক বা কোনো লক্। লাওয়েল, স্কিয়াপ্যারেল্লি এবং অন্যরা প্রতিকূল পরিবেশে দর্শনগ্রাহ্য পর্যবেক্ষণসমূহে ভুল পথে গিয়েছিলেন—এটি অংশত ঘটেছে মঙ্গলে প্রাণ থাকার বিশ্বাসের এক পূর্বধারণার কারণে।

পার্সিভাল লাওয়েলের পর্যবেক্ষণের নোটবুকসমূহ দূরবীক্ষণ যন্ত্র নিয়ে বহু বছর ধরে বজায় থাকা তার প্রচেষ্টাকে প্রতিফলিত করে। এগুলো এটিই প্রমাণ করে যে, খালসমূহের বাস্তবতার ব্যাপারে অন্য জ্যোতির্বিদগণ কর্তৃক প্রকাশিত সংশয়ে নিয়ে তিনি সচেতন ছিলেন। এগুলো একজন মানুষকে এমনভাবে প্রভাবিত করে যে, তিনি এক গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার সম্পন্ন করেছেন এবং দুঃখিত করে তোলে এই কারণে যে, অন্যরা এখনো এর তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারেনি। ১৯০৫ সালের তার এক নোটবুকে, উদাহরণস্বরূপ, উল্লেখিত আছে ২১ জানুয়ারির কথা : 'দ্বৈত খালসমূহ বেরিয়ে এল উজ্জ্বলতা ছড়িয়ে, যেগুলো ছিল বাস্তবতার প্রকাশ।' লাওয়েলের নোট বুক পড়ে আমার এই সুস্পষ্ট কিন্তু অস্বস্তিকর অনুভূতি হয়েছে যে, তিনি প্রকৃতই কিছু দেখছিলেন। কিন্তু কী ?

যখন কর্নেলের পল ফক্স এবং আমি লাওয়েল কর্তৃক গৃহীত মঙ্গলের মানচিত্রগুলোকে ম্যারিনার-৯-এর কক্ষপথ-চিত্রকল্পসমূহের সাথে তুলনা করলাম—কখনো কখনো লাওয়েলের পৃথিবী-বদ্ধ চব্বিশ ইঞ্চি প্রতিফলক দূরবীক্ষণ যন্ত্রের তুলনায় এক হাজার গুণ উন্নত রেজোলূশন সম্পন্ন—আমরা প্রকৃতপক্ষে কোনো পারস্পরিক সম্পর্কই পেলাম না। এমনটি নয় যে, লাওয়েলের চোখ মঙ্গলের পৃষ্ঠে কিছু বিযুক্ত সূক্ষ্ম বস্তুকে পরিণত করেছে মরীচিকাময় সরলরেখায়। তার খালগুলোর বেশিরভাগে ছিল না কোনো গাঢ় লাগ বা গহ্বর-শিকল। সেখানে আদৌ কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল না। তবে তিনি কীভাবে বছরের পর বছর ধরে এঁকে গেলেন

একই রকমের খাল ? কীভাবে অন্য জ্যোতির্বিদগণ—যাদের কেউ কেউ বললেন যে, তারা তাদের নিজ পর্যবেক্ষণগুলোর পূর্ব পর্যন্ত লাওয়েলের মানচিত্রগুলো নিবিড়ভাবে পরীক্ষা করে দেখেননি—অথচ অংকন করলেন একই রকমের খাল ? মঙ্গলে ম্যারিনার-৯ মিশনের অন্যতম উদ্ভাবন ছিল মঙ্গলের পৃষ্ঠে সময়-নির্ভর অনিয়মিত রেখার দাগ এবং প্রলেপ—যাদের অনেকগুলো অভিঘাত-গহ্বরসমূহের উঁচু অংশগুলোর সাথে সংযুক্ত ছিল—যেগুলো পাল্টে যায় ঋতু বদলের সাথে সাথে। এগুলো ঘটেছে বায়ু তাড়িত ধুলোর মাধ্যমে, বিন্যাস পাল্টে যায় ঋতুভিত্তিক বায়ু প্রবাহে। কিন্তু দাগগুলোর বৈশিষ্ট্য খালের মতো নয়, এদের অবস্থানও খালগুলোর অবস্থানে নয়, এবং এদের একটিও পৃথিবী হতে এককভাবে দৃষ্ট হওয়ার মতো যথেষ্ট বড়ো নয়। এই শতাব্দীর প্রথম কয়েকটি দশকেও মঙ্গলে লাওয়েলের খালের সাথে সামান্য সাদৃশ্যযুক্ত কিছু বৈশিষ্ট্য পাওয়া অস্বাভাবিক। মহাকাশযানসমূহের ক্লোজ-আপ অনুসন্ধান সম্ভব হওয়ার পর পরই যেগুলো কোনো চিহ্ন রেখেই অদৃশ্য হয়ে গেল।

মঙ্গলের খালসমূহ হল দেখার প্রতিকূল পরিবেশে মানুষের হাত/চোখ/মস্তিষ্কের (নিদেনপক্ষে, কিছু মানুষের জন্য ; আরো অনেক জ্যোতির্বিদ, লাওয়েলের সময়কার সমান মানসম্পন্ন যন্ত্রপাতি দ্বারা পর্যবেক্ষণ করলেন এবং পরে দাবি করলেন যে কোনো খালের অস্তিত্ব ছিল না) সমন্বয়ের ত্রুটির ফল। কিন্তু এটি মোটেই কোনো সার্বিক ব্যাখ্যা নয়, এবং আমার নিরবচ্ছিন্ন সংশয় রয়েছে যে, মঙ্গলের খাল-সমস্যার কিছু অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য এখনো রয়ে গেছে অনাবিষ্কৃত। লাওয়েল সর্বদাই বলে গেছেন যে, খালগুলোর নিয়মিত রূপ এমন এক অভ্রান্ত চিহ্ন যে এগুলো ছিল বুদ্ধিমান প্রাণী কর্তৃক সৃষ্ট। নিশ্চিতভাবেই এটি সত্য। একমাত্র অমীমাংসিত প্রশ্ন হল দূরবীক্ষণ যন্ত্রের কোনো পার্শ্বে ছিল বুদ্ধিমান সত্তাটি।

লাওয়েলের মঙ্গলবাসীরা ছিল সহৃদয় এবং আশাবাদী, এমনকি কিছুটা দেবতা-সুলভ, 'দ্য ওয়্যার অব দ্য ওয়ার্ল্ডস'-এ ওয়েল্স এবং ওয়েলেস কর্তৃক উত্থাপিত পরশ্রীকাতর ভীতিপ্রদর্শন অপেক্ষা অনেক ভিন্নরকম। ধারণাসমূহের দুটি প্রকরণই মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত হল 'রবিবাসরীয়' ক্রোড়পত্র এবং বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীর মাধ্যমে। আমার মনে পড়ে সেই শৈশবকে যখন মঙ্গল গ্রহ সংক্রান্ত এডগার রাইজ বারোজের উপন্যাসগুলো পড়তাম শ্বাসরুদ্ধকর আবেগ নিয়ে। আমি ভার্জিনিয়ার বিনম্র অভিযাত্রী, জন কার্টারের সাথে ভ্রমণ করলাম 'বার্সুম'-এ, মঙ্গল গ্রহটি যে নামে এর অধিবাসীদের কাছে পরিচিত ছিল। আমি অনুসরণ করলাম আট পা বিশিষ্ট জন্তু, থোটগুলোকে। আমি জিতে নিলাম হিলিয়ামের রাজকুমারী সুন্দরী ডেজা থোরিসের হাত। আমার বন্ধুত্ব হল চার মিটার লম্বা সবুজ গাত্রবর্ণের যোদ্ধা টার্স টার্কাসের সাথে। আমি ইতস্তত ঘুরে বেড়ালাম 'বার্সুম'-এর চূড়া সম্পন্ন নগরীগুলো ও গম্বুজ বিশিষ্ট পাম্পিং স্টেশনগুলোর মাঝে এবং নিলোসার্টিস ও নেপেন্থেস খালের শ্যামল তীর বরাবর।

banglainternet.com

এটি কি সত্যিই সম্ভব হবে—কল্পনায় নয়, বাস্তবে—জন কার্টারের সাথে মঙ্গল গ্রহের হিলিয়াম রাজ্যে ভ্রমণ করা ? আমরা কি কোন গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় 'বার্সুম'-এর দুটি উপগ্রহ দ্বারা আলোকিত পথে বেরিয়ে পড়তে পারব গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক অভিযানে ? এমনকি উপকথাখ্যাত খালগুলোর অস্তিত্বসহ মঙ্গল সম্বন্ধে লাওয়েলের সব উপসংহারই যদি অর্থহীন বলে প্রমাণিত হয়, গ্রহটিকে নিয়ে তার চিত্রায়ণের নিদেনপক্ষে এই গুণটি রয়েছে : এটি আট বছর বয়সের প্রজন্মও সৃষ্টি করল, আমি নিজেও যাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম, এবং আমরা বিবেচনা করলাম যে, গ্রহগুলোতে অভিযান চালানোর বিষয়টি ছিল এক বাস্তব সম্ভাবনা, আমরা বিস্মিত হয়ে ভাবলাম হয়ত একদিন মঙ্গল গ্রহেও অভিযান চালানো সম্ভব হবে। জন কার্টার সেখানে পৌঁছলেন এক খোলা মাঠে দাঁড়িয়ে, তার হাতগুলো প্রসারিত করে এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে। আমি স্মরণ করতে পারি আমার বাল্যকালের সেইসব দিনগুলোকে যখন খোলা মাঠে দুহাত দৃঢ়ভাবে প্রসারিত করে কাটিয়ে দিতাম ঘণ্টার পর ঘণ্টা, যেটি আমাকে মঙ্গলে বয়ে নিয়ে যাবে, এই প্রার্থনায়। তা কখনো ঘটেনি। অবশ্যই এর অন্যকোনো উপায় ছিল।

জীবসত্তার মতো, যন্ত্রেরও রয়েছে বিবর্তন। বারুদের মতো, যা রকেটকে শক্তি দান করল, সেই রকেটেরও প্রথম প্রচলন ঘটল চীনে, যেখানে এটি ব্যবহৃত হল উৎসব এবং নান্দনিক কাজে। চতুর্দশ শতাব্দীর দিকে ইয়োরোপে আমদানি হওয়ার পর এটি প্রযুক্ত হল যুদ্ধক্ষেত্রে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে রুশ স্কুল শিক্ষক কনস্ট্যান্টিন সিয়োলকোভস্কি একে বিবেচনা করলেন গ্রহসমূহে যাতায়াতের যানবাহন হিসেবে, এবং অতি উচ্চতায় নিক্ষেপ করার উপযোগী করে প্রথম একে নির্মাণ করলেন আমেরিকান বিজ্ঞানী রবার্ট গডার্ড। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জার্মান V-2 সামরিক রকেট প্রকৃত প্রস্তাবে কাজে লাগাল গডার্ডের উদ্ভাবনসমূহকেই এবং ১৯৪৮ সালে V-2/WAC কর্পোরেল সমন্বয়ের দুই-স্তর উৎক্ষেপনের মাধ্যমে এটি পৌঁছল এর শীর্ষ অবস্থানে, যার নিক্ষেপণ উচ্চতা ছিল ৪০০ কিলোমিটার যেটি তখনকার দিনে ছিল নজিরবিহীন। সোভিয়েত ইউনিয়নের সের্গেই করোলভ এবং যুক্তরাষ্ট্রের ভন ব্রন কর্তৃক ১৯৫০ সালে সম্পন্ন প্রকৌশল অগ্রগতি ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ সাধনের উপযোগী অস্ত্রের পেছনে অর্থ বিনিয়োগ ঘটাল, যা প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ নির্মাণের কারণ হিসেবে কাজ করল। উন্নতির গতি এগিয়ে চল অবিশ্বাস্য দ্রুততায় : নির্দিষ্ট কক্ষপথে পরিক্রমণশীল মনুষ্যবাহী যান ; মানুষ ঘুরল কক্ষপথে, অতঃপর অবতরণ করল চাঁদে ; এবং সৌর জগতের সর্বত্র বহির্মুখী মনুষ্যহীন মহাকাশযান-সমূহ। এখন আরো অনেক দেশ উৎক্ষেপণ করেছে মহাকাশযান, এর মধ্যে রয়েছে ব্রিটেন, ফ্রান্স, কানাডা, জাপান এবং চীন, সেই সমাজ যারা প্রথমস্থানিক হিসেবে আবিষ্কার করে রকেট।

সিয়োলকোভস্কি এবং গডার্ড (যিনি যৌবনেই পাঠ করেছিলেন ওয়েল্‌স এবং উদ্দীপ্ত হয়েছিলেন পার্সিভাল লাওয়েলের বক্তৃতামালা দ্বারা) সব মহাকাশ রকেটের

আদি প্রয়োগসমূহের মাঝে যেগুলোর কথা কল্পনা করেছিলেন তার মধ্যে ছিল অতি উঁচু কোনো স্থান থেকে পৃথিবীকে পর্যবেক্ষণ করা এবং মঙ্গলে প্রাণের অনুসন্ধানের জন্য কক্ষপথে পরিক্রমনশীল একটি বৈজ্ঞানিক স্টেশন। এ দুটো স্বপ্নই এখন পূরণ হয়েছে।

নিজেকে কল্পনা করুন অন্যকোনো এক অজানা গ্রহ হতে আগত এক পরিব্রাজক রূপে, যে কোনো পূর্বধারণা ছাড়াই এগিয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর দিকে। আপনি যতই এর নিকটবর্তী হবেন তত বেশি সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্যে উন্মোচিত হয়ে গ্রহটি সম্বন্ধে আপনার দৃষ্টিভঙ্গির উন্নতি ঘটতে থাকবে। গ্রহটি কি বসতিপূর্ণ ? কিসের ভিত্তিতে আপনি সিদ্ধান্ত নেবেন ? যদি বুদ্ধিমান প্রাণী থেকে থাকে, তবে তারা হয়ত নির্মাণ করেছে এমন সব প্রকৌশল-কাঠামো যাদের থাকবে কয়েক কিলোমিটার লম্বা যন্ত্রাংশ, কাঠামোগুলো শনাক্তযোগ্য হবে তখনই যখন আমাদের আলোক ব্যবস্থা এবং পৃথিবী হতে দূরত্ব প্রদান করবে কিলোমিটার রেজোলূশন। এমনকি সূক্ষ্মতার এই পর্যায়েও পৃথিবীকে মনে হয় শূন্য। নেই কোনো প্রাণের চিহ্ন, বুদ্ধিমান বা অন্য যে কোনো রকম, ওয়াশিংটন, নিউইয়র্ক, বোস্টন, মস্কো, লন্ডন, প্যারিস, বার্লিন, টোকিও এবং পিকিং—কোথাও নেই। যদি পৃথিবীতে বুদ্ধিমান প্রাণী থেকে থাকে, তারা ভূ-দৃশ্যাবলিকে কিলোমিটার রেজোলূশন নিয়মিত জ্যামিতিক বিন্যাসে রূপান্তরিত করার ক্ষেত্রে খুব একটা অগ্রসর হয়নি।

কিন্তু যখন আমরা রেজোলূশন দশগুণ উন্নত করব, তখন পরিস্থিতি পাল্টাতে শুরু করে। পৃথিবীর অনেক স্থান হঠাৎ স্ফটিকের মতো মনে হয়, প্রকাশ করে বর্গক্ষেত্র, আয়তক্ষেত্র, সরল রেখা এবং বৃত্তের এক জটিল বিন্যাস। প্রকৃতপক্ষে, এগুলো হল বুদ্ধিমান প্রাণীদের প্রকৌশল-নির্মাণ : সড়ক, মহাসড়ক, খাল, কৃষি জমি, নগরীর রাস্তাসমূহ—এমন এক সজ্জা যা ইউক্লিডিয় জ্যামিতি এবং ভূখণ্ডের প্রতি মানুষের জন্মজ আবেগকে উন্মোচিত করে। এই স্কেলে বুদ্ধিমান প্রাণী চিহ্নিত করা যেতে পারে বোস্টন, ওয়াশিংটন এবং নিউইয়র্কে। দশ মিটার রেজোলূশন, যে মাত্রায় ভূ-দৃশ্যগুলো নিয়ে কাজ করা হয়েছে তা প্রকৃতই প্রথমবারের মতো স্পষ্ট হয়ে উঠে। মানুষকে দেখা যায় সদা ব্যস্ত রূপে। এই ছবিগুলো তোলা হয়েছে দিবালোকে। কিন্তু গোধূলিতে বা রাতে, দৃশ্যমান হয়ে উঠে অন্যকিছু : লিবিয়া এবং পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে তেল কূপের আগুন ; গভীর জলে আলো ছড়িয়ে ধীরে চলমান জাপানি মাছ ধরার নৌবহর ; বিশাল নগরীগুলোর উজ্জ্বল আলো। কিন্তু যদি দিবালোকে আমরা আমাদের রেজোলূশনকে এতটা উন্নত করতে পারি যে, বস্তুসমূহকে একশত মিটার দূরত্বে দেখা সম্ভব হয় তখন আমরা প্রথমবারের মতো শনাক্ত করতে শুরু করি স্বতন্ত্র জীবসত্তাসমূহ—তিমি, গোরু, ফ্লেমিংগো, মানুষ।

পৃথিবীতে বুদ্ধিদীপ্ত জীবন প্রথম নিজেকে প্রকাশ করল নির্মাণের জ্যামিতিক শৃঙ্খলার মাধ্যমে। যদি লাওয়েলের ক্যানাল-নেটওয়ার্ক প্রকৃতই থেকে থাকত, তবে

banglainternet.com

এই উপসংহার টানা যেত যে, মঙ্গলে বুদ্ধিমান প্রাণীর বাস করাটা ছিল অবধারিত। কারণ ছবির মাধ্যমে মঙ্গলে প্রাণের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হলে, এমনকি মঙ্গলের কক্ষপথ থেকেও, তবে এটি মঙ্গল-পৃষ্ঠের অবশ্যই বড়ো রকম পরিবর্তন সাধন করে থাকবে। কারিগরি সভ্যতা, খাল নির্মাণ, অবশ্যই সহজে শনাক্তযোগ্য। কিন্তু একটি বা দুটি বিভ্রান্তিকর বৈশিষ্ট্য ব্যতীত, মনুষ্যবিহীন মহাকাশযান কর্তৃক উন্মোচিত মঙ্গলের পৃষ্ঠের অপরূপ সুন্দরের প্রাচুর্যের মাঝে তেমন কিছু প্রতীয়মান হয় না। যদিও, অন্য অনেক সম্ভাবনা রয়েছে, বিশাল বৃক্ষ ও জীবজন্তু থেকে শুরু করে অণুজীব পর্যন্ত, বিলুপ্ত রূপ পর্যন্ত, এমন এক গ্রহ পর্যন্ত যা এখন এবং সর্বদাই প্রাণহীন। যেহেতু মঙ্গল পৃথিবীর তুলনায় সূর্য থেকে অধিকতর দূরে, এর তাপমাত্রা তুলনামূলকভাবে কম। এর বায়ু হালকা, যাতে মূলত রয়েছে কার্বন ডাই অক্সাইড, কিন্তু রয়েছে সামান্য পরিমাণ আণবিক নাইট্রোজেন এবং আর্গন এবং খুব সামান্য পরিমাণে জলীয় বাষ্প, অক্সিজেন এবং ওজোন। তরল পানি থাকাটা অসম্ভব, কারণ মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলীয় চাপ এমনকি ঠাণ্ডা পানিকেও স্ফুটন থেকে নিবারণ করার জন্য যথেষ্ট কম। মাটির রন্ধ্র এবং কৈশিক ছিদ্রসমূহে খুব সামান্য পরিমাণে তরল পানি থাকতে পারে। অক্সিজেনের পরিমাণ মানুষের শ্বাস নেয়ার তুলনায় আরো নগণ্য। ওজোনের পরিমাণ এত কম যে, সূর্য হতে জীবাণুনাশক অতিবেগুনি বিকিরণ মঙ্গলের পৃষ্ঠকে বিনাবাধায় আঘাত করতে পারে। এমন একটি পরিবেশে কোনো প্রাণীসত্তা কি টিকে থাকতে পারে ?

এই প্রশ্নের উত্তর জানার জন্য, অনেক বছর আগে আমার সহকর্মীরা এবং আমি এমন প্রকোষ্ঠ তৈরি করলাম যেগুলো তখনকার দিনে জ্ঞাত মঙ্গলের পরিবেশকে উপস্থাপন করল, তাদেরকে পূর্ণ করলাম পার্থিব অণুজীব দ্বারা এবং অপেক্ষা করলাম কোনোটি বেঁচে থাকে কিনা জানার জন্য। এরূপ প্রকোষ্ঠকে অবশ্যই বলা হত 'মঙ্গল পাত্র।' 'মঙ্গল পাত্র'গুলো তাপমাত্রার এমন এক চক্র মেনে চলল যা মঙ্গলের পাল্লাকে মেনে চলল, মধ্যবেলায় পানির হিমাংকের সামান্য বেশি হতে ভোরের সামান্য পূর্বে-৮০°C পর্যন্ত, এক অক্সিজেনবিহীন বায়ুমণ্ডল যা মূলত CO_2 এবং N_2 দ্বারা গঠিত। অতিবেগুনি আলোক উৎস উৎপন্ন করল ভয়ংকর সৌর ফ্লাক্স। প্রতিটি আলাদা বালিকণাকে সিক্ত করার জন্য অতি পাতলা স্তর ব্যতীত সেখানে কোনো তরল পানি বিরাজ করত না। কিছু অণুজীব জমে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল প্রথম রাতের পরই এবং আর কখনো তাদেরকে খুঁজে পাওয়া গেল না। অন্যগুলো শ্বাসরুদ্ধ হয়ে এবং অক্সিজেনের অভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। কিছু মারা গেল তৃষ্ণায় এবং কিছু ছাই হয়ে গেল অতিবেগুনি রশ্মি দ্বারা। কিন্তু সর্বদাই এমন কিছু পার্থিব অণুজীব ছিল যেগুলোর অক্সিজেন প্রয়োজন পড়ত না, যেগুলো তাপমাত্রা খুব কমে গেলে নিজেদেরকে ক্ষণস্থায়ীভাবে গুটিয়ে নিত ; নুড়ি বা বালির পাতলা স্তরের নিচে লুকিয়ে আত্মরক্ষা করত অতিবেগুনি রশ্মি থেকে। অন্যান্য পরীক্ষাসমূহে, যখন বিদ্যমান থাকত সামান্য পরিমাণ পানি, অণুজীবগুলো প্রকৃতই

বেড়ে উঠত। যদি পার্থিব অণুজীবগুলো মঙ্গলের পরিবেশে টিকে থাকতে পারে, তবে মঙ্গলের অণুজীবগুলো মঙ্গলে আরো বেশি ভালো করবে, অবশ্য যদি এরা আদৌ থেকে থাকে। কিন্তু প্রথমত আমাদেরকে সেখানে যেতে হবে।

সেভিয়েত ইউনিয়ন গ্রহ-অনুসন্ধানের জন্য মনুষ্যবিহীন অভিযানমালা কার্যকর রেখেছে। প্রতি এক বা দুই বছরে গ্রহসমূহের আপেক্ষিক অবস্থানগুলো এবং কেপলার ও নিউটনের পদার্থবিদ্যা ন্যূনতম শক্তি খরচের মাধ্যমে মঙ্গল বা শুক্রে মহাকাশযান উৎক্ষেপণের প্রেক্ষাপট তৈরি করে। ১৯৬০-এর দশকের প্রথম দিক থেকে U. S. S.R এমন সুযোগ খুব কমই অপচয় করেছে। সোভিয়েত ধৈর্য এবং প্রকৌশল-দক্ষতার বিনিময়ে দিয়েছেও যথেষ্ট। ভেনেরাস ৮ হতে ১২ পর্যন্ত, পাঁচটি সোভিয়েত মহাকাশযান—অবতরণ করেছে মঙ্গলে এবং সাফল্যের সাথে এর পৃষ্ঠ হতে পাঠিয়েছে তথ্যাবলি, এমন একটি উত্তপ্ত, ঘন এবং ক্ষয়িষ্ণু গ্রহের ক্ষেত্রে এটি কোনো সামান্য কৃতিত্ব নয়। এতগুলো প্রচেষ্টার পরও সোভিয়েত ইউনিয়ন কখনো সাফল্যের সাথে মঙ্গলে অবতরণ করতে পারেনি—এমন এক স্থান, কমপক্ষে প্রথম দৃষ্টিতে হলেও, হিমেল তাপমাত্রা, অপেক্ষাকৃত পুরু বায়ুমণ্ডল এবং অধিক অনুকূল গ্যাসসমূহ, পোলার আইস ক্যাপস, পরিষ্কার গোলাপি আকাশ, বিশাল বালিয়াড়ি, প্রাচীন নদী গর্ভ, পৃষ্ঠদেশে ফাটলের ফলে সৃষ্ট বিশাল উপত্যকা, এখনো পর্যন্ত আমাদের কাছে জ্ঞাত সৌর জগতের বৃহত্তম আগ্নেয়গিরির গঠন, এবং স্নিগ্ধ বিষুবীয় গ্রীষ্মের বিকেলসহ যাকে মনে হয় অপেক্ষাকৃত অতিথিবৎসল বলে। এটি শুক্রের তুলনায় অনেক বেশি পৃথিবী-সদৃশ।

১৯৭১ সালে, সোভিয়েত মার্স-৩ মহাকাশযান প্রবেশ করল মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলে। স্বয়ংক্রিয়ভাবে পাঠানো বেতার তথ্যানুসারে, প্রবেশের সময় এটি সাফল্যের সাথে ছড়িয়ে দেয় এর অবতরণ ব্যবস্থাকে, এর অপসারণ শিল্ডকে সঠিকভাবে স্থাপন করল নিচের দিকে, যথাযথভাবে মেলে দিল এর বিশাল প্যারাস্যুটকে এবং এর অবতরণ পথের প্রায় শেষ প্রান্তে প্রজ্বলিত করল এর রেট্রো-রকেটগুলোকে। মার্স-৩ কর্তৃক পাঠানো তথ্য অনুযায়ী এটি সম্ভবত সাফল্যের সাথেই অবতরণ করেছিল লোহিত গ্রহটিতে। কিন্তু অবতরণের পর মহাকাশযানটি পৃথিবীতে পাঠাল বিশ সেকেন্ডের একটি বৈশিষ্ট্যহীন টেলিভিশন-চিত্রের খণ্ডাংশ এবং অতঃপর রহস্যময়ভাবে ব্যর্থ হল। ১৯৭৩ সালে, অবিকল একইরকম ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল মার্স-৬ এর ক্ষেত্রে, এই ক্ষেত্রে ব্যর্থতাটি ঘটল মঙ্গলের পৃষ্ঠ-স্পর্শের এক সেকেন্ডের মধ্যে। কী ভুল হয়েছিল ?

মার্স-৩ এর প্রথম কোনো চিত্র আমি দেখি একটি সোভিয়েত ডাক টিকেট (একক, ১৬ কোপেক), যাতে দেখানো হয়েছে যে, মহাকাশযানটি একধরনের রক্তবর্ণ জঞ্জালের ভিতর দিয়ে অবতরণ করছে। আমি মনে করি, শিল্পীটি ধূলো এবং প্রবল বায়ুকে চিত্রায়িত করার চেষ্টা করেছিলেন : মার্স-৩ মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করেছিল এক মারাত্মক ধূলিঝড়ের সময়। যুক্তরাষ্ট্রের ম্যারিনার-৯ মিশন হতে

banglainternet.com

আমরা জানতে পারি যে, সেই ঝড়ে নিকট-পৃষ্ঠের বায়ুর বেগ ছিল ১৪০কি. মি./সে.—মঙ্গলে শব্দের বেগের অর্ধেকের চাইতেও বেশি। আমাদের সোভিয়েত সহকর্মী এবং আমরা উভয়ই, চিন্তা করলাম যে, এই প্রবল বায়ুতে আক্রান্ত হয় অবমুক্ত প্যারাসুটের মার্স-৩ মহাকাশযানটি, ফলে এটি অবতরণ করে উল্লম্ব দিকে, কিন্তু অনুভূমিক দিকেও ছিল বিপজ্জনক গতি। কোনো বিশাল প্যারাসুটের আচ্ছাদনে অবতরণরত কোনো মহাকাশযান অনুভূমিক বায়ু স্রোতের সামনে খুবই ভঙ্গুর। অবতরণের পর মার্স-৩ হয়ত কয়েকবার ঝাঁকুনি খেয়েছে, আঘাত করেছিল কোনো শিলাখণ্ডে বা মঙ্গলের অন্যকোনো বস্তুতে, উল্টে যায়, একে বহনকারী 'bus'-এর সাথে বেতার সংযোগ হারিয়ে ফেলে এবং ব্যর্থ হয়।

কিন্তু মার্স-৩ কেন প্রবেশ করল চরম ধূলিঝড়ের মাঝে ? উৎক্ষেপণের পূর্বে মার্স-৩ মিশন সুসংগঠিতভাবে পরিচালনা করা হয়েছিল। যে সকল ধাপ এর অতিক্রম করার কথা ছিল, পৃথিবী ত্যাগের পূর্বেই সেগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় কম্পিউটারে। কম্পিউটার প্রোগাম পরিবর্তন করার কোনো সুযোগ ছিল না, এমনকি ১৯৭১ সালের প্রবল মরু ঝড়ের সীমা পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার পরও। মহাকাশ অভিযানের ভিড়ে মার্স-৩ মিশনটি ছিল পূর্ব প্রোগ্রামভুক্ত, অভিযোজিত নয়। মার্স-৬-এর ব্যর্থতাটি ছিল আরো বেশি রহস্যময়। যখন এই মহাকাশযানটি মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করেছিল তখন গ্রহময় কোনো ঝড় ছিল না এবং কোনো স্থানীয় ঝড়কে সন্দেহ করার কোনো কারণ নেই, অবতরণ স্থানে যা কখনো কখনো ঘটে থাকে। সম্ভবত মঙ্গল-পৃষ্ঠকে স্পর্শ করার মুহূর্তে ঘটেছিল কোনো প্রকৌশল-ব্যর্থতা। অথবা মঙ্গলের পৃষ্ঠে হয়ত রয়েছে বিশেষভাবে বিপজ্জনক কোনো কিছু।

শুক্রে অবতরণের ক্ষেত্রে সোভিয়েত সাফল্য এবং মঙ্গলে অবতরণের ক্ষেত্রে সোভিয়েত ব্যর্থতার সমন্বয়টি স্বাভাবিকভাবেই আমাদেরকে ভাবিয়ে তুলল যুক্তরাষ্ট্রের ভাইকিং মিশন সম্বন্ধে ; অনানুষ্ঠানিকভাবে মঙ্গলের পৃষ্ঠে যার অবতরণের তারিখ স্থির হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিশত বার্ষিকীতে, ১৯৭৬ সালের ৪ জুলাইয়ে। ভাইকিং অবতরণের প্রক্রিয়াটিও এর সোভিয়েত পূর্বসূরিদের মতো গ্রহণ করল অপসারণ শিল্ড, একটি প্যারাসুট এবং রেট্রো-রকেটসমূহ। যেহেতু পৃথিবীর তুলনায় মঙ্গলের বায়ুমণ্ডল মাত্র ১% ঘনত্ব সম্পন্ন, তাই আঠারো মিটার ব্যাসের একটি প্যারাসুট জুড়ে দেয়া হল মহাকাশযানটির সাথে, যখন এটি মঙ্গলের হালকা বায়ুতে প্রবেশ করবে তখন এর গতি কমিয়ে দেয়ার জন্য। বায়ুমণ্ডলটি এতই হালকা যে, ভাইকিং যদি কোনো উঁচু স্থানে অবতরণ করত তবে অবতরণটিকে ঠিকভাবে সম্পন্ন করার জন্য গতি হ্রাসের উপযোগী যথেষ্ট ঘন বায়ুমণ্ডল সেখানে পাওয়া যেত না : এটি বিধ্বস্ত হয়ে যেত ! তাই অবতরণের জন্য প্রয়োজন ছিল একটি নিচু এলাকার। ম্যারিনার-৯ এর ফলাফল এবং ভূমি-ভিত্তিক রাডার পর্যবেক্ষণসমূহ হতে আমরা এরূপ অনেক এলাকাকে জানতাম।

মার্স-৩ এর সম্ভাব্য পরিণতি এড়ানোর জন্য আমরা চাইছিলাম যে, ভাইকিং কোনো এক সময়ে এমন একটি স্থানে অবতরণ করুক যেখানে বায়ুর বেগ প্রবল নয়। যে বায়ুস্রোত অবতরণের সময় মহাকাশযানটিকে বিধ্বস্ত করতে পারে, সম্ভবত তা মঙ্গলের পৃষ্ঠদেশ হতে ধুলো-বালি উড়িয়ে নেয়ার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী। যদি আমরা পরীক্ষা করতে পারতাম যে সম্ভাব্য অবতরণ-স্থলটি কোনো ধাবমান ধুলোবালিতে আচ্ছাদিত নয়, তবে আমাদের পক্ষে অন্তত এটুকু নিশ্চয়তা দেয়ার সুযোগ থাকত যে, বায়ুপ্রবাহ অসহনীয় রকমের তীব্র নয়। প্রতিটি ভাইকিং ল্যান্ডার যে কারণগুলোর জন্য মঙ্গলের কক্ষপথে সাথে নিয়ে যেত অর্বিটার এটি তার অন্যতম এবং অর্বিটারটি অবতরণ স্থলটির সার্বিক পরীক্ষা সম্পন্ন না করার পূর্ব পর্যন্ত অবতরণের বিলম্ব ঘটানো হত। ম্যারিনার ৯-এর সাহায্যে আমরা আবিষ্কার করেছিলাম যে, তীব্র বায়ুপ্রবাহের সময় মঙ্গলের পৃষ্ঠদেশের উজ্জ্বল এবং অন্ধকার সজ্জাগুলোর বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ঘটে। যদি অর্বিটাল আলোকচিত্রগুলো এরূপ পরিবর্তনশীল সজ্জা প্রদর্শন করত তবে আমরা ভাইকিং-এর কোনো অবতরণ স্থলকে অবশ্যই নিরাপদ বলে ছাড়পত্র দিতাম না। কিন্তু আমাদের নিশ্চয়তাগুলো শতকরা একশত ভাগ বিশ্বাস-যোগ্য হতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, আমরা এমন কোনো অবতরণ স্থল কল্পনা করতে পারতাম যেখানে বায়ুস্রোত এত শক্তিশালী যে, সকল সচল ধুলো বালি এরই মধ্যে তাড়িত হয়ে গেছে। তখন সেখানে বিদ্যমান তীব্র বায়ুস্রোতের কোনো ইঙ্গিত পাওয়ার উপায় আমাদের থাকত না। পৃথিবীর তুলনায় মঙ্গলের আবহাওয়ার বিস্তারিত পূর্বাভাস অবশ্যই অপেক্ষাকৃত কম বিশ্বাসযোগ্য। (প্রকৃতপক্ষে ভাইকিং মিশনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল উভয় গ্রহের আবহাওয়া সম্বন্ধে আমাদের উপলব্ধিকে উন্নত করা।)

যোগাযোগ এবং তাপমাত্রাগত সীমাবদ্ধতার কারণে ভাইকিং মঙ্গলের উঁচু অক্ষাংশে অবতরণ করতে পারেনি। উভয় গোলার্ধে ৪৫ বা ৫০ ডিগ্রি অপেক্ষা আরো মেরুমুখী, হয় পৃথিবীর সাথে মহাকাশযানটির কার্যকরি যোগাযোগের সময়কার বা মহাকাশযানটি যে সময়কালে বিপজ্জনক রকমের নিম্ন তাপমাত্রা এড়িয়ে চলছে তার অতি স্বল্পতার কারণে।

আমরা খুব বন্ধুর কোনো স্থানে অবতরণ আশা করিনি। এতে মহাকাশযানটি উল্টে যেতে বা বিধ্বস্ত হয়ে যেতে পারত বা নিদেন-পক্ষে, মঙ্গলের ভূমির নমুনা সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত যান্ত্রিক বাহুটি হয়ত খুলে যেত বা ভূমি হতে এক মিটার উপরে অসহায়ভাবে নড়তে থাকত। একইভাবে, আমরা খুব নরম কোনো স্থানেও অবতরণ চাইনি। যদি মহাকাশযানের তিনটি অবতরণ-যন্ত্র নরম মাটিতে ডেবে যায় গভীরভাবে, তবে অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটতে থাকবে, নমুনা সংগ্রহের বাহুটির অচল হয়ে পড়াসহ। কিন্তু আমরা এমন কোনো অবতরণ-ক্ষেত্রও চাইছিলাম না যা খুব শক্ত—উদাহরণস্বরূপ, আমরা যদি পাউডার সদৃশ পৃষ্ঠ-বস্তুকণাবিহীন কোনো কঠিন ও ভঙ্গুর লাভা-ক্ষেত্রে অবতরণ সম্পন্ন করতাম, তবে

BanglaInternet.com

যান্ত্রিক বাহুগুলো কোনো নমুনা সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হত, যা রসায়ন ও জীববিজ্ঞানের পরীক্ষণের জন্য ছিল অতি গুরুত্বপূর্ণ।

তখন মঙ্গলের প্রাপ্ত সবচেয়ে উৎকৃষ্ট আলোকচিত্রসমূহ—যেগুলো সংগৃহীত হয়েছিল ম্যারিনার-৯ অর্বিটার দ্বারা—৯০ মিটার (১০০ গজ) প্রশস্ততার চাইতে কম মাপের কোনো কিছু দেখাতে পারেনি। ভাইকিং অর্বিটারের আলোকচিত্রগুলো এর সামান্যই উন্নতি ঘটিয়েছিল। এক মিটার (তিন ফুট) আকৃতির শিলাখণ্ডগুলো এরূপ আলোকচিত্রসমূহে ছিল সম্পূর্ণভাবে অদর্শনযোগ্য, এবং ভাইকিং ল্যান্ডারের জন্য বয়ে আনতে পারত ভয়ংকর পরিণতি। একইভাবে, কোনো গভীর, নরম পাউডার আলোকচিত্রের সাহায্যে চিহ্নিত করা সম্ভব ছিল না। সৌভাগ্যক্রমে, এমন একটি পদ্ধতি ছিল যার সাহায্যে আমরা সম্ভাব্য অবতরণ স্থলের রুক্ষতা বা কোমনীয়তা নির্ণয় করতে সমর্থ হতাম : রাডার। খুব রুক্ষ কোনো স্থান রাডারকে বিক্ষিপ্ত করে দিত পৃথিবী হতে আলোক রশ্মির দিকে এবং এর ফলে নিম্নমানের প্রতিফলন পাওয়া যায়, যা রাডার-অন্ধকার। ধূলিকণাসমূহের মধ্যবর্তী চিড়সমূহের কারণে খুব নরম স্থানও নিম্নমানের প্রতিফলন প্রদর্শন করে। যখন আমরা রুক্ষ স্থান এবং কোমল স্থানের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে পারতাম না, অবতরণ স্থলের জন্য এত বিশেষত্ব আরোপ করা হত না। আমরা জানতাম, উভয়ই ছিল বিপজ্জনক। প্রাথমিক রাডার অনুসন্ধান থেকে বুঝা গিয়েছিল যে, মঙ্গলের পৃষ্ঠের এক বিরাট অংশ ছিল রাডার-অন্ধকার। এবং সে কারণে ভাইকিং-এর জন্য ছিল বিপজ্জনক। কিন্তু পৃথিবী-ভিত্তিক রাডার দ্বারা মঙ্গলের সব কিছু দৃষ্ট হতে পারে না—কেবল ২৫° উত্তর এবং ২৫° দক্ষিণের মধ্যবর্তী এক সামান্য অংশ। মঙ্গলের পৃষ্ঠের মানচিত্র তৈরির জন্য ভাইকিং-এর অর্বিটার নিজের সাথে কোনো রাডার বহন করেনি।

ছিল অনেক সীমাবদ্ধতা—হয়ত আমরা একটু বেশি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। আমাদের অবতরণ-স্থলটি যেন খুব উঁচু, খুব বায়ু প্রবাহ আক্রান্ত, খুব শক্ত, খুব নরম, খুব রুক্ষ বা মেরুর খুব কাছাকাছি না হয়। এটি উল্লেখযোগ্য যে, মঙ্গলে এমন কোনো স্থান ছিল না যা আমাদের সব নিরাপত্তা-শর্ত পূরণ করতে পারত। কিন্তু এটি পরিষ্কার ছিল যে, নিরাপদ স্থানের জন্য অনুসন্ধান আমাদেরকে এমন এক অবতরণ-স্থল প্রদান করল যেগুলো মোটের উপর ছিল সাদামাটা।

যখন ভাইকিং অর্বিটার-ল্যান্ডার সমন্বয় দুটির প্রতিটি মঙ্গলের কক্ষপথে প্রবিষ্ট হল, এটি মঙ্গলের একটি নির্দিষ্ট অক্ষাংশে অবতরণ করতে অপরিবর্তনীয়ভাবে বাধ্য ছিল। কক্ষপথের নিম্ন বিন্দুটি যদি মঙ্গলের ২১° উত্তর অক্ষাংশে হত, তবে ল্যান্ডার স্পর্শ করতে পারত ২১° উত্তরকে, যদিও গ্রহটি এর নিচে ঘুরে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে এটি যেকোনো দ্রাঘিমাংশেও অবতরণ করতে পারত। এভাবে ভাইকিং বিজ্ঞানী-দল সম্ভাব্য অক্ষাংশগুলো এমনভাবে নির্বাচন করল যেন একাধিক অনুকূল অবস্থান থাকে। ভাইকিং-১ এর জন্য লক্ষ্য স্থির করা হল ২১° উত্তরকে। প্রধান অবস্থানটি ছিল খ্রাইস ('স্বর্ণ ক্ষেত্র'-এর গ্রিক প্রতিশব্দ) নামক এক অঞ্চলে চারটি আঁকাবাঁকা

জল ধারার সঙ্গমস্থলের নিকটে যেগুলো মঙ্গলের ইতিহাসের পূর্ববর্তী যুগসমূহে প্রবাহমান জলস্রোতের দ্বারা সৃষ্টি হয়েছিল বলে ধরা হয়। খ্রাইস অবস্থানটি সম্ভবত সকল নিরাপত্তা-শর্ত পূর্ণ করতে পারত। প্রথমবারের মতো খ্রাইসের রাডার পর্যবেক্ষণ সম্পন্ন করা হল—পৃথিবী ও মঙ্গলের জ্যামিতিক বৈশিষ্ট্যের কারণে—নামমাত্র অবতরণ তারিখের কেবল কয়েক সপ্তাহ পূর্বে।

ভাইকিং-২ এর জন্য সম্ভাব্য অবতরণ-অক্ষাংশ ছিল ৪৪° উত্তর ; প্রধান অবস্থানটি ছিল সাইডোনিয়া নামক একটি স্থান। এটি এ কারণে নির্বাচিত হয়েছিল যে, কিছু তাত্ত্বিক মতামতের কারণে, সেখানে সামান্য পরিমাণ পানি থাকার যথেষ্ট সুযোগ ছিল, অন্তত মঙ্গল-বর্ষের কোনো এক সময়ে। যেহেতু ভাইকিং-এ জীব বিজ্ঞান সংক্রান্ত পরীক্ষণসমূহ উল্লেখযোগ্যভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছিল তরল পানিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধকারী প্রাণীসত্তাগুলোকে চিন্তা করে, তাই কিছু বিজ্ঞানী ভেবেছিলেন যে, ভাইকিং-এর পক্ষে সাইডোনিয়াতে প্রাণের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট পরিমাণে বেশি। অপরদিকে, ভিন্ন মত পোষণ করে বলা হল যে, মঙ্গলের মতো ঝঞ্ঝাময় কোনো গ্রহে কোনো স্থানে যদি অণুজীব থাকে তবে তা এর সর্বত্রই বিরাজ করবে। মনে হল দুটি মতামতই বুদ্ধিদীপ্ত এবং এদের কোনো একটিকে নির্বাচন করা কঠিন হয়ে পড়ল। তবে যা পরিষ্কার ছিল তা হল এই যে, ৪৪° উত্তর রাডার অবস্থান-নিশ্চয়তার জন্য অভিগম্য ছিল না ; যদি ভাইকিং-২-এর জন্য উচ্চ উত্তর-অক্ষাংশ অনুমোদন করা হত তবে ব্যর্থতার যথেষ্ট ঝুঁকিকে গ্রহণ করে নিতে হত। কখনো কখনো মতামত দেয়া হত যে, যদি ভাইকিং-১ নিচে ভালো কাজ করতে পারে, তবে আমরা ভাইকিং-২ কে নিয়ে অপেক্ষাকৃত বেশি ঝুঁকি গ্রহণ করতেই পারি। আমি নিজে অবশ্য একটি বিলিয়ন-ডলারের মিশনের পরিণতির ব্যাপারে রক্ষণশীল অবস্থান গ্রহণ করি। উদাহরণস্বরূপ, আমি কল্পনা করছিলাম সাইডোনিয়াতে দুর্ভাগ্যজনক বিধ্বস্ত-অবতরণের পর খ্রাইসে ব্যর্থতাকে। ভাইকিং-এর জন্য বিভিন্ন বিকল্পের উন্নতি সাধনের জন্য, খ্রাইস এবং সাইডোনিয়ার তুলনায় ভূতাত্ত্বিকভাবে অত্যন্ত ভিন্ন রকমের অতিরিক্ত অবতরণ-ক্ষেত্র নির্বাচন করা হল ৪° দক্ষিণ অক্ষাংশের নিকটবর্তী অঞ্চলে, যেগুলো রাডার কর্তৃক অনুমোদিত ছিল। ভাইকিং ২ উচ্চ না নিম্ন অক্ষাংশে অবতরণ করবে সে ব্যাপারে ততক্ষণ কার্যত একেবারে শেষ মিনিটের পূর্ব পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নেয়া গেল না, যতক্ষণ না সাইডোনিয়ার একই অক্ষাংশে ইউটোপিয়া নামে একটি আশাসঞ্চারী স্থান নির্বাচন করা হল।

অর্বিটার আলোকচিত্রমালা এবং ভূমিভিত্তিক রাডার উপাত্ত পরীক্ষা করার পর ভাইকিং-১ এর জন্য মূল অবতরণ ক্ষেত্রটিকে মনে হল অগ্রহণযোগ্য রকমের ঝুঁকিপূর্ণ। কিছুক্ষণের জন্য আমরা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলাম এই ভেবে যে, ভাইকিং-১ বিপন্ন হয়ে পড়েছে, সেই প্রবাদপ্রতিম ফ্লায়িং ডাচম্যানের মতো, যে চিরকাল মঙ্গলের আকাশময় বিক্ষিপ্তভাবে ঘুরে বেড়াবার পরও কখনো খুঁজে পায়নি নিরাপদ স্বর্গ। শেষপর্যন্ত, আমরা একটি স্থান খুঁজে পেলাম, খ্রাইসের মধ্যেই কিন্তু চারটি

banglainternet.com

প্রাচীন জলধারার সঙ্গমস্থল হতে কিছুটা দূরে। বিলম্বটি আমাদেরকে ১৯৭৬ সালের ৪ জুলাই-এ অবতরণ থেকে বিরত রাখল, কিন্তু সাধারণভাবে এটি গৃহীত হল যে, যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিশত বার্ষিকীতে একটি বিধ্বস্ত-অবতরণ কোনোক্রমেই সন্তোষজনক হতে পারে না। ভাইকিং ১ কক্ষপথ থেকে নেমে এল এবং ষোল দিন পর মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করল।

দেড় বছরের আন্তঃগ্রহ যাত্রাময় সূর্যের চারদিকে একশত মিলিয়ন কিলোমিটারের দীর্ঘ পথ পাড়ি দেয়ার পর প্রতিটি অর্বিটার/ল্যান্ডার সমন্বয় এর সঠিক কক্ষপথে স্থাপিত হল ; অর্বিটারগুলো পরীক্ষণ করল সম্ভাব্য অবতরণ-ক্ষেত্রগুলোকে ; ল্যান্ডারগুলো বেতার নির্দেশের সাহায্যে প্রবেশ করল মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলে এবং সঠিকভাবে স্থাপন করল অপসারণ-শিল্পগুলোকে, ছড়িয়ে দিল প্যারাসুটসমূহকে, সরিয়ে নিল আচ্ছাদনগুলো, এবং ক্রিয়াশীল হল রেট্রো-রকেটগুলো। খ্রাইস এবং ইউটোপিয়াতে, মানব ইতিহাসে প্রথমবারের মতো লোহিত গ্রহটিকে মৃদুভাবে এবং নিরাপদে স্পর্শ করল মহাকাশযান। এই বিজয়ী অবতরণের অন্যতম কারণ ছিল ডিজাইন, নির্মাণ-কৌশল ও পরীক্ষণের ক্ষেত্রে চরম দক্ষতা এবং মহাকাশযান নিয়ন্ত্রকগুলোর সামর্থ্য। কিন্তু মঙ্গলের মতো বিপজ্জনক এবং রহস্যময় গ্রহের ক্ষেত্রে ন্যূনতম সৌভাগ্যের সহায়তারও প্রয়োজন ছিল।

অবতরণের পর পরই, প্রথম ছবিগুলো পাঠানোর কথা ছিল। আমরা জানতাম যে, আমরা নির্বাচন করেছি সম্ভাবনাহীন স্থানগুলোকে। কিন্তু আমরা আশাবাদী থাকলাম। ভাইকিং ১ কর্তৃক গৃহীত প্রথম ছবিটি ছিল এর নিজেরই কোনো একটি ফুট-প্যাডের—যদি এটি মঙ্গলের কোনো চোরাবালিতে ডুবে যায় সেই ক্ষেত্রে মহাকাশযানটি নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার পূর্বেই আমরা তা জানতে চেয়েছিলাম। রেখার পর রেখা ধরে ছবিটি গঠিত হল, যতক্ষণ না প্রবল প্রশান্তির মাঝে আমরা ফুট-প্যাডটিকে মঙ্গলের পৃষ্ঠের উঁচুতে এবং শুষ্কাবস্থায় বসতে দেখলাম। এর কিছুক্ষণ পরই অন্যান্য ছবিসমূহ আসতে শুরু করল, প্রতিটি ছবির তথ্য বেতার তরঙ্গের মাধ্যমে আলাদাভাবে আসল পৃথিবীতে।

আমি স্মরণ করতে পারছি যে, প্রথম ল্যান্ডার বিম্বে প্রদর্শিত মঙ্গলের দিগন্ত দেখে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। আমি ভাবলাম, এটি কোনো ভিন্ন গ্রহ নয়। আমি কলোরাডো, অ্যারিজোনা এবং নেভাদাতে এরূপ স্থানকে জানতাম। সেখানে ছিল শিলাখণ্ড এবং বালি ঝড়, এবং পৃথিবীর ভূ-দৃশ্যাবলির মতো প্রাকৃতিক কোনো সুদূর উচ্চ ভূমির এলাকা। মঙ্গল ছিল একটি স্থান। অবশ্যই, আমি বিস্মিত হতাম যদি দেখতাম যে বালিয়াড়ির পেছন থেকে কোনো ধূসর খচ্চর জেগে উঠছে, কিন্তু একই সময়ে ধারণাটিকে যথার্থও মনে হল। শুক্রের পৃষ্ঠ সংক্রান্ত ভেনেরা-৯ এবং ১০ কর্তৃক গৃহীত ছবিগুলো পরীক্ষা করার সময় এমন সুদূর কোনো কিছু আমার মনে প্রবেশ করেনি। আমি জানতাম, কোনো একভাবে এটি ছিল সেই জগৎ যেখানে আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে।

ভূ-দৃশ্যগুলো ছিল কঠিন, লাল এবং মনোরম : দিগন্তের কোথাও অগ্নিগিরির জ্বালামুখ সৃষ্টির সময় স্থানচ্যুত শিলাখণ্ড, ক্ষুদ্র বালিয়াড়ি, ধাবমান ধূলো দ্বারা কখনো আচ্ছাদিত কখনো বা অনাচ্ছাদিত সব টিলা, বায়ু দ্বারা বাহিত সূক্ষ্ম ধূলোবালির চূড়া। শিলাখণ্ডগুলো কোত্থেকে এসেছিল ? বায়ু দ্বারা কতটুকু বালি বাহিত হয়েছিল ? শিলাখণ্ডগুলো, মাটির নিচে চাপা-পড়া স্থানচ্যুত পাথরগুলো এবং ভূমির উপর বহুভুজ আকৃতির বাটালি সদৃশ গঠনগুলো সৃষ্টির ক্ষেত্রে গ্রহটির পূর্ব-ইতিহাস কী ছিল ? শিলাখণ্ডগুলো কিসের তৈরি ? বালির মতো পদার্থ দ্বারা ? বালিগুলো কি স্রেফ শিলা বা অন্যকিছুর গুঁড়া ? আকাশটি কেন গোলাপি ? বায়ুর উপাদানসমূহ কী কী ? বাতাসের গতি কিরূপ ? মঙ্গলে কি ভূমিকম্প হয় ? ঋতু চক্রের সাথে বায়ুমণ্ডলীয় চাপ এবং ভূ-দৃশ্যাবলির কেমন পরিবর্তন ঘটে ?

ভাইকিং এই প্রশ্নগুলোর প্রতিটির সুনির্দিষ্ট বা অন্ততপক্ষে আপাতগ্রাহ্য উত্তর দিয়েছে। ভাইকিং মিশন কর্তৃক উন্মোচিত মঙ্গল গ্রহটি প্রবল আগ্রহ-সঞ্চারী—বিশেষত আমরা যখন স্মরণ করি যে, এর অবতরণ স্থলটি ছিল সাদামাটা। কিন্তু ক্যামেরাতে ধরা পড়ল না খাল-নির্মাণের কোনো চিহ্ন, কোনো বার্সোমিয়ান এয়ারকার বা ছোটো তরবারি, কোনো রাজকুমারী বা যোদ্ধা, কোনো পদচিহ্ন, এমনকি কোনো ক্যাক্টাস বা ক্যাঙ্গারু ইঁদুর। ফলে তখন পর্যন্ত আমরা বুঝতে পারলাম যে, প্রাণের* কোনো চিহ্ন ছিল না।

হয়ত মঙ্গলে ছিল বিশাল প্রাণী-রূপ, কিন্তু সেগুলো আমাদের অবতরণ ক্ষেত্রসমূহে নয়। হয়ত প্রতিটি শিলাখণ্ড এবং বালিকণাতেই রয়েছে ক্ষুদ্র আকৃতির প্রাণী-সত্তা। কারণ, এর ইতিহাসের বেশিরভাগ অংশ জুড়ে, পৃথিবীর যে সকল অঞ্চল পানিতে আচ্ছাদিত ছিল না, সেগুলোকে আজকের মঙ্গলের মতোই দেখায়—যার বায়ুমণ্ডল কার্বন ডাই অক্সাইডে সমৃদ্ধ, ওজোনবিহীন বায়ুমণ্ডল ভেদ করে পৃষ্ঠদেশে নেমে আসছে অতিবেগুনি রশ্মি। পৃথিবীর ইতিহাসের শেষ ১০% সময়ের পূর্বে বিকাশ লাভ করেনি বিশাল বৃক্ষ বা পশু। এবং তথাপি তিন বিলিয়ন বছর ধরে পৃথিবীর সর্বত্র বিরাজ করে আসছে অণুজীবসমূহ। মঙ্গলে প্রাণের সন্ধান করতে হলে আমাদেরকে অণুজীবই সন্ধান করতে হবে।

ভাইকিং ল্যান্ডার মানুষের সামর্থ্যকে বিস্তৃত করেছে ভিন্ গ্রহের ভূ-দৃশ্যাবলি পর্যন্ত। কিছু মানদণ্ডে এটি ফড়িং-এর মতোই সচল, অন্য মানদণ্ডে, কেবল একটি ব্যাক্টেরিয়ামের মতো বুদ্ধিমান। এই তুলনার মধ্যে হেয় করার মতো কিছু নেই।

* অতি অল্পক্ষণের জন্য বয়ে গেল স্নায়বিক চাঞ্চল্য যখন মঙ্গলের একটি অনুমিত লিখন, বড়ো হাতের B অক্ষরটিকে ক্রাইসের একটি ক্ষুদ্র বুত্তারে দৃশ্যমান হয়ে উঠল বলে মনে হল। কিন্তু পরবর্তী বিশ্লেষণ থেকে জানা যায় যে, এটি ছিল আলো-ছায়ার একটি কৌশল এবং বিন্যাস শনাক্তকরণে মানুষের প্রতিভা। এটিকেও উল্লেখযোগ্য বলে মনে হয় যে, মঙ্গলবাসীরা হয়ত বুঝতে পারত ল্যাটিন অক্ষর। কিন্তু এমন একটি মুহূর্ত এল যখন আমি পুনর্বার শুনতে পেলাম আমার বালাকালের একটি শব্দের প্রতিধ্বনি—বার্সুম।

banglainternet.com

একটি ব্যাক্টেরিয়াম সৃষ্টি করতে প্রকৃতির লেগেছিল শত শত মিলিয়ন বছর আর একটি ফড়িং সৃষ্টি করতে লেগে গিয়েছিল বিলিয়ন বিলিয়ন বছর। এরকম কাজে খুব সামান্য অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও আমরা এতে যথেষ্ট দক্ষ হয়ে উঠছি। আমাদের মতো ভাইকিং-এরও রয়েছে দুটো চোখ, কিন্তু আমরা না পারলেও এরা কাজ করতে পারে অতিবেগুনি রশ্মির মাঝে ; এর একটি বাহু ঠেলে দিতে পারে শিলাখণ্ডগুলোকে, খনন করতে পারে এবং সংগ্রহ করতে পারে মাটির নমুনা ; এর রয়েছে এমন এক ধরনের আঙুল যা বাতাসের বেগ এবং দিক নির্ণয় করতে পারে ; রয়েছে এক ধরনের নাক এবং স্বাদ-যন্ত্র, যেগুলোর সাহায্যে আমাদের চাইতেও সূক্ষ্মভাবে, শনাক্ত করার অনুগুলোর উপস্থিতি বুঝতে পারে ; একটি অভ্যন্তরীণ শ্রবণ-যন্ত্র যার সাহায্যে এটি বুঝতে পারে মঙ্গলের ভূ-কম্পনের গুড় গুড় শব্দ এবং বাতাসের তোড়ে মহাকাশ যানটির মৃদু কেঁপে উঠা ; এবং রয়েছে অণুজীব শনাক্ত করার একটি উপায়। মহাকাশ যানটির রয়েছে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ তেজস্ক্রিয় শক্তির উৎস। এটি এর গৃহীত সকল বৈজ্ঞানিক তথ্যসমূহকে বেতার তরঙ্গের মাধ্যমে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেয়। এটি পৃথিবী হতে নির্দেশমালা গ্রহণ করে, ফলে মানুষেরা ভাইকিং ফলাফলের তাৎপর্য বিবেচনা করতে পারে এবং মহাকাশ যানটিকে নতুন কিছু করতে বলে।

কিন্তু আকৃতি, খরচ এবং শক্তির প্রয়োজনের সীমাবদ্ধতার কারণে মঙ্গলে অণুজীব অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম উপায় কী হতে পারে ? আমরা এখনো এমনকি একজন অণুজীব-বিজ্ঞানীকেও পাঠাতে পারি না। নিউইয়র্কে, ইউনিভার্সিটি অব রোচেস্টারে একদা ওল্‌ফ ভিশনিয়াক নামক আমার এক অসাধারণ অণুজীব-বিজ্ঞানী বন্ধু ছিল। ১৯৫০ এর দশকের শেষদিকে, যখন আমরা সবেমাত্র মঙ্গলের প্রাণের অনুসন্ধান নিয়ে গুরুত্বের সাথে ভাবতে শুরু করেছিলাম, তিনি এক সম্মেলনে একজন জ্যোতির্বিদ কর্তৃক প্রকাশিত এই বিস্ময়কর তথ্যের মুখোমুখি হলেন যে, অণুজীব অনুসন্ধানের জন্য জীববিজ্ঞানীদের কোনো সাধারণ, বিশ্বস্ত ও স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র নেই। ভিশনিয়াক সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তিনি এ ব্যাপারে কিছু একটা করবেন।

তিনি গ্রহগুলোতে পাঠানোর জন্য একটি ক্ষুদ্র যন্ত্র তৈরি করলেন। তার বন্ধুরা একে 'ওল্‌ফ ট্র্যাপ' বলত। এটি মঙ্গলে নিয়ে যাবে পুষ্টিকর জৈব পদার্থের এক ক্ষুদ্র শিশি, সেখানে এর সাথে মেশানো হবে মঙ্গলের মাটির নমুনা এবং মঙ্গলের কোনো ক্ষুদ্র কীট (যদি আদৌ তা থেকে থাকে) জন্ম নেয়া (যদি তারা নেয়)-র সাথে লক্ষ করা হবে তরলের পরিবর্তনশীল অস্বচ্ছতা বা মেঘাচ্ছন্নতা। ভাইকিং ল্যান্ডারে অন্য তিনটি অণুজীব পরীক্ষণের সাথে 'ওল্‌ফ ট্র্যাপ'কেও নির্বাচিত করা হল। অন্য তিনটি পরীক্ষণের মধ্যে দুটিই মঙ্গলের প্রাণীদের জন্য খাদ্য পাঠাল। 'ওল্‌ফ ট্র্যাপ'-এর সাফল্যের জন্য প্রয়োজন ছিল যে, মঙ্গলের কীটগুলো যেন তরল পানি পছন্দ করে। এমন অনেকেই ছিলেন যারা ভেবেছিলেন যে, ভিশনিয়াক ক্ষুদ্র মঙ্গল-

প্রাণীদেরকে কেবল ডুবিয়ে দেবেন। কিন্তু ওল্‌ফ ট্র্যাপের সুবিধা ছিল এই যে, মঙ্গলের অণুজীবগুলো এদের খাদ্যের সাথে কী করবে সে ব্যাপারে এর কোনো শর্ত ছিল না। তাদের কেবল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ারই প্রয়োজন ছিল। অন্য সব পরীক্ষণ সেই গ্যাসগুলোকে নিয়ে বৈজ্ঞানিক স্বীকার্য তৈরি করল যেগুলো অণুজীবগুলো কর্তৃক হয় বর্জিত বা গৃহীত হবে, এই স্বীকার্যগুলো অনুমানের চাইতে অধিক কিছু ছিল।

'দ্য ন্যাশনাল অ্যারোনটিক্স এন্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন', যা যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ কর্মশালা পরিচালনা করে, প্রায়শই অননুমেয় রকমের বাজেট কর্তনের শিকার হয়। অপ্রত্যাশিত বাজেট বৃদ্ধি সেখানে খুবই বিরল। সরকারের ভিতর থেকে নাসার বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকলাপের প্রতি কার্যকর সমর্থন খুবই কম, এবং যখন নাসার অর্থ কর্তনের প্রয়োজন পড়ে তখন বৈজ্ঞানিক কর্মশালাগুলো হয়ে পড়ে সহজ শিকার। ১৯৭১ সালে সিদ্ধান্ত নেয়া হল যে, চারটি অণুজীব পরীক্ষণের যে কোনো একটি বন্ধ করে দিতে হবে, তখন 'ওল্‌ফ ট্র্যাপ' পরীক্ষণ বন্ধ করে দেয়া হল। এটি ভিশনিয়াকের জন্য ছিল এক চরম হতাশা, যিনি এটি তৈরি করতে গিয়ে হারিয়ে ফেলেছেন তার বারটি বছর।

তার স্থলে থাকলে হয়ত অনেকেই ভাইকিং জীববিজ্ঞান দল থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতেন। কিন্তু ভিশনিয়াক ছিলেন একজন বিনয়ী এবং ত্যাগী মানুষ। উল্টো, তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তিনি পৃথিবীর সবচেয়ে মঙ্গল-সদৃশ পরিবেশগুলোতে অভিযাত্রা করে মঙ্গলে প্রাণের অনুসন্ধানে সর্বোত্তম উপায়ে সাহায্য করবেন—যেমন অ্যান্টার্কটিকার শুষ্ক উপত্যকাগুলোতে অভিযাত্রা। পূর্বতন কিছু পরিদর্শক অ্যান্টার্কটিকার ভূমিরূপ পরীক্ষা করেছেন এবং সিদ্ধান্ত নেন যে, যে অল্প সংখ্যক অণুজীব তারা দেখতে পেয়েছেন সেগুলো প্রকৃতপক্ষে শুষ্ক উপত্যকাগুলোর স্থায়ী বাসিন্দা ছিল না, বরং এরা অন্যসব অপেক্ষাকৃত অনুকূল পরিবেশ থেকে বাহিত হয়ে এসেছিল। মঙ্গলের জার পরীক্ষণগুলোকে স্মরণ করে, ভিশনিয়াক বিশ্বাস করতেন যে, প্রাণ ছিল ধৈর্যশীল এবং অণুজীবগুলোর জন্য অ্যান্টার্কটিকা ছিল যথার্থভাবেই উপযোগী। তিনি ভাবলেন যে, যদি পার্থিব কীটগুলো মঙ্গলে বেঁচে থাকতে পারে তবে তা অ্যান্টার্কটিকাতে কেন সম্ভব নয়—যা সার্বিকভাবে ছিল উষ্ণতর, সিক্ততর এবং যেখানে ছিল অধিকতর অক্সিজেন এবং অনেক কম অতিবেগুনি রশ্মি। বিপরীত-ক্রমে, তিনি ভাবলেন যে, অ্যান্টার্কটিকার শুষ্ক উপত্যকাগুলোতে প্রাণের অস্তিত্ব পাওয়া গেলে, তা মঙ্গলে প্রাণের উপস্থিতির সম্ভাব্যতা বাড়িয়ে তুলবে। ভিশনিয়াক বিশ্বাস করতেন যে, অ্যান্টার্কটিকাতে কোনো স্বকীয় অণুজীব না পাওয়ার পেছনে যেসব পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছিল সেগুলো ছিল ত্রুটিপূর্ণ। কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের অণুজীব গবেষণাগারের আরামপ্রদ পরিবেশে যেসকল পুষ্টিকর দ্রব্য উপযোগী ছিল, সেগুলোকে অনুর্বর মেরুর নিষ্ফলা জমির উপযোগী করা হয়নি।

banglainternet.com

তাই, ১৯৭৩ সালের ৮ নভেম্বরে, ভিশনিয়াক, তার নতুন অণুজীব যন্ত্র এবং এক ভূতত্ত্ববিদ সহচরকে হেলিকপ্টারযোগে ম্যাক মুর্ডো স্টেশন থেকে নিয়ে যাওয়া হল অ্যাসগার্ড রেঞ্জের শুষ্ক উপত্যকা মাউন্ট ব্যাল্ডারের নিকটবর্তী এক অঞ্চলে। তার কাজ ছিল অ্যান্টার্কটিকার মাটিতে ক্ষুদ্র অণুজীব স্টেশনগুলো প্রোথিত করা এবং তাদেরকে ফিরে পাওয়ার জন্য প্রায় এক মাস পর ফিরে আসা। ১৯৭৩ সালের ১০ ডিসেম্বর নমুনা সংগ্রহ করার জন্য তিনি গেলেন মাউন্ট ব্যাল্ডারে ; তার বিদায় আলোকচিত্রে ধরা পড়েছিল প্রায় তিন কিলোমিটার দূর থেকে। এটিই ছিল শেষ সময় যখন কেউ তাকে জীবিতাবস্থায় দেখেছিল। আঠারো ঘণ্টা পর তার মৃতদেহ আবিষ্কৃত হল খাড়া এক বরফের পাহাড়ের পাদদেশ থেকে। তিনি এমন এক স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, যেখানে আগে আর কেউ কখনো যায়নি, মনে হয় তিনি বরফে পা পিছলে পড়ে গিয়েছিলেন এবং ১৫০ মিটার দূরত্ব ধরে আছড়ে গেলেন। হয়ত তার দৃষ্টিতে কিছু একটা ধরা পড়েছিল, হয়ত অণুজীবদের জন্য এক সম্ভাব্য বাসস্থান বা কোনো সবুজের চিহ্ন, যেখানে কেউ ছিল না। আমরা কখনো জানতে পারব না। সেই দিন তিনি তার সাথে যে ছোটো বাদামি নোট বুকটি নিয়েছিলেন সেটির শেষ লেখাগুলো ছিল এরূপ, 'স্টেশন ২০২ ফিরে পাওয়া গেছে। ১০ ডিসেম্বর, ১৯৭৩। ২২৩০ ঘণ্টা। ভূমি তাপমাত্রা,-১০°। বায়ু তাপমাত্রা-১৬°।' এটি ছিল মঙ্গলের এক বৈশিষ্ট্য-সূচক গ্রীষ্ম-তাপমাত্রা।

ভিশনিয়াকের অণুজীব স্টেশনের অনেকগুলো এখনো রয়ে গেছে অ্যান্টার্কটিকাতে। প্রাপ্ত নমুনাসমূহকে পরীক্ষা করা হল তার পদ্ধতিগুলোর সাহায্যে, তার পেশাজীবনের সহকর্মী এবং বন্ধুগণ কর্তৃক। অণুজীবসমূহের এক বিশাল বৈচিত্র্য পাওয়া গেল পরীক্ষিত প্রতিটি স্থানে, যেগুলোকে প্রচলিত স্কোরিং পদ্ধতিতে শনাক্ত করা সম্ভব ছিল না। বাহ্যত শুধুমাত্র অ্যান্টার্কটিকাতেই দৃষ্ট এক নতুন প্রজাতির ছত্রাক আবিষ্কৃত হল তার বিধবা পত্নী হেলেন সিম্পসন ভিশনিয়াক কর্তৃক, তারই নমুনাসমূহে। সেই অভিযাত্রায় অ্যান্টার্কটিকা থেকে নিয়ে আসা হল বিশাল সব শিলাখণ্ড, পরীক্ষিত হল ফ্রিডম্যান কর্তৃক, প্রমাণিত হল যে এদের রয়েছে এক বিস্ময়কর অণুজীববিজ্ঞান—শিলাখণ্ডগুলোর এক বা দুই মিলিমিটার নিচে শৈবালগুলো অধিবাস ছড়িয়েছে এক ক্ষুদ্র জগতে যেগুলোর মধ্যে আটকা পড়েছে সামান্য পানি এবং পরিণত হয়েছে তরলে। মঙ্গলে এমন একটি স্থান হয়ে উঠবে আরো আকর্ষণীয়, কারণ সালোক সংশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় দৃশ্যমান আলো যখন সেই গভীরতায় পৌছবে তখন জীবাণুনাশক অতিবেগুনি রশ্মির কমপক্ষে আংশিকভাবে হলেও লাঘব ঘটবে।

যেহেতু উৎক্ষেপণের বহুবছর পূর্বেই মহাকাশ মিশনের ডিজাইন চূড়ান্ত করা হয় এবং যেহেতু মৃত্যু ঘটেছিল ভিশনিয়াকের, মঙ্গলে প্রাণের অনুসন্ধানের জন্য ভাইকিং-এর ডিজাইনের উপর তার অ্যান্টার্কটিকা পরীক্ষণসমূহ কোনো প্রভাব ফেলল না। সাধারণভাবে, মঙ্গলের নিম্ন তাপমাত্রায় অণুজীব পরীক্ষণসমূহ করা হল

না, এবং বেশিরভাগ বিজ্ঞানী অনুকূল পরিবেশে বিকাশ লাভের জন্য দীর্ঘ সময় প্রদান করলেন না। তারা সকলেই মঙ্গলে বিপাক ক্রিয়ার সম্বন্ধে যথেষ্ট শক্তিশালী স্বীকার্য ধরে নিলেন। শিলাখণ্ডের অভ্যন্তরে প্রাণের অনুসন্ধানের কোনো উপায় ছিল না।

প্রতিটি ভাইকিং ল্যান্ডারে জুড়ে দেয়া হত একটি নমুনা-বাহু যা ভূমি হতে বিভিন্ন নমুনা সংগ্রহ করত এবং অতঃপর এটি ধীরে ধীরে সরে যেত মহাকাশ যানটির অভ্যন্তরে, একটি বৈদ্যুতিক ট্রেনের মতো নমুনাসমূহকে বয়ে নিয়ে যেত ক্ষুদ্র চোঙ্গায়, পাঁচটি ভিন্ন পরীক্ষণের জন্য : ভূমির অজৈব রসায়নের উপর, আরেকটি হল ধূলো-বালিতে জৈব অণু অনুসন্ধানের জন্য, এবং তৃতীয়টি ছিল অণুজীব-প্রাণের সন্ধানে। যখন আমরা কোনো গ্রহে প্রাণের অনুসন্ধান করি, আমরা কতকগুলো স্বীকার্য মেনে নেই। আমরা চেষ্টা করি, আমরা তেমনটি পারি, এরূপ স্বীকার্য না ধরতে যে, অন্য কোথাও প্রাণের রূপ পৃথিবীর প্রাণের রূপের মতো হবে। কিন্তু আমরা কী করতে পারি তারও সীমা রয়েছে। আমরা কেবল এখানকার প্রাণ সম্বন্ধেই বিস্তারিত জানি। ভাইকিং-এর জীববিজ্ঞান পরীক্ষণসমূহ হল প্রথম পথিকৃৎ প্রচেষ্টা, তবুও, এগুলো মঙ্গলে প্রাণের সুনির্দিষ্ট অনুসন্ধানকে খুব সামান্যই উপস্থাপন করতে পারে। ফলাফলগুলো প্রলোভন সৃষ্টিকারী, বিরক্তিকর, প্ররোচনামূলক, উদ্দীপক, এবং, অতিসম্প্রতির পূর্ব পর্যন্ত, যথেষ্ট উপসংহারবিহীন।

তিনটি অণুজীববিজ্ঞান পরীক্ষণের প্রতিটিই একটি করে ভিন্ন রকমের প্রশ্ন উত্থাপন করল, কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই ছিল মঙ্গলে বিপাক সংক্রান্ত একটি প্রশ্ন। মঙ্গলের ভূমিতে যদি অণুজীব থেকে থাকে, তবে তারা অবশ্যই খাদ্য গ্রহণ করে এবং ছেড়ে দেয় অপ্রয়োজনীয় বর্জ্য গ্যাসসমূহ ; অথবা এরা বায়ুমণ্ডল থেকে গ্রহণ করে বিভিন্ন গ্যাস এবং সম্ভবত সূর্যালোকের সহায়তায় এদেরকে পরিণত করে ব্যবহারযোগ্য উপাদানে। তাই আমরা মঙ্গলে নিয়ে আসি খাদ্য এবং আশা করি যে, মঙ্গলবাসীরা, এতে স্বাদ খুঁজে পাবে, অবশ্য তারা যদি আদৌ থেকে থাকে। অতঃপর আমরা লক্ষ্য করি যে, ভূমি থেকে অভিনব গ্যাস বেরিয়ে আসে কি না। অথবা আমরা প্রদান করি আমাদের নিজস্ব তেজস্ক্রিয়ভাবে বিবেচিত গ্যাসসমূহকে এবং পর্যবেক্ষণ করে দেখি যে, এরা কোনো জৈব পদার্থে পরিণত হয় কিনা, যে সকল ক্ষেত্রে মঙ্গলের ক্ষুদ্র প্রাণীগুলোকে বিবেচনা করা হয়।

উৎক্ষেপণের পূর্বে প্রদর্শিত বৈশিষ্ট্যগুলোর কারণে ভাইকিং তিনটি অণুজীব পরীক্ষণের মধ্যে দুটিই হ্যাঁ-সূচক ফলাফল প্রদান করল। প্রথমে, যখন মঙ্গলের মাটিকে পৃথিবী হতে আনা একটি বীজাণুমুক্ত জৈব স্যুপের সাথে মেশানো হল, মাটির কোনো উপাদান রাসায়নিকভাবে ভেঙে ফেলল স্যুপটিকে—প্রায় যেন এমন শ্বসন-অণুজীব যারা পৃথিবীর খাদ্যের উপর বিপাক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করছে। দ্বিতীয়ত, যখন পৃথিবী হতে নিয়ে আসা গ্যাসগুলো মঙ্গলের মাটির নমুনার সাথে মেশানো হল, গ্যাসগুলো রাসায়নিকভাবে সংযুক্ত হয়ে যায় মাটির সাথে—প্রায় যেন ছিল

banglainternet.com

সালোক-সংশ্লেষণরত অণুজীব, যারা বায়ুমণ্ডলীয় গ্যাসগুলো হতে উৎপন্ন করছিল জৈব পদার্থ। মঙ্গলের অণুজীববিজ্ঞানে হ্যাঁ-সূচক ফলাফল পাওয়া গিয়েছিল সাতটি ভিন্ন নমুনায়, মঙ্গলের দুটি ভিন্ন স্থানে, যে স্থানদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব ছিল ৫,০০০ কিলোমিটার।

কিন্তু অবস্থানটি জটিল, এবং পরীক্ষণসমূহের সাফল্যের লক্ষণসমূহ হয়ত যথেষ্ট হবে না। ভাইকিং অণুজীববিজ্ঞান পরীক্ষণসমূহ সম্পন্ন করার জন্য এবং এদেরকে বিভিন্ন অণুজীবের সাথে পরীক্ষা করার জন্য চালানো হয়েছিল ব্যাপক প্রচেষ্টা। মঙ্গল-পৃষ্ঠের আপাতগ্রাহ্য বস্তুসমূহের সাথে পরীক্ষণগুলোর তুলনা করার জন্য খুব সামান্য চেষ্টাই করা হয়েছে। মঙ্গল পৃথিবী নয়। যদি পার্সিভাল লাওয়েলের কাছে ঋণের কথা আমরা মনে করি, তবে আমরা বোকা প্রতিপন্ন হব। হয়ত মঙ্গলের মাটির রয়েছে এক অদ্ভুত অজৈব রসায়ন, যার মাধ্যমে এটি মঙ্গলে অণুজীবের অনুপস্থিতির মাঝেই নিজে নিজেই খাদ্য উপাদানসমূহকে জারিত করতে পারে। হয়ত মঙ্গলের মাটিতে রয়েছে বিশেষ কোনো অজৈব ও জড় প্রভাবক, যা বায়ুমণ্ডলীয় গ্যাসসমূহকে জৈব অণুতে পরিণত করতে সমর্থ হয়।

সাম্প্রতিক পরীক্ষণসমূহ থেকে বোঝা যায় যে, সম্ভবত এটিই সত্য। ১৯৭১ সালে মঙ্গলের ভয়াবহ ধূলিঝড়ে, ম্যারিনার-৯ অবলোহিত স্পেক্ট্রোমিটার কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল ধূলির বর্ণালি-বৈশিষ্ট্যগুলো। এসকল বর্ণালি বিশ্লেষণের মাধ্যমে ও. বি. টুন, জে. বি পোলাক এবং আমি বুঝতে পারলাম যে, কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে সর্বোত্তমভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে মন্টমোরিলোনাইট এবং অন্য ধরনের কাদা দ্বারা। ভাইকিং ল্যান্ডার কর্তৃক সম্পন্ন পরবর্তী পর্যবেক্ষণগুলো মঙ্গলে বায়ু তাড়িত কাদার অস্তিত্বকে সমর্থন করে। এখন, এ. ব্যানিন এবং জে. রিশ্‌পন দেখতে পেয়েছেন যে, তারা মূল বৈশিষ্ট্যগুলোর কিছু কিছু পুনরুৎপাদন করতে পারছেন—যেগুলো সালোক সংশ্লেষণ এবং শ্বসনের সাথে সাদৃশ্য বহন করে—সাফল্যমণ্ডিত ভাইকিং অণুজীববিজ্ঞান পরীক্ষণসমূহের সময় যেগুলো সংঘটিত হয়েছিল, যদি গবেষণাগার পরীক্ষণসমূহে তারা মঙ্গলের কাদার বদলে ব্যবহার করে এরূপ কাদা। কাদাগুলোর রয়েছে একটি জটিল কার্যকর পৃষ্ঠদেশ, যাতে রাসায়নিক বিক্রিয়ার সাহায্যে উৎপন্ন হয় এবং বেরিয়ে যায় বিভিন্ন গ্যাস এবং রাসায়নিক বিক্রিয়ায় প্রভাবকের ভূমিকা নেয়। ভাইকিং অণুজীববিজ্ঞানের সকল ফলাফলকে অজৈব রসায়নের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, এমনটি বলা বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে, তবে এই ফলাফল এখন আর বিস্ময়কর নয়। কাদা প্রকল্প মঙ্গলে প্রাণের ধারণাকে সামান্যই বাতিল করে, কিন্তু এটি নিশ্চিতভাবে আমাদেরকে যথেষ্ট এগিয়ে দেয় এটি বলার জন্য যে, মঙ্গলে অণুজীব বিজ্ঞানের কোনো শক্তিশালী প্রমাণ নেই।

তথাপি, ব্যানিন এবং রিশ্‌পনের ফলাফলসমূহ বিশাল জীববৈজ্ঞানিক গুরুত্ব বহন করে, কারণ এগুলো দেখাল যে, প্রাণের অনুপস্থিতির মাঝেও এমন কোনো ভূমি-রসায়ন থাকতে পারে যা প্রাণের কিছু কিছু বিষয় সম্পন্ন করতে পারে। প্রাণের

উদ্ভবের পূর্বে পৃথিবীতে, হয়ত মাটিতে শ্বসন ও সালোক সংশ্লেষণ চক্রের সাদৃশ্যময় রাসায়নিক প্রক্রিয়া সচল ছিল, যেগুলো একদা প্রাণের উদ্ভবের ক্ষেত্রে সহায়ক ছিল। অধিকন্তু, আমরা জানি যে, অ্যামিনো এসিডগুলোকে সমন্বিত করে প্রোটিনের সাদৃশ্যময় দীর্ঘ-শিকল অণুতে পরিণত করার ক্ষেত্রে মন্টমোরিলোনাইট কাদা একটি শক্তিশালী প্রভাবকের ভূমিকা রাখে। আদি পৃথিবীর কাদাসমূহ হয়ত ছিল প্রাণের সূতিকাগার, এবং এখনকার মঙ্গলের রসায়ন হয়ত আমাদের গ্রহে প্রাণের উদ্ভব ও এর প্রাথমিক বিকাশের প্রয়োজনীয় ইঙ্গিত প্রদান করবে।

মঙ্গলের পৃষ্ঠে রয়েছে অনেক অভিঘাত গহ্বর, এদের প্রতিটির নামকরণ করা হয়েছে মূলত এক একজন বিজ্ঞানীর নামে। 'ভিশ্‌নিয়াক গহ্বর'-টি ঠিক অবস্থান করে মঙ্গলের অ্যান্টার্কটিকা অঞ্চলে। ভিশ্‌নিয়াক দাবি করেননি যে, মঙ্গলে প্রাণের অস্তিত্ব ছিলই, স্রেফ এটুকুই যে, তা সম্ভব ছিল, এবং যদি তা থেকে থাকে তবে এর সম্বন্ধে জানাটা ছিল অতি গুরুত্বপূর্ণ। আর যদি মঙ্গলে কোনো প্রাণ না থাকে, যে গ্রহটি অনেকটা পৃথিবীর মতো, তবে আমাদেরকে অবশ্যই বুঝতে হবে কেন এমন হল—কারণ, ভিশ্‌নিয়াকের মতে, সেই ক্ষেত্রে, আমাদেরকে মুখোমুখি হতে হবে পরীক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণের চিরায়ত বৈজ্ঞানিক সংঘাতের।

এই উদ্‌ঘাটনটি যে, ভাইকিং অণুজীববিজ্ঞান ফলাফলসমূহকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে কাদার মাধ্যমে, এরা কোনো প্রাণের অস্তিত্ব নির্দেশ করে না, তখন আমাদের কাছে আরো একটি রহস্য উন্মোচিত হয়ে যায় : ভাইকিং জৈব রসায়ন পরীক্ষণগুলো মঙ্গলের মাটিতে কেন জৈব পদার্থের ইঙ্গিত বহন করে না। যদি মঙ্গলে প্রাণ থেকে থাকে, তবে মৃতদেহগুলো কোথায় ? কোনো জৈব অণু খুঁজে পাওয়া যায়নি,—কোনো প্রোটিন বা নিউক্লিক এসিডের নির্মাণ-ছক, কোনো সাধারণ হাইড্রোকার্বন, পৃথিবীর কোনো প্রাণ-উপাদান—কিছু পাওয়া যায়নি। এটি আদৌ কোনো স্ববিরোধিতা নয়, কারণ, ভাইকিং অণুজীববিজ্ঞান পরীক্ষণসমূহ ভাইকিং রসায়ন পরীক্ষণসমূহের তুলনায় এক হাজার গুণ বেশি সুবেদী (কার্বন পরমাণুর প্রতি সমতুলে), এবং সম্ভবত মঙ্গলের মাটিতে সংশ্লেষিত জৈব পদার্থকে শনাক্ত করতে পারে। কিন্তু এতে খুব একটা সুবিধা পাওয়া যাবে না। পৃথিবীর মাটি একদা-জীবিত প্রাণী সত্তাসমূহের জৈব অবশিষ্ট দ্বারা পরিপূর্ণ ; চন্দ্রপৃষ্ঠের তুলনায় মঙ্গলের মাটিতে রয়েছে অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণ জৈব পদার্থ। যদি আমরা প্রাণের হাইপো-থিসিসকে ধরে রাখি তবে আমরা হয়ত ভেবে নেব যে, রাসায়নিকভাবে সক্রিয়, মঙ্গলের জারক পৃষ্ঠ কর্তৃক মৃতদেহগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে—হাইড্রোজেন পার অক্সাইডের বোতলে আবদ্ধ কোনো জীবাণুর মতো ; অথবা এমন এক ধরনের প্রাণ আছে যার উপর জৈব রসায়ন অপেক্ষাকৃত কম কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে, পৃথিবীতে এটি প্রাণের উপর যেমনটি করে থাকে, তার তুলনায়।

এই শেষ বিকল্পটি আমার কাছে বিশেষ আনুকূল্য লাভ করে : আমি অনীহা সত্ত্বেও, একজন আত্ম-স্বীকারোক্তি দেয়া কার্বন-প্রেমিক। মহাবিশ্বে রয়েছে প্রচুর

banglainternet.com

কার্বন। এটি প্রাণের জন্য হিতকর অদ্ভুত জটিল সব অণু গঠন করে। আমি একজন পানি-প্রেমিকও। জৈব রসায়ন ক্রিয়াশীল করার জন্য পানি গঠন করে এক আদর্শ দ্রবণ-ব্যবস্থা এবং এটি তাপমাত্রার এক বিশাল পাল্লা অবধি তরল অবস্থায় থাকে। কিন্তু মাঝে মাঝে আমি বিস্মিত হই। এই বিশেষ বস্তুগুলোর প্রতি আমার দুর্বলতার কারণ কি এই সত্যটি যে, আমি এগুলো দ্বারা তৈরি ? আমরা কি এই কারণে কার্বন এবং পানিভিত্তিক যে, প্রাণের উদ্ভবের সময় পৃথিবীতে এ সকল বস্তুর প্রাচুর্য্য বেশি ছিল ? অন্য কোথাও—যেমন, মঙ্গলে—প্রাণ কি অন্যকোনো পদার্থ দ্বারা তৈরি ?

আমি হলাম পানি, ক্যালসিয়াম এবং কার্ল সাগান নামক জৈব অণুসমূহের এক সমাবেশ। এক ভিন্ন সমাবেশ-মাত্রায় আপনিও প্রায় একই রকম অণুসমূহের এক সমাবেশ। কিন্তু এটিই কি সব কিছু ? এর মধ্যে অণু ছাড়া কি আর কিছু নেই ? কিছু লোক এই ধারণাটিকে মানব মর্যাদার জন্য হানিকর বলে মনে করে। আমি নিজে, এটিকে উচ্চমার্গীয় বলে মনে করি যে, আমরা যেমন জটিল এবং সূক্ষ্ম, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আণবিক পর্যায়ে বিবর্তনের ক্ষেত্রেও সেটিই অনুমোদন করে।

আমাদেরকে গঠনকারী পরমাণু এবং সরল অণুগুলো যেভাবে সমন্বিত হল, প্রাণের নির্যাসটি তেমন নয়। আমরা প্রায়শই পড়ে থাকি যে, যে রাসায়নিক দ্রব্যগুলো মানবদেহ গঠন করে তার মূল্য মাত্র সাতানব্বই সেন্ট বা দশ ডলার বা এরকম কোনো কিছু ; আমাদের শরীরের মূল্য এত কম দেখতে পাওয়াটা কিছুটা হতাশা-ব্যঞ্জক। তবে এই মূল্য নির্ধারণটি হয়েছে মানুষের শরীরের সম্ভাব্য সরলতম উপাদানগুলোর বিবেচনায়। আমরা মূলত পানি দ্বারা গঠিত, যার প্রায় কোনো মূল্যই নেই ; কার্বনের মূল্য কয়লার হিসেবে ; আমাদের অস্থিগুলোতে বিদ্যমান ক্যালসিয়াম চকের সমতুল্য ; প্রোটিনে বিদ্যমান নাইট্রোজেন বায়ুর সমতুল্য (এটিও সস্তা) ; আমাদের রক্তে যে লৌহ উপাদান রয়েছে তার মূল্যও যৎসামান্য। যদি আমরা আরো ভালোভাবে না জানতাম, আমরা আমাদেরকে গঠনকারী সবগুলো পরমাণুকে নিয়ে নিতাম, এদেরকে একটি বড়ো পাত্রে মেশাতে এবং নাড়তে প্ররোচিত হতাম। যত খুশি আমরা এমনটি করতে পারি। কিন্তু পরিশেষে আমরা যা পেতাম তা হত এক বিরক্তিকর মিশ্রণ। আমরা কীভাবে এর চাইতে বেশি কিছু আশা করতে পারতাম ?

হ্যারল্ড মরোইট্জ হিসেব করেছেন রাসায়নিক দ্রব্য সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হতে মানব-দেহ গঠনকারী সঠিক আণবিক উপাদানসমূহকে একত্রিত করতে কত খরচ হতে পারে। এর উত্তর হল, প্রায় দশ মিলিয়ন ডলার, এটি আমাদের হতাশা কিছুটা প্রশমিত করবে। কিন্তু তবুও আমরা সেই সব রাসায়নিক দ্রব্যকে একত্রে মেশাতে পারি না এবং পাত্র হতে বেরিয়ে আসে না কোনো মানব। এটি আমাদের সামর্থ্য হতে অনেক দূরে এবং সম্ভবত দীর্ঘকাল ধরে তেমনি থেকে যাবে। সৌভাগ্যক্রমে মানব তৈরির জন্য রয়ে গেছে অন্যান্য অপেক্ষাকৃত কম ব্যয়বহুল অথচ যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য পদ্ধতি।

আমি মনে করি, অন্যান্য গ্রহসমূহে প্রাণরূপসমূহ মোটামুটিভাবে আমাদের গ্রহের পরমাণুগুলোর মতো উপাদান দ্বারা গঠিত হবে, হয়ত, এমনকি অনেকগুলো একইরকম প্রধান অণু দ্বারা, যেমন, প্রোটিন এবং নিউক্লিক এসিড—কিন্তু এগুলো একত্রিত হবে কোনো অপরিচিত উপায়ে। হয়ত গ্রহগুলোর ঘন বায়ুমণ্ডলে যে সকল প্রাণীসত্তা ভেসে বেড়ায় তাদের আণবিক গঠন অনেকটা আমাদের মতোই হবে, ব্যতিক্রম শুধু এই যে, তাদের হয়ত থাকবে না কোনো অস্থিমালা এবং এ কারণে প্রয়োজন পড়বে না খুব বেশি ক্যালসিয়ামের। হয়ত অন্যত্র পানি ব্যতীত অন্য কোনো দ্রাবক ব্যবহৃত হবে। হাইড্রোফ্লোরিক এসিড সেই ক্ষেত্রে যথেষ্ট কার্যকরি হতে পারে, যদিও মহাবিশ্বে খুব বেশি পরিমাণ ফ্লোরিন নেই ; যে সকল অণু দ্বারা আমরা গঠিত সেগুলোর যথেষ্ট ক্ষতি করতে পারে হাইড্রোফ্লোরিক এসিড, কিন্তু অন্যান্য জৈব অণু, যেমন, প্যারাফিন মোম, এর উপস্থিতিতে যথাযথভাবে সুস্থিত। তরল অ্যামোনিয়া এর চেয়েও উত্তম দ্রাবক ব্যবস্থা সৃষ্টি করতে পারে, কারণ মহাবিশ্বে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে অ্যামোনিয়া। কিন্তু এটি তরল হবে কেবলমাত্র পৃথিবী বা মঙ্গলের চাইতে শীতলতর গ্রহগুলোতে। পৃথিবীতে অ্যামোনিয়া সাধারণত একটি গ্যাস, যেমনটি শুক্রে পানি। অথবা, সম্ভবত রয়েছে এমন সব জীবিত সত্তা যাদের আদৌ কোনো দ্রাবক ব্যবস্থা নেই, সলিড-স্টেই জীবন, যেখানে অণুগুলোর ভেসে বেড়ানোর পরিবর্তে সঞ্চারিত হচ্ছে তড়িৎ সংকেত।

কিন্তু এ সকল ধারণা এই অভিমতটিকে রক্ষা করে না যে, ভাইকিং ল্যান্ডার পরীক্ষণসমূহ মঙ্গলে প্রাণের অস্তিত্বকে নির্দেশ করে। অপেক্ষাকৃত পৃথিবী-সদৃশ সেই গ্রহতে, যেখানে রয়েছে কার্বন ও পানির প্রাচুর্য, যদি প্রাণের অস্তিত্ব থেকে থাকে, তবে তা গড়ে উঠবে জৈব রসায়নের উপর ভিত্তি করে। ইমেজিং এবং অণুজীব বিজ্ঞানের ফলাফলসমূহের মতো, জৈব রসায়নের ফলাফলসমূহ ১৯৭০ এর দশকের শেষদিকে খ্রাইস এবং ইউটোপিয়ার সূক্ষ্ম কণাগুলোতে প্রাণের অস্তিত্বহীনতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। হয়ত শিলাখণ্ডগুলোর কয়েক মিলিমিটার নিচে, (অ্যান্টার্কটিক শুষ্ক উপত্যকাগুলোর মতো), বা গ্রহটির অন্য কোথাও বা আরো পূর্বের, আরো শান্ত কোনো সময়ে। কিন্তু আমরা যেখানে বা যখন তাকালাম, সেখানে বা তখন নয়।

মঙ্গলে ভাইকিং অভিযান ব্যাপক ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন এক মিশন, অন্য রকমের প্রাণ কিরূপ হতে পারে তার প্রথম ও তাৎপর্যময় অনুসন্ধান, অন্য যে কোনো গ্রহে কোনো সক্রিয় মহাকাশ যানের এক ঘণ্টার অধিক বা এরকম সময় ধরে টিকে থাকা (ভাইকিং-১ টিকে ছিল বছরের পর বছর ধরে), ভিন্ গ্রহের ভূতত্ত্ব, ভূ-কম্পবিদ্যা, খনিজ বিজ্ঞান, আবহাওয়াবিজ্ঞান ও আরো ডজনখানেক বিজ্ঞানের সমৃদ্ধ উপাত্তের উৎস। এই সব অসাধারণ অগ্রগতির সাথে আমরা কীভাবে এগিয়ে যাব ? কিছু বিজ্ঞানী পাঠাতে চান কোনো স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র যা অবতরণ করবে, আহরণ করবে মাটির নমুনা, এবং সেগুলোকে ফিরিয়ে আনা হবে পৃথিবীতে, সেগুলোকে

banglainternet.com

মঙ্গলে পাঠানো ক্ষুদ্র আয়তনের সীমিত সংখ্যক গবেষণাগারের বদলে বিস্তারিতভাবে পরীক্ষা করা যাবে পৃথিবীর বিশাল ও অভিজাত গবেষণাগারগুলোতে। এভাবে ভাইকিং অণুজীববিজ্ঞান পরীক্ষণসমূহের বেশির ভাগ দ্ব্যর্থকতার মীমাংসা করা যাবে। ভূমির রসায়ন এবং খনিজ বিজ্ঞান নিরূপণ করা যেত ; পৃষ্ঠদেশের নিচে প্রাণের অনুসন্ধানের জন্য ভেঙে ফেলা যেত অবপৃষ্ঠ শিলাখণ্ডগুলোকে। শর্তগুলোর বিশাল ব্যবধিতে সরাসরি আণুবীক্ষণিক পরীক্ষণগুলোসহ জৈব রসায়ন এবং প্রাণের উপর সম্পন্ন করা যেত শত শত পরীক্ষা। আমরা এমনকি ভিশ্‌নিয়াকের স্কোরিং পদ্ধতিও ব্যবহার করতে পারতাম। যদিও এটি হয়ে যেত যথেষ্ট ব্যয়বহুল, কিন্তু এমন একটি মিশন আমাদের প্রাযুক্তিক সামর্থ্যের মধ্যেই থাকত।

তবে এটি এর সাথে বয়ে আনে এক অভিনব বিপদ : ফিরতি-দূষণ। অণুজীবগুলোর জন্য আমরা যদি মঙ্গলের মাটির নমুনাগুলোকে পৃথিবীতে পরীক্ষা করতে চাই, আমরা যেন, অবশ্যই, নমুনাগুলোকে আগেভাগেই জীবাণুযুক্ত করে না ফেলি। অভিযানটির উদ্দেশ্য হবে এদেরকে জীবিত অবস্থায় নিয়ে আসা। কিন্তু এরপর কী ? মঙ্গলের অণুজীবসমূহ পৃথিবীতে এসে জনস্বাস্থ্যের প্রতি কি সৃষ্টি করবে হুমকি ? এইচ. জি. ওয়েল্‌স এবং ওরসন ওয়েল্‌সের মঙ্গলবাসীরা, যারা আচ্ছন্ন ছিল বোর্নমাউথ এবং জার্সি সিটি দ্বারা, খুব বিলম্বেই লক্ষ করল যে, পৃথিবীর অণুজীবগুলোর বিরুদ্ধে তাদের প্রতিষেধক ক্ষমতা ছিল নিষ্ফলা। এর বিপরীতটি কি সম্ভব ? এটি একটি মারাত্মক এবং কঠিন বিষয়। হয়ত নেই কোনো মঙ্গল-অণুজীব। যদি এরা থেকে থাকে তবে কোনো ক্ষতিকর প্রভাব ছাড়াই খেয়ে ফেলতে পারি এদের এক কিলোগ্রাম পরিমাণ। কিন্তু আমরা নিশ্চিত নই এবং ঝুঁকির মাত্রাটি উঁচু। যদি আমরা পৃথিবীতে নিয়ে আসতে চাই মঙ্গলের জীবাণুমুক্ত নমুনা, তবে আমাদের অবশ্যই থাকতে হবে এমন এক ধারণ-পদ্ধতি যা চরমভাবে বিশ্বাসযোগ্য। এমন সব জাতি আছে যারা জীবাণু অস্ত্র উৎপন্ন এবং মজুদ করে। যে কোনো সময় তাদের মাঝে ঘটে যেতে পারে দুর্ঘটনা, আমি যতদূর জানি, এখনো তেমন কিছু ঘটেনি, তবে, এগুলো সৃষ্টি করেছে বৈশ্বিক আতংক। হয়ত মঙ্গল-নমুনাসমূহকে নিরাপদেই পৃথিবীতে নিয়ে আসা সম্ভব। কিন্তু একটি ফিরতি-নমুনা মিশনের পূর্বে আমি চরমভাবে নিরাপত্তার কথা চিন্তা করব।

মঙ্গল অনুসন্ধানের জন্য এবং এই অসমসত্ত্ব গ্রহটি যে আনন্দ ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্র ধারণ করে আছে আমাদের জন্য, তা জানার জন্য রয়েছে আরো একটি উপায়। ভাইকিং ল্যান্ডারের ছবিগুলো নিয়ে কাজ করতে গিয়ে আমার সবচেয়ে শক্তিশালী আবেগটি ছিল আমাদের নিশ্চলত্বের হতাশা। আমি নিজেকে আবিষ্কার করলাম মহাকাশযানটিকে নিদেনপক্ষে পা টিপে টিপে হলেও চলাচল করার জন্য পীড়াপীড়ি করতে, যেন এই গবেষণাগারটি, যার ডিজাইন করা হয়েছে এর নিশ্চলত্বের জন্য, নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে এক পায়ে লাফানো একটি ক্ষুদ্র প্রাণীকে নিয়ন্ত্রণ করতে অস্বীকার করছে। সেই বালিয়াড়িকে নমুনা-বাহুর সাথে লাগিয়ে

দেয়ার জন্য, শিলাখণ্ডের নিচে প্রাণের অনুসন্ধান করার জন্য, দূরের উত্তল রেখাটি কোনো গহ্বর কেল্লা কিনা তা দেখার জন্য আমরা কতটাই না প্রত্যাশা করতাম। এবং আমি জানতাম যে, অনতি দক্ষিণ-পূর্বে ছিল খ্রাইসের চারটি আঁকাবাঁকা চ্যানেল। ভাইকিং ফলাফলসমূহের প্রলোভন সৃষ্টিকারী এবং উদ্দীপনাদায়ক চরিত্রের কারণে আমি মঙ্গলে আমাদের অবতরণ ক্ষেত্রের চেয়ে অনেক বেশি চমকপ্রদ একশত স্থানকে জানতাম। আদর্শ যন্ত্রটি হল এক চলমান যান, যেগুলো সম্পন্ন করত আধুনিক সব পরীক্ষণ, বিশেষত বিশ্ব সৃষ্টি, রসায়ন এবং জীব বিজ্ঞানের উপর। এর চলমান যানের মূল রূপের নির্মাণ প্রক্রিয়া এগিয়ে চলছে নাসার অধীনে। এরা জানে কীভাবে শিলাখণ্ডের উপর উঠতে হয়, কীভাবে গভীর সংকীর্ণ উপত্যকায় না পড়ে যেতে হয়, কীভাবে দৃঢ় স্থান থেকে ছুটে আসতে হয়। মঙ্গলে এমন একটি রোভারযান অবতরণ করানো আমাদের সামর্থ্যের মধ্যেই পড়ে যা এর পারিপার্শ্বিককে স্ক্যান করতে পারবে, এর দৃষ্টিক্ষেত্রের মধ্যে দেখতে পারে সবচেয়ে আকর্ষণীয় স্থানসমূহকে, এবং আগামীকাল এই সময়টিতে এটি থাকবে সেখানে। প্রতিদিন একটি নতুন স্থান, একটি পরিমণ্ডল, এই আবেদনময় গ্রহটির বিচিত্র প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলির মাঝ দিয়ে ক্রমাগত ভ্রমণ।

যদি মঙ্গলে কোনো প্রাণ না-ও থাকে তবুও এরূপ একটি মিশন বয়ে আনবে অপরিসীম বৈজ্ঞানিক সুবিধা। আমরা বিক্ষিপ্তভাবে ঘুরে বেড়াতে পারব সুপ্রাচীন নদী-উপত্যকাসমূহের মধ্য দিয়ে, বিশাল আগ্নেয় পর্বতসমূহের যে কোনোটির ঢাল বেয়ে উপরের দিকে, মেরুর বরফের সারি বরাবর অদ্ভুত ভূ-খণ্ডের মধ্য দিয়ে, বা মঙ্গলের ইঙ্গিতময় পিরামিডগুলোর* কাছাকাছি যাওয়া। এরূপ একটি মিশনের জন্য জনগণের আগ্রহ থাকবে ব্যাপক। আমাদের ঘরের টেলিভিশন-পর্দায় ভেসে উঠবে নতুন দৃশ্য-পরম্পরা। আমরা শনাক্ত করতে পারব পথটিকে, চিন্তা করতে পারব দৃষ্ট বস্তুসমূহ নিয়ে, পরামর্শ দিতে পারব নতুন গন্তব্য নিয়ে। ভ্রমণ হবে দীর্ঘ, পৃথিবী হতে আগত বেতার তরঙ্গগুলোর প্রতি অনুগত থাকবে রোভারটি। মিশন পরিকল্পনার সাথে নতুন ধারণাগুলোকে সংযোজিত করার জন্য পাওয়া যাবে যথেষ্ট সময়। অন্য একটি গ্রহ-অভিযানে অংশগ্রহণ করতে পারবে এক বিলিয়ন মানুষ।

মঙ্গলের পৃষ্ঠদেশের ক্ষেত্রফল পৃথিবীর ভূমির ক্ষেত্রেফলের সমান। একটি সার্বিক অনুসন্ধানে আমাদের হয়ত লেগে যাবে শতাব্দীকাল। কিন্তু এমন একটি সময় আসবে যখন মঙ্গলকে পুরোপুরিভাবে জানা হয়ে যাবে ; রোবট এয়ারক্রাফ্‌ট উপর থেকে এর মানচিত্র গ্রহণ সম্পন্ন করার কোনো এক সময় পর, রোভার মঙ্গল

* বৃহত্তমগুলো ভূমিতে ৩ কিলোমিটার চওড়া এবং উচ্চতায় ১ কিলোমিটার—পৃথিবীতে মিশর বা মেক্সিকোর পিরামিডগুলোর চাইতে বৃহত্তর। এদেরকে মনে হয় ক্ষয়প্রাপ্ত এবং প্রাচীন, এবং হয়ত, কেবল ক্ষুদ্র কিছু পর্বতমালা, কালের পর কাল ধরে, যেগুলো প্রবল বালি ঘর্ষণে এই রূপ পরিগ্রহ করেছে। কিন্তু আমি মনে করি, এগুলো একটি সযত্ন অবয়বের নিশ্চয়তা প্রদান করে।

banglainternet.com

পৃষ্ঠটিকে তন্ন তন্ন করে খোঁজা সম্পন্ন করার কোনো এক সময় পর, নমুনা-সমূহকে নিরাপদে পৃথিবীতে নিয়ে আসার কোনো এক সময় পর, মানবজাতি মঙ্গলের বালিতে হেঁটে যাবার কোনো এক সময় পর। এরপর কী ? আমরা মঙ্গলকে নিয়ে কী করব ?

পৃথিবীকে নিয়ে মানুষের অপচয়ের এত বেশি উদাহরণ আছে যে, এমন একটি প্রশ্নের অবতারণা আমাকে হতোদ্যম করে তোলে। যদি মঙ্গলে প্রাণ থেকে থাকে, আমি বিশ্বাস করি যে, মঙ্গলকে নিয়ে আমাদের কিছুই করার নেই। মঙ্গল তখন মঙ্গলবাসীদেরই, এমনকি তারা যদি অণুজীবও হয়ে থাকে। একটি নিকট গ্রহতে একটি স্বতন্ত্র জীববিজ্ঞানের অস্তিত্ব এমন একটি অমূল্য সম্পদ যা আমাদের অনুধাবনের অতীত, এবং আমি মনে করি, সেই প্রাণের সংরক্ষণ অবশ্যই ছাপিয়ে যাবে মঙ্গলের সম্ভাব্য অন্য সব ব্যবহারকে। যা হোক, ধরে নিন মঙ্গলে কোনো প্রাণ নেই। এটি আপাতগ্রাহ্যভাবে কাঁচামালের কোনো উৎস নয় : আসছে অনাগত অনেক শতাব্দী ধরে মঙ্গল থেকে পৃথিবীতে পণ্য পরিবহন হয়ে থাকবে অত্যন্ত ব্যয়বহুল। কিন্তু, আমরা কি মঙ্গলে বাস করতে সমর্থ হব ? আমরা কি কোনো এক অর্থে মঙ্গলকে বাসযোগ্য করে তুলতে পারব ?

নিশ্চিতভাবেই, একটি চমৎকার জগৎ, কিন্তু আমাদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে মঙ্গল সম্বন্ধে আমাদের অনেক অন্যায্য সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেছে, এখানে রয়েছে অক্সিজেনের অপ্রতুলতা, তরল পানির অনুপস্থিতি এবং উচ্চমাত্রার অতিবেগুনি বিকিরণ। (নিম্ন তাপমাত্রা কোনো অনতিক্রম্য বাধা সৃষ্টি করে না, অ্যান্টার্কটিকার বর্ষ-ব্যাপী বৈজ্ঞানিক স্টেশনগুলো যেমনটি উপস্থাপন করে থাকে)। এই সমস্যাগুলোর সব সমাধান করা যেত যদি আমরা সেখানে অধিক পরিমাণ বায়ু পেতে পারতাম। উচ্চতর বায়ুমণ্ডলীয় চাপের মাধ্যমে তরল পানি পাওয়া সম্ভব ছিল। অধিকতর অক্সিজেনের উপস্থিতিতে আমরা বায়ুমণ্ডলে শ্বাস নিতে পারতাম এবং মঙ্গল পৃষ্ঠটিকে সৌর অতিবেগুনি বিকিরণ হতে রক্ষা করার জন্য ওজোন একটি আচ্ছাদন হিসেবে কাজ করতে পারত। আঁকাবাঁকা চ্যানেল, স্তূপীকৃত পোলার প্লেট এবং অন্যান্য সাক্ষ্যসমূহ থেকে বোঝা যায় যে, একদা মঙ্গলে ছিল অপেক্ষাকৃত ঘন বায়ুমণ্ডল। এটির সম্ভাবনা খুবই কম যে, সবগুলো গ্যাসই মঙ্গল হতে উধাও হয়ে গেছে। কাজেই, এগুলো এই গ্রহটিরই কোনো এক স্থানে বিরাজমান। এদের কিছু পরিমাণ রাসায়নিকভাবে যুক্ত হয়ে আছে শিলাখণ্ডগুলোর সাথে। কিছু রয়েছে অবপৃষ্ঠ বরফে। কিন্তু বেশিরভাগ হয়ত পোলার আইস ক্যাপগুলোতেই বিদ্যমান।

ক্যাপগুলোকে বাষ্পায়িত করতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই তাপ প্রয়োগ করতে হবে ; হয়ত কোনো গাঢ় পাউডার-এর সাহায্যে ধূলিস্যাৎ করে দিতে পারি, এদেরকে উত্তপ্ত হওয়ার সুযোগ দিতে পারি অধিকতর সূর্যালোক শোষণ করতে

দিয়ে, আমরা পৃথিবীতে বনাঞ্চল ও তৃণভূমি ধ্বংস করার সময় যা করে থাকি তার বিপরীত প্রক্রিয়ায়। কিন্তু ক্যাপগুলোর পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল খুবই বেশি। প্রয়োজনীয় ধূলোগুলোর প্রয়োজন পড়ত ১২০০ স্যাটার্ন-৫ রকেট বুস্টারের, যেগুলো পাঠাতে হত পৃথিবী হতে মঙ্গলে ; এমনকি তখনো, বায়ুস্রোতে ধূলোগুলো ভেসে যেত পোলার ক্যাপগুলোর উপর থেকে। একটি অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট উপায় হতে পারত এমন কিছু গাঢ় বস্তু তৈরি করা যেগুলো নিজের অণুকৃতি তৈরি করতে পারে, কিছুটা কৃষ্ণ বর্ণের এক মেশিন, যা আমরা পাঠাই মঙ্গলে এবং যা অতঃপর পোলার ক্যাপগুলোর সর্বত্র স্থানীয় পদার্থ দ্বারা নিজের পুনরুৎপাদন ঘটাতে থাকবে। এরূপ যন্ত্রসমূহের একটি শ্রেণীবিভাগ আছে। আমরা এদেরকে বলি তরুলতা। এদের কিছু অত্যন্ত শক্ত এবং স্থিতিস্থাপক। আমরা জানি যে, নিদেনপক্ষে কিছু পার্থিব অণুজীব টিকে থাকতে পারে মঙ্গলে। যা প্রয়োজন তা হল গাঢ় বর্ণের তরুলতার কৃত্রিম নির্বাচন এবং বংশগতীয় প্রকৌশলের এক প্রোগ্রাম—হয়ত লাইকেন—যেগুলো মঙ্গলের অধিকতর প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকতে পারে। এরূপ তরুলতার যদি উৎপাদান ঘটানো যেত, তবে আমরা মঙ্গলের পোলার আইস ক্যাপগুলোর বিশাল ব্যাপ্তিতে এদের বীজ বপনকে কল্পনা করতে পারতাম, অতঃপর ঘটত অংকুরোদ্গম, বিস্তৃতি, আইস ক্যাপগুলোর কৃষ্ণায়ন, শোষিত হত সূর্যালোক, উত্তপ্ত হত বরফ এবং মঙ্গলের প্রাচীন বায়ুমণ্ডলকে মুক্তি দিত এর দীর্ঘ বন্দিত্ব থেকে। আমরা এমনকি কল্পনা করতে পারতাম মঙ্গলের কোনো এক জনি অ্যাপল্‌সিডকে, যে এক রোবট বা মানুষ, এমন এক প্রচেষ্টায় ঘুরে বেড়ায় হিমায়িত মেরুর নিষ্ফলা প্রান্তরে, যা উপকৃত করবে আগামী প্রজন্মের মানুষকে।

এই সাধারণ ধারণাটিকে বলা হয় টেরাফর্মিং : ভিন্ গ্রহের কোনো প্রাকৃতিক পরিবেশকে মানুষের জন্য অপেক্ষাকৃত উপযোগী করে গড়ে তোলা। হাজার হাজার বছরে মানুষ পৃথিবীর তাপমাত্রাকে গ্রিন হাউজ এবং অ্যালবেডো পরিবর্তনের মাধ্যমে মাত্র এক ডিগ্রি পরিমাণ বিঘ্নিত করতে পেরেছে, যদিও জীবাশ্ম-জ্বালানি পোড়ানো এবং বনভূমি ও তৃণভূমি ধ্বংস করার এখনকার হার বজায় রাখলে মাত্র এক বা দুই শতাব্দীর মধ্যে আমরা বৈশ্বিক তাপমাত্রাকে আরো এক ডিগ্রি বাড়িয়ে ফেলতে পারব। এগুলো এবং অন্য আরো কিছু বিবেচনায় মঙ্গলে উল্লেখযোগ্য টেরাফর্মিং সম্পন্ন করতে হয়ত শত শত বা হাজার হাজার বছর সময় লেগে যাবে। চরম অগ্রসর প্রযুক্তির কোনো ভবিষ্যৎ কালে আমরা হয়ত শুধু এর বায়ুমণ্ডলীয় চাপ বৃদ্ধি ও তরল পানি প্রাপ্তিকেই সম্ভব করে তুলব না, এমনকি গলনশীল পোলার ক্যাপগুলো হতে তরল পানি বয়ে আনা যাবে উষ্ণতর বিষুবীয় অঞ্চলে। অবশ্যই এটি করার কোনো একটি উপায়ও থাকত। আমরা খনন করতে পারতাম খাল। পৃষ্ঠ এবং অবপৃষ্ঠের গলনশীল বরফকে বয়ে নেয়া যেত বিশাল ক্যানাল-নেটওর্য়াকের মাধ্যমে। পার্সিভাল লাওয়েল যা বলেছিলেন এটি ঠিক তাই-ই,

banglainternet.com

একশত বছরের কম সময় পূর্বে যা প্রস্তাব করেছিলেন ভুলক্রমে, তা প্রকৃতই ঘটছিল মঙ্গলে। মঙ্গলের অতিরিক্ত অনাতিথেয়তার কারণ ছিল পানির অভাব। যদি শুধুমাত্র খালের একটি নেটওর্য়াক থাকত তবে সেই অভাবটির প্রতিকার করা যেত, আপাত গ্রাহ্য হয়ে উঠত মঙ্গলের আতিথেয়তা। লাওয়েলের অনুমানসমূহ সম্পন্ন হয়েছিল খুবই প্রতিকূল পর্যবেক্ষণ-অবস্থায়। স্কিয়াপ্যারেল্লির মতো, অন্যরা, এরই মধ্যে খালের মতো কিছু একটা দেখে ফেলেছিলেন ; মঙ্গলের সাথে লাওয়েলের জীবন-ব্যাপী প্রেমের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পূর্বে যাদেরকে বলা হত ক্যানালি ; যখন মানুষের আবেগ আলোড়িত হয় তখন তাদের মাঝে আত্ম-প্রবঞ্চনার প্রবণতা প্রকট হয় এবং বুদ্ধিমান প্রাণীর বসতিময় একটি প্রতিবেশী গ্রহের ধারণার চাইতে বেশি আলোড়ন সৃষ্টিকারী কোনো কিছু খুব কমই থাকতে পারে।

লাওয়েলের ধারণার ক্ষমতা হয়ত একে এক পূর্ববোধ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে। মঙ্গলবাসীরা তৈরি করেছিল তার ক্যানাল-নেটওয়ার্ক। এমনকি এটিও হতে পারে একটি যথার্থ ভবিষ্যদ্বাণী ; গ্রহটি কখনো যদি বাসযোগ্য হয়ে উঠে, সেটি সম্পন্ন হবে মানুষ দ্বারা যাদের স্থায়ী বাসস্থান এবং গ্রহ-স্বীকৃতি হবে মঙ্গল। আমরা হব মঙ্গল-বাসী।

ষষ্ঠ অধ্যায়
মহাজাগতিক পথিকের গল্প

রয়েছে কি অনেকগুলো জগৎ, নাকি জগৎ কেবল একটি ? প্রকৃতির অনুসন্ধানে এটি হল সবচেয়ে মহৎ ও মর্যাদাসম্পন্ন প্রশ্নগুলোর অন্যতম।

—অ্যালবার্টাস ম্যাগনাস, ত্রয়োদশ শতাব্দী

আমরা এই অতি পরিচিত পৃথিবী থেকে উপরে উঠে যেতে পারি, এবং একে উঁচু থেকে দেখে, ভেবে দেখুন প্রকৃতি তার সকল মর্ম এবং রূপ-অলংকার এই ক্ষুদ্র 'ধূলিকণা'-র উপর ঢেলে দিয়েছে কিনা ? তাই দূরদেশে ভ্রমণকারীর মতো, আমরা আমাদের নিজেকে আরো ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারব, জানতে পারব কীভাবে বাচাই করতে হয় নিজ গ্রহের ঐশ্বর্যকে এবং এর মূল্যকে অন্য কিছুর সাথে তুলনা করতে হয়। এই গ্রহটির যা কিছুকে মহান বলে থাকি তাদের প্রশংসা করার ক্ষেত্রে আমরা সংযত হয়ে যাব, মানুষ যে সকল তুচ্ছ বিষয়ের প্রতি প্রলুব্ধ হয়ে পড়ে সেগুলোকে মহৎ-চিত্তে উপেক্ষা করতে পারব, যখন আমরা জেনে যাব যে এরূপ বসতিময় আরো অনেক জগৎ রয়ে গেছে এবং যেগুলো আমাদের গ্রহটির মতোই রূপ-সুধায় অধরা।

—ক্রিশ্চিয়ান হাইগেন্স,
দ্য সিলেস্টিয়াল ওয়ার্ল্ডস ডিসকাভার্ড, খ্রিস্টীয় ১৬৯০ সাল

এখন সেই সময় যখন মানুষ মহাশূন্যের সমুদ্রে সবেমাত্র পাল তুলেছে। আধুনিক যেসব মহাকাশযান গ্রহসমূহের উদ্দেশ্যে কেপলারীয় বিচরণপথ সৃষ্টি করে সেগুলো মনুষ্যবিহীন। অদ্ভুত সুন্দরভাবে নির্মিত এসব নভোযান অর্ধ-বুদ্ধিমান রোবটগুলোর সাহায্যে অভিযান চালাচ্ছে অজানা গ্রহের পানে। বহিঃ সৌর জগতের অভিযাত্রাগুলো নিয়ন্ত্রিত হয় পৃথিবীনামক গ্রহটির একটিমাত্র স্থান থেকে, ক্যালিফোর্নিয়ার প্যাসাডেনার 'ন্যাশনাল অ্যারোনটিক্স এন্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন'-এর 'জেট প্রোপালশন ল্যাবরেটরি' (JPL)।

১৯৭৯ সালের, ৯ জুলাই, ভয়েজার ২ নামক একটি মহাকাশযান প্রবেশ করে বৃহস্পতি ব্যবস্থায়। আন্তঃগ্রহ শূন্যের মধ্য দিয়ে এটি ভ্রমণ করেছিল প্রায় দুবছর। মহাকাশযানটি তৈরি হয়েছিল মিলিয়ন মিলিয়ন বিচ্ছিন্ন অংশ প্রয়োজনাতিরিক্তভাবে সংযোজিত করে যাতে করে কিছু অংশ ব্যর্থ হলে, অন্য অংশগুলো যেন সেই দায়িত্ব পালন করতে পারে। মহাকাশযানটির ওজন ০.৯ টন এবং পূর্ণ করে ফেলবে একটি

banglainternet.com

বিশাল শোবার ঘর। এর মিশন একে সূর্য থেকে এতটা দূরে নিয়ে যায় যে একে সৌরশক্তি সরবরাহ করা যায় না, অন্য মহাকাশযানগুলোর ক্ষেত্রে যা সম্ভব ছিল। এর পরিবর্তে, ভয়েজার নির্ভর করে একটি ক্ষুদ্র নিউক্লিয়ার প্ল্যান্টের উপর, প্লুটোনিয়ামের একটি খণ্ডের তেজস্ক্রিয় বিকিরণ থেকে শোষণ করে শত শত ওয়াট। এর তিনটি সমন্বিত কম্পিউটার এবং এর বেশির ভাগ নিত্য-প্রয়োজনীয় কাজ—উদাহরণস্বরূপ, এর তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা—এর মধ্যস্থলে অবস্থিত। এটি নির্দেশাবলি গ্রহণ করে পৃথিবী হতে এবং অর্জিত তথ্যসমূহ বেতার-পদ্ধতিতে পৃথিবীতে পাঠায় ৩.৭ মিটার ব্যাসের একটি বিশাল অ্যান্টেনার মাধ্যমে। এর বেশির ভাগ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি একটি স্ক্যান প্ল্যাটফর্মের উপর স্থাপিত, যা বৃহস্পতি বা কোনো একট উপগ্রহে পৌছানোর গতিপথ মেনে চলে, যখন এটি প্রবল বেগে ধেয়ে চলে। রয়েছে অনেক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি—অতিবেগুনি এবং অবলোহিত স্পেক্ট্রোমিটার, চার্জিত কণা, চৌম্বক ক্ষেত্র ও বৃহস্পতির তেজস্ক্রিয় বিকিরণ পরিমাপের জন্য যন্ত্রপাতি—কিন্তু সবচেয়ে কার্যকরি ছিল দুটি টেলিভিশন ক্যামেরা, যেগুলোর ডিজাইন করা হয়েছিল বহিঃসৌরমণ্ডলের গ্রহ-দ্বীপগুলোর হাজার হাজার ছবি তোলার জন্য।

বৃহস্পতির চারদিকে রয়েছে অদৃশ্য কিন্তু অত্যন্ত বিপজ্জনক উচ্চ-শক্তির চার্জিত কণা। বৃহস্পতি এবং এর উপগ্রহগুলোকে কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করা এবং এর মিশনকে শনিতে ও শনির সীমা ছাড়িয়ে সচল রাখার জন্য মহাকাশযানটিকে অবশ্যই যেতে হবে এই বিকিরণের বহিঃপ্রান্ত ছুঁয়ে। কিন্তু চার্জিত কণাগুলো ধ্বংস করে ফেলতে পারে সূক্ষ্ম যন্ত্রগুলোকে এবং ইলেকট্রনিক্সের যন্ত্রাংশগুলোকে পুড়ে ফেলতে পারে। বৃহস্পতির চারদিকে রয়েছে কঠিন ধ্বংসাবশেষের একটি বলয়, যা চার মাস পূর্বে আবিষ্কৃত হয়েছে ভয়েজার-১ কর্তৃক এবং যাকে অতিক্রম করে যেতে হবে ভয়েজার-২ কে। একটি ক্ষুদ্র ও স্থানচ্যুত শিলাখণ্ডের সাথে সংঘর্ষ ঘটলে মহাকাশযানটি তীব্রভাবে ঝাঁকুনি খেয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলবে, এর অ্যান্টেনা যোগাযোগ হারিয়ে ফেলবে পৃথিবীর সাথে, এর উপাত্ত হারিয়ে যাবে চিরতরে। বিপন্ন হওয়ার সামান্য পূর্বে, মিশন নিয়ন্ত্রকগণ সচকিত হয়ে পড়বেন। কার্যকরি হয়ে উঠবে কিছু সতর্কতা সংকেত এবং জরুরি ব্যবস্থা, কিন্তু পৃথিবীর মানুষ এবং মহাশূন্যের রোবটদের সমন্বিত বুদ্ধিবৃত্তি এড়িয়ে যেতে পারবে বিপদটিকে।

১৯৭৭ সালের ২০ আগস্টে উৎক্ষেপণের পর এটি একটি বৃত্তচাপের মতো বিচরণপথ অনুসরণ করে মঙ্গলের কক্ষপথ ছাড়িয়ে গ্রহাণু-রাজ্যের ভিতর দিয়ে ছুটে চলল বৃহস্পতির মণ্ডলে এবং এর চলার পথে গ্রহটি এবং এর চৌদ্দোটি বা এরকম সংখ্যক উপগ্রহকে অতিক্রম করে যাচ্ছে। বৃহস্পতির পাশে ভয়েজারের গতি ত্বরান্বিত হল শনির কাছাকাছি যাওয়ার জন্য। শনি মহাকর্ষ একে পাঠিয়ে দেবে ইউরেনাসের দিকে। ইউরেনাসের পর এটি অতিক্রম করে ফেলবে নেপচুন, ত্যাগ

করবে সৌর জগৎ, হয়ে উঠবে এক আন্তঃনাক্ষত্রিক নভোযান, এর নিয়তি নির্ধারিত হবে নক্ষত্ররাজির মধ্যে বিরাজমান শূন্যের মহাসমুদ্রের মাঝ দিয়ে চিরকাল ছুটে চলার জন্য।

যে সকল অভিযাত্রা এবং আবিষ্কারের সুদীর্ঘ পালা মানব ইতিহাসকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এবং আলাদা করতে পেরেছে এগুলো তাদের মধ্যে আধুনিকতম। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে আপনি স্পেন থেকে আজুরিদের দেশে ভ্রমণ করতে পারতেন কয়েক দিনের মধ্যে, আজ একই সময় লাগে পৃথিবী থেকে চাঁদে যেতে। তখন আটলান্টিক পাড়ি দিতে এবং 'নিউ ওয়ার্ল্ড' তথা আমেরিকাতে পৌছতে কয়েক মাস সময় লেগে যেত। আজ অন্তঃসৌরমণ্ডলের বিশাল জগৎ অতিক্রম করতে এবং মঙ্গল বা শুক্রে পৌছতে সময় লাগে কয়েক মাস, যেগুলো প্রকৃতই আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে নতুন জগতের বিস্ময় নিয়ে। সপ্তদশ বা অষ্টাদশ শতাব্দীতে হল্যান্ড হতে চীনে যেতে লেগে যেত এক বা দুবছর সময়, যে সময়ে এখন পৃথিবী থেকে চলে যাওয়া যায় বৃহস্পতিতে।** তখন বার্ষিক খরচটি ছিল এখনকার তুলনায় বেশি, কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই সেটি মোট জাতীয় উৎপাদনের ১ শতাংশেরও কম। রোবট-ক্রুগুলোসহ আমাদের বর্তমান নভোযানসমূহ হল অগ্রদূত, ভিন্‌গ্রহসমূহে আগামী দিনের মানুষের অভিযাত্রাগুলোর পথিকৃৎ। আমরা এই পথটিতে ভ্রমণ করেছি পূর্বেই।

পঞ্চদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়টি উপস্থাপন করে আমাদের ইতিহাসের এক প্রধান ক্রান্তিলগ্ন। তখন এটি পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে, আমরা আমাদের যে কোনো অংশে অভিযাত্রা করতে পারতাম। অর্ধডজন ইয়োরোপীয় জাতি হতে দুঃসাহসী জাহাজগুলো ছড়িয়ে পড়ল সকল সমুদ্রে। এই অভিযাত্রাগুলোর পেছনে ছিল অনেক প্রণোদনা : উচ্চাকাঙ্ক্ষা, লোভ, জাতীয় অহম, ধর্মীয় উগ্রবাদ, বন্দিদশার ক্ষমা, বৈজ্ঞানিক কৌতূহল, অভিযানের প্রতি তৃষ্ণা এবং ইস্টার্নমেডুরাতে উপযুক্ত কাজের অপ্রাপ্যতা। এই অভিযাত্রাসমূহ মঙ্গল-অমঙ্গল দুই-ই সাধন করল। কিন্তু নিট ফলাফল হল পুরো পৃথিবীকে এক সূত্রে গেঁথে ফেলা, আঞ্চলিকতা হ্রাস করা, মানব জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং আমাদের গ্রহ ও আমাদের নিজেদের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানকে অগ্রসর করে তোলা।

পাল—তোলা জাহাজের অভিযাত্রা এবং আবিষ্কারের নব যুগের প্রতীক-প্রতিম ছিল সপ্তদশ শতাব্দীর বিপ্লবী ডাচ্ রিপাবলিক। শক্তিধর স্প্যানিশ সাম্রাজ্য থেকে

** অথবা, একটি ভিন্ন রকমের তুলনা সৃষ্টির জন্য, একটি নিষ্ক্রিয় ডিম্বাণু ডিম্বনালিকে অতিক্রম করে নিজেকে জরায়ুতে প্রোথিত করতে যে সময় নেয়, তা অ্যাপোলো ১১-এর চাঁদে পৌছানোর সময়ের সমান ; এবং একটি পূর্ণ-মেয়াদি শিশু জন্মাতে যে সময় লাগে, তা ভাইকিং-এর চাঁদে পৌছানোর সময়ের সমান। প্লুটোর কক্ষপথের সীমা ছাড়িয়ে যেতে ভয়েজারের যে সময় লাগবে, মানুষের স্বাভাবিক আয়ু তার চাইতে দীর্ঘতর।

banglainternet.com

সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত এই জাতিটি এর সময়ের অন্য যে কোনো জাতির তুলনায় 'ইয়োরোপীয় এনলাইটমেন্ট'-এর ধারক হওয়ার ক্ষেত্রে হয়ে উঠল অধিকতর পরিপূর্ণ। এটি ছিল যুক্তিশীল, সুশৃঙ্খল এবং সৃজনশীল সমাজ। কিন্তু যেহেতু স্প্যানিশ বন্দর এবং জাহাজগুলো জড়িত ছিল ডাচ্ জাহাজ ব্যবসার সাথে, তাই ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্রটির অর্থনৈতিক মুক্তি নির্ভর করত বাণিজ্যিক পাল তোলা জাহাজের বহর নির্মাণ ও এদেরকে সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়ার মধ্যে।

ডাচ্ ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানি, যা ছিল একটি যৌথ সরকারি ও বেসরকারি এন্টারপ্রাইজ, পৃথিবীর সুদূর অঞ্চলসমূহে জাহাজ পাঠাল দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যসমূহ সংগ্রহ এবং ইয়োরোপে এগুলো পুনরায় বিক্রয় করে মুনাফা অর্জন করার জন্য। এরূপ অভিযাত্রাগুলোই ছিল প্রজাতন্ত্রটির জীবনীশক্তির উৎস। নৌ চার্ট এবং মানচিত্রসমূহের শ্রেণী বিভাগ করা হত রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা রূপে। প্রায়শই জাহাজগুলো যাত্রা করত গোপন নির্দেশাবলি নিয়ে। সহসা ডাচ্ জাতি ছড়িয়ে পড়ল এই গ্রহের সর্বত্র। আর্কটিক মহাসাগরের বার্নেন্টস সাগর এবং অস্ট্রেলিয়ার তাসমানিয়ার নামকরণ করা হল ডাচ্ নৌ ক্যাপ্টেনের নামানুসারে। এই অভিযাত্রাসমূহ স্রেফ বাণিজ্যিক শোষণই ছিল না, যদিও সেটি যথেষ্টই ছিল। ছিল বৈজ্ঞানিক অভিযাত্রার শক্তিশালী উপাদান এবং নতুন ভূমি, নতুন বৃক্ষরাজি, নতুন জনগোষ্ঠী আবিষ্কারের প্রবল উচ্ছ্বাস ; ছিল এর নিজেকে রক্ষার জন্যই জ্ঞানের অনুসন্ধিৎসা।

'আমস্টার্ডাম টাউনহল'টিই সপ্তদশ শতাব্দীর হল্যান্ডের আত্ম-প্রত্যয়ী এবং ধর্ম নিরপেক্ষ আত্ম-বিম্বকে প্রতিফলিত করে। এটি নির্মাণে প্রয়োজন ছিল জাহাজ-ভর্তি মার্বেল পাথরের। সে সময়ের একজন কবি এবং কূটনীতিক কনস্ট্যান্টিন হাইগেন্স লক্ষ করলেন যে, টাউনহলটি দূর করে দিল গোথিক বৈশিষ্ট্য। আজকের দিনের টাউনহলে রয়েছে অ্যাটলাসের এক মূর্তি, যাতে তিনি ধরে রেখেছেন নভোমণ্ডলকে, যা নক্ষত্ররাজিতে সাজানো। এর নিচেই রয়েছেন ন্যায়ের দেবতা, ঘোরাচ্ছেন একটি স্বর্ণ-তরবারি, দাঁড়িয়ে আছেন মৃত্যু-দেবতা এবং শান্তির দেবতা, পথে মাড়িয়ে যাচ্ছেন বাণিজ্য দেবতা অ্যাভারাইস এবং এনডাইকে। ওলন্দাজগণ (ডাচ্গণ), যাদের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ ছিল ব্যক্তিগত মুনাফা, এতদ্সত্ত্বেও বুঝেছিল যে, মুনাফার প্রতি অনিয়ন্ত্রিত অনুসন্ধিৎসা জাতির আত্মার প্রতি একটি হুমকি সৃষ্টি করল।

অ্যাটলাস এবং ন্যায় দেবতার নিচে টাউন হলের মেঝেতে হয়ত পাওয়া যাবে অপেক্ষাকৃত কম রূপকাশ্রয়ী প্রতীক। এটি অসাধারণ খচিত মানচিত্র, যার শুরু সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাবে বা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে, বিস্তৃত ছিল পশ্চিম আফ্রিকা থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত। সারাটা পৃথিবী ছিল হল্যান্ডেরই কর্মক্ষেত্র। এবং এই মানচিত্রে অতিরিক্ত বিনয়ের সাথে ওলন্দাজরা নিজেদেরকে উহ্য রাখল,

ইয়োরোপে তাদের অংশটির জন্য ব্যবহার করল কেবল পুরনো ল্যাটিন নাম বেলজিয়াম।

কোনো একটি বিশেষ বছরে অনেক জাহাজ পাড়ি দিয়ে ফেলত অর্ধেকটা পৃথিবী। আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে ইথিওপিয়ান সাগর, আফ্রিকার দক্ষিণ উপকূলে, মাদাগাস্কার প্রণালির অভ্যন্তরে, এবং ভারতের দক্ষিণ প্রান্ত অতিক্রম করে তারা জাহাজ নিয়ে গেল তাদের আগ্রহের একটি প্রধান কেন্দ্র, দারুচিনি দ্বীপে, যা আজকের দিনের ইন্দোনেশিয়া। সেখান থেকে কিছু অভিযাত্রা সম্পন্ন হল নিউ হল্যান্ডের দিকে, যার আজকের নাম অস্ট্রেলিয়া। কেউ কেউ মালাক্কা প্রণালি হয়ে ফিলিপাইন অতিক্রম করে অভিযাত্রা করল চীনের দিকে। আমরা মধ্য-সপ্তদশ শতাব্দীর এক বর্ণনা হতে জানতে পারি 'নেদারল্যান্ডের যুক্ত প্রদেশসমূহের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দূতাবাস সম্বন্ধে যা নিবেদিত ছিল গ্রান্ড টার্টার, চ্যাম, চীনের সম্রাটের জন্য।' ওলন্দাজ নাগরিক, দূত এবং নৌ-ক্যাপ্টেনগণ রাজকীয় পিকিং নগরে* আরো একটি সভ্যতার মুখোমুখি হয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল।

এর পূর্বে বা পরে আর কখনো হল্যান্ড বিশ্বশক্তি ছিল না ; একটি ক্ষুদ্র দেশ, যা এর নিজ বুদ্ধিবৃত্তির উপর নির্ভর করতে বাধ্য ছিল, এবং যার বৈদেশিক নীতি ধারণ করত একটি শক্তিশালী শান্তিবাদী উপাদান। প্রথাবিরোধী মতামতের প্রতি এর সহনশীলতার কারণে, এটি সেই সব বুদ্ধিজীবীদের জন্য ছিল এক স্বর্গ যারা ইয়োরোপের অন্যকোনো স্থান হতে সেন্সরশীপ এবং চিন্তার উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের কারণে উদ্বাস্তু হয়ে পড়েছিলেন—অনেকটা যুক্তরাষ্ট্রের মতো যারা ১৯৩০ এর দশকে নাৎসি-আধিপত্যে আক্রান্ত ইয়োরোপ হতে বুদ্ধিজীবীদের দেশান্তরীর ফলে চরমভাবে লাভবান হয়েছিল। তাই সপ্তদশ শতাব্দীর হল্যান্ড ছিল মহান ইহুদি দার্শনিক স্পিনোজা, যার প্রশংসা করেছিলেন আইনস্টাইন ; গণিত এবং দর্শনের ইতিহাসে এক কেন্দ্রীয় চরিত্র দেকার্তে ; রাজনৈতিক বিজ্ঞানী যিনি পেইন, হ্যামিল্টন, অ্যাডামস্, ফ্রাংকলিন এবং জেফারসন নামক দার্শনিকভাবে বিশেষ পক্ষ অবলম্বনকারী বিপ্লবীদের গ্রুপের উপর প্রভাব বিস্তারকারী, জন লক-এর জন্মস্থান। এর পূর্বে বা পরে শিল্পী, বিজ্ঞানী, দার্শনিক এবং গণিতজ্ঞদের এমন একটি গ্যালাক্সি দ্বারা কখনই হল্যান্ড মহিমান্বিত হয়নি। এটি ছিল বিখ্যাত চিত্রশিল্পী রেমব্রেন্ড, ভার্মির এবং ফ্র্যান্স হল্স ; অণুবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কারক, লিউয়েন হুক ; আন্তর্জাতিক আইনের প্রতিষ্ঠাতা গ্রোতিয়াস, আলোর প্রতিসরণের সূত্রের আবিষ্কারক ওয়াইলব্রর্ড স্নেলিয়াসের সময়কাল।

চিন্তার স্বাধীনতার ডাচ্ ঐতিহ্য অনুসারে লিডেন ইউনিভার্সিটি গ্যালিলিও নামক একজন ইতালীয় বিজ্ঞানীকে প্রফেসর পদ প্রস্তাব করল, যিনি তার

* আমরা এমনকি জানি, তারা রাজপ্রাসাদে কী উপহার নিয়ে এসেছিল। সম্রাজ্ঞীকে উপহার দেয়া হল 'ডুবুরীদের ছবির ছয়টি ছোটো সিন্দুক।' এবং সম্রাট গ্রহণ করলেন, 'দারুচিনির দুটি পাত্র।'

banglainternet.com

নব্যতান্ত্রিক মতামত,* পৃথিবী সূর্যের চারদিকে আবর্তিত হয় এবং এর বিপরীতটি নয়—প্রত্যাহার করার জন্য ক্যাথলিক চার্চের অত্যাচারের হুমকির মধ্যে ছিল। হল্যান্ডের সাথে গ্যালিলিওর তৈরি হল নিবিড় সম্পর্ক, এবং তার প্রথম নভো দূরবীক্ষণ যন্ত্র ছিল ডাচ্ ডিজাইনের একটি ছোটো টেলিস্কোপের উন্নত রূপ। এর সাহায্যে তিনি আবিষ্কার করেন সূর্যপৃষ্ঠের কালো দাগ, শুক্রের দশাসমূহ, চাঁদের গহ্বরগুলো, বৃহস্পতির চারটি বিশাল উপগ্রহ, যেগুলোকে এখন তাঁর নামানুসারে বলা হয় গ্যালিলীয়ান উপগ্রহ। ১৬১৫ সালে গ্র্যান্ড ডাচেস ক্রিস্টিনার কাছে লিখিত গ্যালিলিওর পত্রটিতে তার উপর গির্জার মনোভাবের ব্যাপারে তার নিজের বর্ণনা পাওয়া যায় :

> সিরিন হাইনেস জেনে থাকবেন যে, কয়েক বছর পূর্বে আমি নভোমণ্ডলে এমন অনেক বস্তু আবিষ্কার করেছি যেগুলো আমাদের কালের পূর্বে কখনো দৃষ্ট হয়নি। এই বিষয়গুলোর অভিনবত্ব, এবং তা থেকে জাত কিছু ফলাফল প্রথাগত দার্শনিকদের ধারণ করা ভৌত জগতের ধারণার সাথে স্ববিরোধী হয়ে উঠল, যথেষ্ট সংখ্যক প্রফেসর [যাদের মধ্যে অনেকেই পুরোহিত] আমার বিরুদ্ধে অবস্থান নিল—প্রকৃতি এবং বিজ্ঞানকে ভুল প্রমাণিত করার জন্য যেন আমি নিজ হাতে এগুলোকে নভোমণ্ডলে স্থাপন করেছি। মনে হয় তারা ভুলে যেতে চায় যে, জ্ঞাত সত্যের প্রসার অনুসন্ধান, প্রতিষ্ঠান এবং শিল্প সৃষ্টিকে উদ্দীপ্ত করে।"**

অভিযাত্রা-শক্তির হল্যান্ড এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হল্যান্ডের মাঝে সংযোগটি ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী। পাল তোলা জাহাজের উন্নয়ন উৎসাহিত করল সবধরনের প্রযুক্তিকে। জনগণ তাদের নিজ হাতে কাজ করাটাকে উপভোগ করল। উদ্ভাবনকে পুরস্কৃত করা হত। প্রাযুক্তিক অগ্রগতির জন্য প্রয়োজন ছিল যতটুকু সম্ভব

* ১৯৭৯ সালে পোপ দ্বিতীয় জন পল ৩৪৬ বছর পূর্বে 'হলি ইনকোয়িজিশন'-এর মাধ্যমে গ্যালিলিওকে দোষী সাব্যস্ত করার ব্যাপারে ভুল স্বীকার করে প্রস্তাব পেশ করেন।

** গ্যালিলিও (এবং কেপলার) সৌর-কেন্দ্রিক প্রকল্প উত্থাপনের ক্ষেত্রে যে সাহস দেখালেন তা অন্যদের আচরণে প্রকাশ পেল না, এমনকি তাদের মাঝেও না যারা ইয়োরোপের অপেক্ষাকৃত কম গোঁড়া মতাদর্শ সম্পন্ন অঞ্চলে বসবাস করছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, তখন হল্যান্ডে বসবাসরত রেনে দেকার্তে ১৬৩৪ সালের এপ্রিলে লিখিত পত্রে উল্লেখ করলেন :
নিঃসন্দেহে আপনি অবগত আছেন যে, সম্প্রতি গ্যালিলিও 'ইনকোয়িজিটর অব দ্য ফেইথ' কর্তৃক তিরস্কৃত হয়েছেন, এবং পৃথিবীর আবর্তন সংক্রান্ত তার মতামতটি নব্যতান্ত্রিক বলে অভিযুক্ত হয়েছে। আমি আপনাকে অবশ্যই বলতে চাই যে, আমি আমার গবেষণামূলক আলোচনা-গ্রন্থে সব বিষয় ব্যাখ্যা করেছি, যাতে পৃথিবীর আবর্তন-মতবাদও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এগুলো এত আন্তঃনির্ভরশীল ছিল যে, এদের কোনো একটি ভুল প্রমাণিত হলে অন্য সব মতামতই অসার হয়ে পড়বে। যদিও আমি মনে করি যে, এগুলো অত্যন্ত নিশ্চিত এবং চাক্ষুষ প্রমাণের উপর ভিত্তি করে বর্ণিত, তবু এ জগতের কোনো কিছুর বিনিময়েই আমি এদেরকে চার্চের কর্তৃপক্ষের বিপক্ষে দাঁড় করাব না... আমি শান্তিতে বাস করতে চাই এবং আমি যে জীবন শুরু করেছি সেটিকে চালিয়ে নিতে চাই এই উদ্দেশ্যে যে, 'সুষ্ঠু জীবনযাপন করতে হলে বেছে নিতে হবে জনান্তিকের জীবন।'

স্বাধীনভাবে জ্ঞানান্বেষণের, তাই হল্যান্ড হয়ে উঠল ইয়োরোপের পথিকৃৎ প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা, যারা অন্য ভাষার রচনাসমূহকে অনুবাদ করল এবং অন্যত্র নিষিদ্ধ বিষয়গুলোকে প্রকাশ করার অনুমতি দিল। নতুন নতুন স্থানে অভিযাত্রা এবং বিচিত্র সব সমাজের সাক্ষাৎ দাঁড়িয়ে দিল আত্মতুষ্টিকে, চিন্তাবিদদেরকে চ্যালেঞ্জ জানাল অর্জিত জ্ঞানকে পুনর্বিবেচনা করার জন্য এবং দেখাল যে, হাজার হাজার বছর ধরে যে ধারণাগুলো গৃহীত হয়ে আছে—উদাহরণস্বরূপ, ভূগোলের উপর—মূলত ছিল ত্রুটিপূর্ণ। যখন পৃথিবীর বেশির ভাগ অঞ্চল শাসিত হত রাজা এবং সম্রাটগণ কর্তৃক, তখন অন্য যে কোনো জাতির তুলনায় অধিকভাবে ডাচ্ প্রজাতন্ত্র শাসিত হত জনগণ কর্তৃক। সমাজের মুক্ত মানসিকতা এবং মনের স্বতস্ফূর্ততা, এর বস্তুগত অর্জন এবং অভিযাত্রার প্রতি এর দায়বদ্ধতা ও নতুন স্থানগুলোর সদ্ব্যবহার মানুষের উদ্যমের" মাঝে জাগিয়ে তুললো এক আনন্দময় আত্মবিশ্বাস।

ইতালিতে গ্যালিলিও ঘোষণা করলেন অন্য গ্রহগুলোর কথা, এবং জিয়োর্দানো ব্রুনো অনুমান করলেন অন্যসব প্রাণরূপ নিয়ে। এজন্য তারা নির্মমভাবে যন্ত্রণা ভোগ করলেন। কিন্তু হল্যান্ডে, জ্যোতির্বিদ ক্রিশ্চিয়ান হাইগেন্স, যিনি উভয়টিতেই বিশ্বাস করতেন, এজন্য হলেন সম্মানিত। তার পিতা ছিলেন কনস্ট্যান্টিন হাইগেন্স, যিনি ছিলেন তার কালের একজন দক্ষ কূটনীতিক, একজন সাহিত্যিক, কবি, কম্পোজার, সংগীতজ্ঞ, ইংরেজ কবি জন ডানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং অনুবাদক, এবং একটি মহান পরিবারের প্রধান। কনস্ট্যান্টিন প্রশংসা করলেন চিত্রশিল্পী রুবেন্সের এবং "আবিষ্কার করলেন" রেমব্র্যান্ত ভ্যান রিন নামে এক তরুণ চিত্রকরকে, এর ফলশ্রুতিতে যার কিছু কাজে তিনি উপস্থাপিত হন। প্রথম সাক্ষাতের পর দেকার্তে তার সম্বন্ধে বললেন : 'আমি বিশ্বাস করতে পারলাম না যে একটি একক মন এত কিছু ধারণ করতে পারে, এবং তাদের সবার সাথে এত ভালোভাবে সংস্থাপিত হতে পারে।' হাইগেন্সের বাড়ি পূর্ণ ছিল পৃথিবীর সব স্থানের দ্রব্যাদি দ্বারা। অন্যান্য জাতির কৃতী চিন্তাবিদগণ প্রায়শই তার আতিথ্য গ্রহণ করেন। এমন একটি পরিবেশে বড়ো হতে হতে, তরুণ ক্রিশ্চিয়ান হাইগেন্স বিভিন্ন ভাষা, চিত্রাংকন, আইন বিজ্ঞান, প্রকৌশল, গণিত এবং সংগীতে দক্ষ হয়ে উঠলেন। তার আগ্রহ এবং নিষ্ঠা ছিল ব্যাপক। 'পৃথিবীটি আমার দেশ', তিনি বললেন, 'বিজ্ঞান আমার ধর্ম।'

আলো ছিল সেই সময়ের এক প্রধান বিষয় : চিন্তা ও ধর্মের স্বাধীনতার আলোকময়তা এবং ভৌগলিক আবিষ্কারের প্রতীকী সেই আলো যা তখনকার

* এই অনুসন্ধানমূলক ভ্রমণের ঐতিহ্যটির কারণে হল্যান্ড আজ পর্যন্ত দিতে পেরেছে বিখ্যাত জ্যোতির্বিদদের অনেককেই, এদের মধ্যে রয়েছে জেরার্ড পিটার ক্যুপার, যিনি ১৯৪০ এবং ১৯৫০-এর দশকে ছিলেন পৃথিবীর একমাত্র পূর্ণকালীন গ্রহ-জ্যোতির্পদার্থবিদ। তখন বেশির ভাগ পেশাদার জ্যোতির্বিদ বিষয়টিকে নিদেনপক্ষে খ্যাতিহীন বলে মনে করতেন, লাওয়েনীয় অতিশয়োক্তির প্রভাবে। ক্যুপারের ছাত্র হতে পেরে আমি তার প্রতি কৃতজ্ঞ।

banglainternet.com

চিত্রকর্মে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করত, বিশেষত ভার্মিরের অপরূপ সুন্দর কাজে ; বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের একটি বিষয় হিসেবে ; যেমন প্রতিসরণ সংক্রান্ত নেলের কাজ, লিউয়েন হুকের অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার এবং হাইগেন্‌সের আলোর তরঙ্গ তত্ত্ব।" এগুলোর সবকিছুই ছিল পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত, এবং এগুলোর অনুশীলনকারীরা মুক্তভাবে পরস্পরের সাথে মিশে গেলেন। ভার্মিরের গৃহাভ্যন্তরের সজ্জা বৈশিষ্ট্যগতভাবেই পরিপূর্ণ ছিল নৌ চালনা সংক্রান্ত বিভিন্ন বস্তু এবং দেয়াল মানচিত্র দ্বারা। অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছিল বসার ঘরের আগ্রহের বিষয়বস্তু। লিউয়েন হুক ছিলেন ভার্মিরের ভূ-সম্পত্তির একজন নির্বাহী এবং হোফ্ উইজ্‌কে অবস্থিত হাইগেন্‌সের বাড়িতে ছিলেন এক নিয়মিত পরিদর্শক।

লিউয়েন হুকের অণুবীক্ষণ যন্ত্রটি বিবর্তিত হয়েছিল কাপড়ের গুণাগুণ পরীক্ষা করার জন্য ব্যবহৃত বিবর্ধক কাচ হতে। এর সাহায্যে এক ফোঁটা পানির মধ্যে তিনি আবিষ্কার করলেন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডটিকে : অণুজীবসমূহ, যেগুলোকে তিনি বর্ণনা করলেন 'অণুবীক্ষণিক প্রাণী' রূপে। হাইগেন্‌স ভূমিকা রেখেছিলেন প্রথম দিকের অণুবীক্ষণযন্ত্রগুলোর ডিজাইন তৈরিতে এবং এগুলোর সাহায্যে তিনি নিজে কতকগুলো আবিষ্কার সম্পন্ন করেন। লিউয়েন হুক এবং হাইগেন্‌সই প্রথম পর্যবেক্ষণ করলেন মানুষের শুক্র কোষ, মানুষের প্রজনন অনুধাবনের জন্য যা ছিল পূর্বাবশ্যক। স্ফুটন প্রক্রিয়ায় পূর্বেই জীবাণুমুক্ত পানিতে কীভাবে ধীরে ধীরে জন্ম লাভ করে অণুজীব সত্তাসমূহ, তা ব্যাখ্যা করার জন্য হাইগেন্‌স প্রস্তাব করলেন যে,

* আইজাক নিউটন গুণমুগ্ধ ছিলেন ক্রিস্টিয়ান হাইগেন্‌সের এবং তাকে তাদের সময়ের 'শ্রেষ্ঠতম গণিতজ্ঞ' ও প্রাচীন গ্রিকদের গণিত-ঐতিহ্যের পরম অনুসারী বলে ভাবতেন—যা এক উদার প্রশংসা। নিউটন বিশ্বাস করতেন যে, যেহেতু ছায়ার রয়েছে ভীক্ষ্ণ প্রান্ত, তাই আলো যেন ক্ষুদ্র কণাগুলোর এক প্রবাহের মতো। তিনি ভেবেছিলেন যে, লাল বর্ণের আলো বৃহত্তম কণাসমূহ দ্বারা এবং বেগুনি বর্ণের আলো ক্ষুদ্রতম কণাসমূহ দ্বারা গঠিত। হাইগেন্‌স ভিন্ন মত পোষণ করে বললেন যে, আলো শূন্যের ভিতর দিয়ে সঞ্চালনশীল এক তরঙ্গের মতো, যেমনটি ঘটে থাকে সমুদ্রের তরঙ্গের ক্ষেত্রে—একারণেই আমরা আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য এবং কম্পাংক নিয়ে কথা বলে থাকি ; অপবর্তনসহ আলোর অনেক ধর্ম সাধারণত তরঙ্গ-তত্ত্বের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হয়, এবং এর পরবর্তী বছরগুলোতে হাইগেন্‌সের তত্ত্বই অনুসরণ করা হল। কিন্তু ১৯০৫ সালে আইনস্টাইন দেখালেন যে, আলোর কণাতত্ত্ব আলোক-তড়িৎ ক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারে, যা হল আলোক রশ্মি ব্যবহার মাধ্যমে ধাতব পদার্থ হতে ইলেকট্রনের নির্গমন ঘটানো। আধুনিক কোয়ান্টাম বল বিদ্যা উভয় ধারণাকে সমন্বিত করেছে, এবং আজকের দিনে এটি ভাবাই স্বাভাবিক যে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে আলো আচরণ করে কতকগুলো কণার সমষ্টি রূপে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে তরঙ্গের মতো। এই তরঙ্গ-কণা দ্বৈতবাদ হয়ত তৎক্ষণাৎ আমাদের সাধারণ চিন্তার সাথে মিলে যায় না, কিন্তু বিভিন্ন পরীক্ষণে আলো যেই আচরণ করে তার এটি চমৎকার সংগতি রক্ষা করে। বিপরীতের এই মিলনের মাঝে রয়েছে রহস্যময় এবং আলোড়ন সৃষ্টিকারী কোনো কিছু, এবং এটি খুবই মানানসই যে, নিউটন এবং হাইগেনস, এই দুই চিরকুমার হলেন আলোর প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের আধুনিক উপলব্ধির জনক।

এগুলো এতটাই ক্ষুদ্র ছিল যে বায়ুতে ভেসে যেতে পারত এবং পানির উপর নেমে এসে পুনরুৎপাদন ঘটাত। এভাবে তাৎক্ষণিক উৎপাদনের একটি বিকল্প বংশবৃদ্ধি প্রতিষ্ঠা করলেন—মতামতটি ছিল এমন যে, প্রাণের উদ্ভব ঘটতে পারে, আঙুরের রসের গাজন বা মাংস পচনের সময়, যা পূর্ব থেকে অস্তিত্বশীল প্রাণের উপর কোনোক্রমেই নির্ভরশীল নয়।

দুই শতাব্দী পর লুই পাস্তুরের কালের পূর্ব পর্যন্ত হাইগেন্‌সের অনুমান সত্য বলে প্রমাণিত হল না। ভাইকিং কর্তৃক মঙ্গলে প্রাণের অনুসন্ধান লিউয়েন হুক এবং হাইগেন্‌সের উপায়টি ব্যতীত আরো অনেকভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব। তারা রোগের জীবাণু তত্ত্বের এবং এ কারণে আধুনিক চিকিৎসারও জনক। কিন্তু তাদের মনে কোনো ব্যবহারিক উদ্দেশ্য ছিল না। তারা একটি প্রাযুক্তিক সমাজে স্রেফ শখের বশে কিছু করার চেষ্টা করছিলেন।

সপ্তদশ শতাব্দীর হল্যান্ডে আবিষ্কৃত অণুবীক্ষণ যন্ত্র এবং দূরবীক্ষণ যন্ত্র, উভয়ই খুব ক্ষুদ্র এবং খুব বড়ো বস্তুর জগতে মানুষের দৃষ্টিতে এনে দিল যথেষ্ট প্রসার। অণু এবং গ্যালাক্সিগুলোর পর্যবেক্ষণ শুরু হল এই সময়ে এবং এই স্থানে। জ্যোতির্-তাত্ত্বিক দূরবীক্ষণ যন্ত্রের জন্য ক্রিশ্চিয়ান হাইগেন্‌স লেন্স চকচকে করতে পছন্দ করতেন এবং একটি পাঁচ মিটার লম্বা দূরবীক্ষণ যন্ত্র নির্মাণ করেন। দূরবীক্ষণ যন্ত্র নিয়ে তার আবিষ্কারগুলো মানুষের অর্জনের ইতিহাসে তার স্থান নিশ্চিত করে দিয়েছিল। এরাটোস্‌থেনেসের পদাংক অনুসরণ করে তিনিই প্রথম পরিমাপ করলেন কোনো গ্রহের আকৃতি। তিনিই প্রথম অনুমান করলেন যে, শুক্র গ্রহটি সম্পূর্ণভাবে মেঘাচ্ছাদিত ; প্রথম অংকন করলেন মঙ্গল-পৃষ্ঠের বৈশিষ্ট্য (সিইরিস মেজর নামক বায়ুতাড়িত এক বিশাল অন্ধকার ঢাল) ; এবং গ্রহটির আবর্তনের সাথে এরূপ বৈশিষ্ট্যের আগমন এবং বিলীন হওয়ার মাধ্যমে প্রথম নিরূপণ করলেন যে, আমাদের মতোই, মঙ্গলের দিবা-রাত্রি মিলে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা। তিনিই প্রথম বুঝতে পারলেন যে, শনির চারদিকে রয়েছে একটি বলয়-ব্যবস্থা, যা কোথাও স্পর্শ করে না গ্রহটিকে।* তিনি ছিলেন শনির সর্ববৃহৎ উপগ্রহ টাইটানের আবিষ্কারক, এখন আমাদের জানা মতে যা সৌর জগতের সর্ববৃহৎ উপগ্রহ—অসাধারণ কৌতূহল এবং সম্ভাবনার এক জগৎ। এ আবিষ্কারগুলোর বেশির ভাগ তিনি সম্পন্ন করেন অনূর্ধ্ব ত্রিশ বছর বয়সের মধ্যে। তিনি জ্যোতিষতত্ত্বের অসারতাও উপলব্ধি করেছিলেন।

হাইগেন্‌স করলেন আরো অনেক বেশি। সেকালে সমুদ্র যাত্রায় দ্রাঘিমাংশ নির্ণয় করা ছিল একটি কঠিন সমস্যা। নক্ষত্রগুলোর সাহায্যে সহজেই নির্ণয় করা

* গ্যালিলিও বলয়গুলো আবিষ্কার করেন, কিন্তু এগুলো সম্বন্ধে তার আর কোনো ধারণা ছিল না। তার আদি দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্য দিয়ে, এদেরকে শনির সাথে প্রতিসমভাবে সংযুক্ত দুটি অভিক্ষেপ বলে মনে হল, কিছুটা ধাঁধায় পড়ে তিনি এদেরকে কানের সদৃশ বলে উল্লেখ করলেন

banglainternet.com

যেত অক্ষাংশ—আপনি যত দক্ষিণে যাবেন, দক্ষিণের নক্ষত্রগুলোকে আপনি তত বেশি সংখ্যায় দেখতে পাবেন। কিন্তু দ্রাঘিমাংশের জন্য প্রয়োজন ছিল সূক্ষ্মভাবে সময় সংরক্ষণের। জাহাজে স্থাপিত কোনো সঠিক ঘড়ি আপনার নিজ বন্দর ত্যাগের সময় নির্দেশ করতে পারত ; সূর্যের উদয়-অস্ত এবং নক্ষত্রগুলো নির্দেশ করতে পারত জাহাজের স্থানীয় সময়কাল ; এ দুটোর পার্থক্য থেকে নিরূপিত হত আপনার দ্রাঘিমাংশ। হাইগেন্‌স আবিষ্কার করেন দোলঘড়ি (এর আগে এর মূলনীতি আবিষ্কৃত হয় গ্যালিলিও কর্তৃক), সম্পূর্ণ সফলভাবে না হলেও সেটি তখন প্রযুক্ত হল বিশাল মহাসমুদ্রের মাঝে জাহাজের অবস্থান হিসেব করার জন্য। তার প্রচেষ্টাসমূহ জ্যোতির্তাত্ত্বিক এবং অন্যান্য নৌ-ঘড়িতে এনে দিল নজিরবিহীন শুদ্ধতা। তিনি উদ্ভাবন করেন 'স্পাইর‍্যাল ব্যালেন্স স্প্রিং' যেটি আজও কিছু কিছু ঘড়িতে ব্যবহৃত হয় ; বলবিদ্যায় রাখল মৌলিক অবদান—যেমন, কেন্দ্রবিমুখী বলের হিসেব—এবং ছক্কার এক খেলা থেকে সম্ভাব্যতার তত্ত্ব পর্যন্ত। তিনি উন্নত করেন বায়ুপাম্প, যা পরবর্তীতে খনিশিল্পে বিপ্লব সাধন করেছিল, এবং 'যাদুর লণ্ঠন' যা ছিল স্লাইডপ্রোজেক্টরের আদিরূপ। তিনি 'বারুদের ইঞ্জিন' নামক কিছু একটা উদ্ভাবন করেন, যা আরো একটি যন্ত্র, স্টিম ইঞ্জিনের আবিষ্কারকে ত্বরান্বিত করে।

একটি গ্রহ হিসেবে পৃথিবী সূর্যের চারদিকে আবর্তিত হচ্ছে, হল্যান্ডের জনগণ কর্তৃক এই কোপার্নিকান মতামতটি উদারভাবে গৃহীত হওয়ায় হাইগেন্‌স উৎফুল্ল বোধ করলেন। তিনি বললেন, প্রকৃতপক্ষে কোপার্নিকাস গৃহীত হলেন প্রায় সকল জ্যোতির্বিদ কর্তৃক, কেবল তাদের কাছে ছাড়া যারা, 'ছিল কিছু ধীর-বুদ্ধির বা স্রেফ মানুষের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরোপিত সন্দেহ দ্বারা আচ্ছন্ন।' মধ্যযুগে, খ্রিষ্টান দার্শনিকগণ এই মতামত দিতে আগ্রহ বোধ করতেন যে, যেহেতু নভোমণ্ডলের সবকিছু প্রতিদিন একবার করে আবর্তন করে পৃথিবীর চারদিকে, এরা সংখ্যায় কোনোক্রমেই অসংখ্য হতে পারে না ; এবং তাই অসংখ্য জগৎ বা এদের অনেকগুলো (এমনকি এদের অন্য একটি) থাকা সম্ভব ছিল না। নভোলোক নয়, উপরন্তু পৃথিবীই আবর্তনশীল এই আবিষ্কারটি পৃথিবীর অনন্যতা এবং অন্যত্র প্রাণের সম্ভাব্যতার উপর তাৎপর্যময় ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করল। কোপার্নিকাসের ধারণা ছিল যে, শুধু সৌর জগত নয়, পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই ছিল সূর্য-কেন্দ্রিক, এবং কেপলার তা না মেনে বললেন যে, নক্ষত্রগুলোর রয়েছে নিজস্ব গ্রহ-ব্যবস্থা। বিপুল— প্রকৃত পক্ষে, অসীম সংখ্যক গ্রহ অন্যসব নক্ষত্রের চারদিকে অবস্থিত কক্ষপথগুলোতে আবর্তনরত—এই ধারণাটিকে প্রথম যিনি সুনির্দিষ্টভাবে প্রকাশ করলেন তিনি হলেন জিয়োর্দানো ব্রুনো। কিন্তু অন্যরা ভাবল যে, জগতের বহুত্বের ধারণাটি এসেছিল কোপার্নিকাস এবং কেপলার হতে এবং তারা নিজেদেরকে কোনঠাসা অবস্থায় আবিষ্কার করল। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে, রবার্ট মার্টন মতামত দিলেন যে, সৌর কেন্দ্রিক প্রকল্প নির্দেশ করল আরো অনেক গ্রহ-ব্যবস্থা এবং এটি এমন

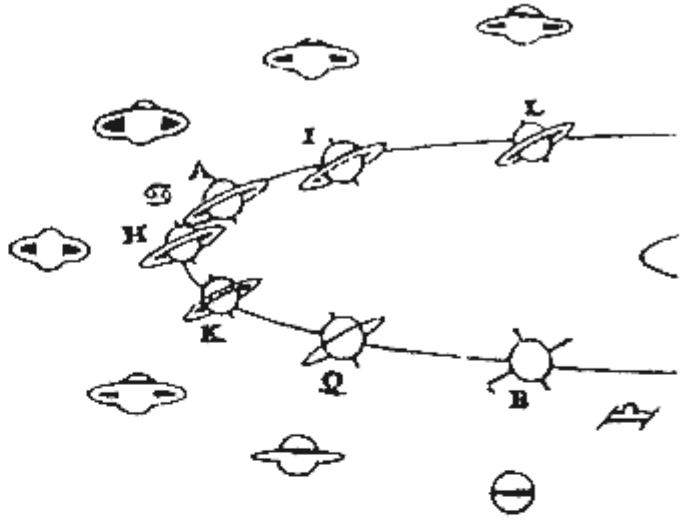

ক্রিশ্চিয়ান হাইগেন্‌সের 'সিস্টিমা স্যাটার্নিয়াম' হতে একটি বিস্তারিত তথ্য, যা প্রকাশিত হয় ১৬৫৯ সালে। পৃথিবী এবং শনির আপেক্ষিক জ্যামিতির পরিবর্তের সাথে সাথে বছরের পর বছর ধরে শনির বলয়গুলোর পরিবর্তনশীল অবয়বের সঠিক ব্যাখ্যা প্রদর্শিত হল। অবস্থান B তে তুলনামূলকভাবে কাগজের মতো সরু বলয়সমূহ হারিয়ে যায়, কারণ তখন এদেরকে দেখা হয় প্রান্ত রেখা বরাবর। অবস্থান A তে এরা পৃথিবী থেকে দর্শনযোগ্য সর্বোচ্চ মাত্রা প্রদর্শন করে, যে সজ্জাটি, গ্যালিলিও'র নিম্নমানের দূরবীক্ষণ যন্ত্রে যথেষ্ট সন্দেহ জাগিয়ে তুলেছিল।

ধরনের মতামত যার নাম, 'রিডাক্‌শিও অ্যাড অ্যাবসার্ডাম', পরিশিষ্ট-১) এবং যা প্রাথমিক ধারণাসমূহের ত্রুটিকে প্রকাশ করল। তিনি লিখলেন, এমন এক ধারণায় একদা যাকে মনে হত বিবর্ণ,

> যদি নভোমণ্ডলটি এত বিশাল হয়, কোপার্নিকাসের বর্ণনার মতো যদি পূর্ণ হয় অসংখ্য নক্ষত্র দ্বারা, বিস্তৃতিতে হয় অসীম...তবে আমরা কেন মনে করব না যে, নভোমণ্ডলে দৃশ্যমান অসংখ্য নক্ষত্র হয়ে উঠবে অনেকগুলো সূর্য, যাদের থাকবে সুনির্দিষ্ট কেন্দ্র ; তাদের অধীনস্ত গ্রহগুলোর মতো, যেমনটি রয়েছে সূর্যের। এবং ফলাফলস্বরূপ রয়েছে অসংখ্য বসতিময় গ্রহ ; কেন নয় ?... এটি এবং এরকম উদ্ধত ও সাহসী উদ্যোগ আর অদ্ভুত ধাঁধাসমূহের সমর্থনে কেপলার... এবং অন্যরা বলে পৃথিবীর গতির কথা।

কিন্তু পৃথিবী গতিশীল। যদি আজ মার্টন বেঁচে থাকতেন, 'অসংখ্য, বসতিময় গ্রহ' সম্বন্ধে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হতেন। হাইগেন্‌স এই উপসংহার দ্বারা দ্বিধান্বিত হয়ে পড়লেন না ; তিনি একে সানন্দে স্বাগত জানালেন : মহাশূন্যের সমুদ্রে নক্ষত্রগুলো হল অন্য সূর্য। আমাদের সৌর জগতের সাথে সাদৃশ্য রেখে

banglainternet.com

হাইগেন্‌স যুক্তি দেখালেন যে, সেই নক্ষত্রগুলোর রয়েছে নিজস্ব গ্রহ-ব্যবস্থা এবং হয়ত এই গ্রহগুলোর অনেকগুলোই বসতিময় : আমরা কি গ্রহগুলোকে কেবল বিশাল মরুভূমি বলেই স্বীকৃতি দেব... এবং এদেরকে সেই সব সৃষ্টি থেকে বঞ্চিত করব যাদের রয়েছে অপরূপ সুষমা, যদি আমরা এগুলোকে পৃথিবীতেই লুকিয়ে রাখি সৌন্দর্য ও মর্যাদায়, তবে তা হবে খুব অযৌক্তিক।'*

এই ধারণাসমূহ প্রথম প্রকাশিত হল একটি অসাধারণ গ্রন্থে, যার নাম ছিল 'দ্য সিলেস্টিয়াল ওয়ার্ল্ডস ডিসকাভার্ড : কনজেক্‌চারস কনসার্নিং দ্য ইনহ্যাবিট্যান্টস, প্ল্যান্টস এন্ড প্রোডাক্‌শানস অব দ্য ওয়ার্ল্ডস ইন দ্য প্ল্যানেট্‌স।' হাইগেন্‌সের কিছুকাল পূর্বে ১৬৯০ সালে প্রকাশিত গ্রন্থটির প্রশংসা করেছিলেন অনেকেই, এর মধ্যে ছিলেন জার পিটার দ্য গ্রেট, যিনি এটিকে প্রথম পশ্চিমা বই হিসেবে রাশিয়াতে প্রকাশিত হতে দিয়েছিলেন। বইটি এর বৃহদাংশে গ্রহগুলোর প্রকৃতি এবং পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয় ধারণ করে। চমৎকারভাবে উপস্থাপিত প্রথম সংস্করণটির চিত্রগুলোর একটিতে আমরা দেখতে পাই সূর্য এবং বিশাল দুটি গ্রহ বৃহস্পতি ও শনিকে। কিন্তু এরা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আকৃতিতে প্রকাশিত। আমাদের গ্রহ সেখানে এক অতিক্ষুদ্র বৃত্তের মতো।

মোটামুটিভাবে, হাইগেন্‌স অন্যান্য গ্রহগুলোর পরিবেশ এবং অধিবাসীদেরকে সপ্তদশ শতাব্দীর পৃথিবীর মতো বলে কল্পনা করেছিলেন। তিনি এমন 'গ্রহবাসীদের' কথা ভাবলেন যাদের "পুরো শরীর এবং এর বিভিন্ন অংশগুলো হয়ত আমাদের তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের...এটি খুবই হাস্যকর মতামত...আমরা ব্যতীত অন্য কারো মধ্যে যুক্তিশীল 'চেতনা' বিরাজ করা অসম্ভব।" তিনি বললেন, আপনি দেখতে অসুন্দর হলেও হতে পারেন স্মার্ট। কিন্তু এরপর তিনি ভিন্ন মতামত দিতে থাকলেন যে, তারা হয়ত দেখতে খুব উদ্ভট নয় কারণ তাদের অবশ্যই থাকবে হাত-পা এবং তারা হাঁটবে সোজা হয়ে, কারণ তাদের থাকবে লিখন-পদ্ধতি এবং জ্যামিতি, কারণ জোভিয়ান সমুদ্রে নাবিকদেরকে নৌ-সুবিধাদি দেয়ার জন্য বৃহস্পতির রয়েছে চারটি গ্যালিলিয়ান উপগ্রহ। অবশ্যই হাইগেন্‌স ছিলেন তার সময়ের এক নাগরিক। আমাদের কে তা নয় ? তিনি বিজ্ঞানকে দাবি করতেন তার ধর্মরূপে এবং অতঃপর তিনি মতামত দিলেন যে, গ্রহসমূহ অবশ্যই বসতিময়, কারণ অন্যথায় ঈশ্বর গ্রহগুলো সৃষ্টি করেছেন অনর্থক। যেহেতু তিনি ছিলেন ডারউইনপূর্ব প্রজন্মের, তাই ভিন্ গ্রহের প্রাণ সম্বন্ধে তার অনুমানসমূহ ছিল বিবর্তনের দৃষ্টিভঙ্গি বর্জিত। কিন্তু পর্যবেক্ষণমূলক ভিত্তির উপর তিনি এমন কিছু প্রতিষ্ঠা করলেন যা আধুনিক মহাজাগতিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সাদৃশ্যময় :

* আরো কয়েকজনের ছিল একই মতামত। কেপলার তার, 'Harmonie Mundi' তে উল্লেখ করলেন যে, 'গ্রহগুলোর শূন্য তেপান্তরের ব্যাপারের টাইকো ব্রাহের ধারণা ছিল যে, এগুলো শুধু শুধুই পড়ে নেই, বরং বসতিময়।'

> আমরা পেয়েছি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অপরূপ ব্যাপ্তির কী বিস্ময়কর ব্যবস্থা...এত সব নক্ষত্র, এত সব গ্রহ...এবং এদের প্রতিটিতে রয়েছে কত না গুল্মলতা, বৃক্ষরাজি এবং পশুপাখি, অলংকৃত হয়েছে কত না সমুদ্র এবং পর্বতমালা দ্বারা !...এবং আমাদের বিস্ময় এবং প্রশংসা কত যে বেড়ে যাবে যখন আমরা ভাবতে পারব নক্ষত্রগুলোর বিপুল দূরত্ব এবং সংখ্যা নিয়ে।

অনুসন্ধানের সেইসব পাল তোলা জাহাজের অভিযাত্রার এবং ক্রিশ্চিয়ান হাইগেন্‌সের বৈজ্ঞানিক এবং অনুমানভিত্তিক ঐতিহ্যের উত্তর-প্রজন্ম হল ভয়েজার মহাকাশযান। ভয়েজারগুলো নক্ষত্র অভিমুখে যাত্রাকারী এক ধরনের হালকা জাহাজের মতো এবং এদের যাত্রা পথে এরা অনুসন্ধান চালাচ্ছে সেসব গ্রহে যেগুলোকে হাইগেন্‌স এত ভালো জানতেন ও এত ভালোবাসতেন।

শতাব্দী পূর্বের সেই সব অভিযাত্রার অন্যতম প্রাপ্তি ছিল পরিব্রাজকদের কাহিনী*, ভিন্ দেশের উপাখ্যান এবং বিপুলায়তন সৃষ্টি যেগুলো যা জাগিয়ে তুলল আমাদের বিস্ময়-বোধকে এবং উদ্দীপ্ত করে তুলল ভবিষ্যতের অনুসন্ধানের ইচ্ছাকে। বর্ণনা ছিল পর্বতমালার যেগুলো ছুঁয়ে ফেলেছিল আকাশকে ; ছিল ড্রাগন এবং সমুদ্র-দানবেরা ; স্বর্ণের তৈরি নিত্য ব্যবহার্য খাবারের সরঞ্জাম ; নাকের বদলে একটি বাহু বিশিষ্ট জন্তু ; ছিল এমন সব জনতা যারা প্রোটেস্ট্যান্ট, ক্যাথলিক ইহুদি এবং মুসলমানদের মধ্যে মতাদর্শগত বিরোধকে তুচ্ছ জ্ঞান করত ; ছিল এক পুড়ে যাওয়া কালো পথার ; ছিল মস্তকহীন মানুষ যাদের মুখ থাকত বক্ষদেশে ; ছিল বৃক্ষের উপর জন্ম নেয়া ভেড়া। এই উপাখ্যানগুলোর কিছু ছিল সত্য, কিছু ছিল মিথ্যা। অন্যগুলোর ছিল একটি সত্য মর্মস্থল, কিন্তু যেগুলোকে ভুল বুঝেছিল বা অতিরঞ্জিত করেছিল অভিযাত্রীগণ বা তাদেরকে তথ্য সরবরাহকারীরা। যেমন, ভলতেয়ার বা জোনাথন সুইফ্‌টের হাতে, এই বর্ণনাগুলো ইয়োরোপীয় সমাজে জাগিয়ে তুলল এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, সেই সংকীর্ণ জগৎ সম্বন্ধে শুরু হল পুনর্বিবেচনা।

এ কালের ভয়েজারগুলোও দিয়েছে পরিব্রাজকের উপাখ্যান, এমন এক গ্রহের উপাখ্যান যা স্ফটিক-গোলকের সাথে তুলনীয় ; যার পৃষ্ঠদেশ মেরু থেকে মেরু পর্যন্ত মাকড়শার জালের মতো কিছু দ্বারা আচ্ছাদিত ; ক্ষুদ্র উপগ্রহগুলো আলুর আকৃতি সম্পন্ন ; এমন এক গ্রহ যার রয়েছে ভূ-নিম্নস্থ সমুদ্র ; যার ভূমিতে রয়েছে পচা ডিমের গন্ধ এবং দেখতে অনেকটা পিজ্জা পাইয়ের মতো ; রয়েছে গলিত

* এরূপ কাহিনীগুলো মানুষের এক প্রাচীন ঐতিহ্য ; অনুসন্ধানমূলক অভিযানগুলোর শুরু থেকেই এদের অনেকগুলোর ছিল এক মহাজাগতিক বৈশিষ্ট্য। উদাহরণ স্বরূপ, পঞ্চদশ শতকে চীনের মিং ডাইনেস্টি কর্তৃক পরিচালিত ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলংকা, ভারত, আরব এবং আফ্রিকা অভিযান সংক্রান্ত যেই সিনের বর্ণনা মতে, অংশগ্রহণকারীদের একজন সম্রাটের জন্য তৈরি করলেন এমন এক ছবি যা ছিল 'নক্ষত্রময় রাতের ভেলায় বিজয়ীর দৃষ্টি।' যদিও আদি পাঠ নয়, তবু ছবিগুলো হারিয়ে গেল।

banglainternet.com

সালফারের হ্রদ এবং অগ্নিগিরির অগ্ন্যুৎপাত যা থেকে নির্গত ধোঁয়া সরাসরি মিশে যাচ্ছে শূন্যে ; বৃহস্পতি নামক এক গ্রহ যা আমাদের গ্রহকে বামন প্রতিপন্ন করে—এতটাই বিশাল যে এর ভেতরে ঢুকে যাবে ১০০০ টি পৃথিবী।

বৃহস্পতির গ্যালিলীয় উপগ্রহগুলোর প্রতিটি প্রায় বুধ গ্রহটির সমান। আমরা এদের আকৃতি ও ভর পরিমাপ করতে পারি এবং এভাবে এদের ঘনত্ব নির্ণয় করতে পারি, যা এদের অভ্যন্তরীণ উপাদানসমূহ সম্বন্ধে কিছু তথ্য দিতে পারে। আমরা দেখতে পাই যে, অন্তঃস্থ উপগ্রহদ্বয়—আইও এবং ইউরোপার ঘনত্ব একটি শিলাখণ্ডের ঘনত্বের সমান। বহিঃস্থদ্বয়—গ্যানিমিড এবং ক্যালিস্টোর ঘনত্ব অপেক্ষাকৃত কম, শিলা এবং বরফের মাঝামাঝি। কিন্তু এই বহিঃস্থ উপগ্রহগুলোর ভিতর বরফ এবং শিলার মিশ্রণ অবশ্যই ধারণ করবে তেজস্ক্রিয় খনিজ, যেগুলো উত্তপ্ত করে তোলে এদের পরিপার্শ্বকে, যেমনটি রয়েছে পৃথিবীতে। বিলিয়ন বিলিয়ন বছর ধরে জমে থাকা এই তাপের পক্ষে পৃষ্ঠে পৌঁছে শূন্যে হারিয়ে যাওয়ার কোনো কার্যকর পন্থা নেই, এবং তাই গ্যানিমিড ও ক্যালিস্টোর অভ্যন্তরস্থ তেজস্ক্রিয়তা এদের বরফময় অন্তর্ভাগকে অবশ্যই গলিয়ে দিয়ে থাকবে। আমরা এই উপগ্রহসমূহে পূর্বানুমান করতে পারি নরম তুষার ও পানির ভূ-নিম্নস্থ সমুদ্র, গ্যালিলিয় উপগ্রহগুলোর পৃষ্ঠসমূহকে নিকট থেকে দেখার পূর্বে এটি একটি ইঙ্গিত যে, এরা একটি অপরটি হতে অত্যন্ত ভিন্ন রকমের। যখন আমরা ভয়েজারের চোখ দিয়ে নিবিড়ভাবে দেখি, তখন এই অনুমানটি সত্য বলে নিশ্চিত হয়। এদের একটির সাথে অপরটির সাদৃশ্য নেই। আমরা এর পূর্বে যত গ্রহ-উপগ্রহ দেখেছি এরা তাদের যে কোনোটি থেকেই ভিন্ন রকমের।

ভয়েজার—২ মহাকাশযানটি আর কখনোই পৃথিবীতে ফিরে আসবে না। কিন্তু এর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানসমূহ এর মহাকাব্যিক আবিষ্কারগুলো, এর ভ্রমণকারীদের উপাখ্যানগুলো ফিরে আসে। উদাহরণস্বরূপ, ধরুন, ১৯৭৯ সালের ৯ জুলাইয়ের কথা। ৮.০৪ প্যাসিফিক স্ট্যান্ডার্ড টাইমের এক ভোরে, ইউরোপা নামক এক নতুন জগতের ছবি পৃথিবীতে গৃহীত হল।

বহিঃ সৌর জগৎ হতে কীভাবে একটি ছবি আমাদের কাছে আসে ? সূর্যালোক আলো ছড়ায় ইউরোপাতে যখন এটি এর কক্ষপথে বৃহস্পতির চারদিকে আবর্তনশীল এবং পুনরায় প্রতিফলিত হয় শূন্যে, যেখানে এর কিছু অংশ আঘাত করে ভয়েজার টেলিভিশন ক্যামেরার ফসফরসমূহে, উৎপন্ন করে একটি বিম্ব। বিম্বটি পরীক্ষিত হয় ভয়েজার কম্পিউটারসমূহ দ্বারা, বেতার তরঙ্গের মাধ্যমে একে পাঠিয়ে দেয়া হয় অর্ধ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এক বেতার দূরবিনে, যা পৃথিবীর এক ভূ-স্টেশন। এরকম একটি আছে স্পেনে, একটি দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার মোজেইভ মরুভূমিতে এবং একটি অস্ট্রেলিয়াতে। (১৯৭৯ সালের জুলাইয়ের সেই

সকালে অস্ট্রেলিয়ারটিকে ঘুরিয়ে দেয়া হয়েছিল বৃহস্পতি এবং ইউরোপার দিকে।) তখন এটি পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপিত একটি যোগাযোগ উপগ্রহের মাধ্যমে চলে যায় দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়াতে যেখানে এটি কতকগুলো মাইক্রোওয়েভ রিলে টাওয়ারের সাহায্যে সঞ্চালিত হয় জেট প্রোপালশন ল্যাবরেটরির একটি কম্পিউটারে, যেখানে এর প্রক্রিয়াকরণ সম্পন্ন হয়। ছবিটি মূলত সংবাদপত্রের একটি তারছবির মতো, যা হয়ত এক মিলিয়ন স্বতন্ত্র দাগের মাধ্যমে গঠিত যাদের প্রতিটি ধূসর বর্ণের ভিন্ন ভিন্ন বিশ্ব, এতটা সূক্ষ্ম ও ঘন সন্নিবিষ্ট যে, একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে দাগসমূহ অদৃশ্য হয়ে পড়ে। আমরা কেবল এদের সামষ্টিক ফলাফলটি দেখতে পাই। মহাকাশযান হতে প্রাপ্ত তথ্য এটিই নির্দেশ করে যে, দাগগুলো কতটুকু উজ্জ্বল বা অনুজ্জ্বল হবে। প্রক্রিয়াকরণের পর দাগগুলোকে সংরক্ষণ করা হয় একটি চৌম্বক ডিস্কের উপর, যা অনেকটা ফোনোগ্রাফ রেকর্ডের মতো। বৃহস্পতি ব্যবস্থায় প্রায় আঠারো হাজার ছবি গৃহীত হয়েছে ভয়েজার-১ কর্তৃক, যেগুলো এরূপ চৌম্বক ডিস্কে সংরক্ষিত, এবং ভয়েজার-১ এর জন্য রয়েছে একটি সমতুল্য নম্বর। অবশেষে সংযোগ ও রিলের এই গুরুত্বপূর্ণ সেটটির শেষ ফলাফলটি হল উজ্জ্বল কাগজের একটি পাতলা টুকরা, এক্ষেত্রে যা প্রকাশ করল ইউরোপার বিস্ময়, যা মানব ইতিহাসে প্রথমবারের মতো রেকর্ডকৃত, প্রক্রিয়াজাত এবং পরীক্ষিত হল ১৯৭৯ সালের ৯ জুলাই।

আমরা এসকল ছবিতে যা দেখলাম তা ছিল বিস্ময় জাগানো। ভয়েজার-১ এনে দিয়েছিল বৃহস্পতির অন্য তিনটি গ্যালিলীয় উপগ্রহের অসাধারণ চিত্রকল্প। কিন্তু ইউরোপার নয়। প্রথমবারের মতো অতি নিকট থেকে ছবি তোলার দায়িত্ব পড়েছিল ভয়েজার-২-এর উপর, যেখানে আমরা মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরের বস্তুগুলোকে দেখতে পাই। প্রথম দৃষ্টিতে, পার্সিভাল লাওয়েল মঙ্গলকে অলংকৃত করা যে ক্যানাল নেটওয়ার্ক কল্পনা করেছিলেন, স্থানটিকে সেরকম কিছু মনে হল না এবং মহাকাশযানগুলোর অনুসন্ধান থেকে এখন আমরা যাকে অস্তিত্বহীন বলে জানি। আমরা ইউরোপাতে দেখতে পাই পরস্পরচ্ছেদী সরল এবং বক্র-রেখার এক আশ্চর্যজনক ও জটিল নেটওয়ার্ক। এগুলো কি এমন কোনো ভূমি-রেখা—যেগুলো উত্তোলিত ? এগুলো কি খাদের মতো অবতল কোনো কিছু ? এরা কীভাবে সৃষ্টি হল ? এরা কি গ্রহটির টেক্টোনিক ব্যবস্থার অংশ বিশেষ যা সৃষ্টি হয়েছিল প্রসারণ বা সংকোচনশীল গ্রহটির ভেঙে যাওয়ার ফলে ? এরা কি পৃথিবীর প্লেট টেক্টোনিক্সের সাথে সম্পর্কিত ? এরা বৃহস্পতি ব্যবস্থার অন্যান্য উপগ্রহগুলোর কিরূপ আলো ছড়িয়ে দেয় ? আবিষ্কারের মুহূর্তে আস্ফালিত প্রযুক্তি বিস্ময়কর কিছু একটা করেছে বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু এটি অনুধাবন করতে প্রয়োজন পড়ল মানব মস্তিষ্ক নামক আর একটি যন্ত্রের। দাগগুলোর নেটওয়ার্ক থাকা সত্ত্বেও ইউরোপাকে দেখাল একটি বিলিয়ার্ড বলের মতো মসৃণ। অভিঘাত গহ্বরের অনুপস্থিতির কারণ হয়ত অভিঘাত

banglainternet.com

স্থলের উপর দিয়ে তাপ এবং পৃষ্ঠের বরফের প্রবাহ। রেখাসমূহ হল খাঁজ বা ফাটল, মিশনের এতদিন পরেও যাদের উৎপত্তি নিয়ে বিতর্ক রয়েছে।

ভয়েজার মিশনগুলো যদি মনুষ্যবাহী হত, তবে এর ক্যাপ্টেন হয়ত সংরক্ষণ করতেন জাহাজের লগ, এবং লগটি, যা হত ভয়েজার-১ এবং ২-এর ঘটনাসমূহের সমন্বয়, হয়ত পড়তে শোনাতো এরূপ :

১ম দিবস। যে সকল প্রস্তুতি এবং যন্ত্রপাতি ঠিক মতো কাজ করবে না বলে মনে হল তাদের নিয়ে অনেক দুশ্চিন্তার পর আমরা সাফল্যের সাথে উৎক্ষিপ্ত হলাম কেপ ক্যানাভেরাল হতে এবং গ্রহ-নক্ষত্রের উদ্দেশে শুরু হল আমাদের দীর্ঘ যাত্রা।

২য় দিবস। বৈজ্ঞানিক স্ক্যান প্ল্যাটফর্মকে যে ঝুমটি ধরে রাখে তাতে সমস্যা দেখা গেল। যদি সমস্যাটির কোনো সমাধান না হত তবে আমাদের ছবিগুলো এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক উপাত্তের বেশির ভাগই আমরা হারিয়ে ফেলতাম।

১৩ তম দিবস। আমরা পেছনে তাকালাম এবং মহাশূন্যে গ্রহ-উপগ্রহ হিসেবে একত্রে পৃথিবী এবং চাঁদের প্রথম আলোকচিত্র গ্রহণ করলাম। এক চমৎকার যুগল।

১৫০ তম দিবস। মধ্য গতিপথে একটি ত্রুটি দূর করার জন্য ইঞ্জিনে অগ্নি প্রজ্বলিত হল নামমাত্র।

১৭০ তম দিবস। মহাকাশযানের নিয়মিত কাজগুলো সম্পন্ন হল।

১৮৫ তম দিবস। সফলভাবে বৃহস্পতির দাগাংকিত বিম্বসমূহ নেয়া হল। কেটে গেল কোনো বিশেষ ঘটনাবিহীন কয়েকটি মাস।

২০৭ তম দিবস। ঝুম সমস্যার সমাধান হল, কিন্তু প্রধান রেডিও ট্রান্সমিটার অকার্যকর হয়ে পড়ল। আমরা বিকল্প ট্রান্সমিটারটির সাহায্য নিলাম। যদি এটিও অকার্যকর হয়ে যায় তবে পৃথিবীর কেউ আর কখনো শুনতে পাবে না আমাদের কথা।

২১৫ তম দিবস। আমরা মঙ্গলের কক্ষপথ অতিক্রম করলাম। ওই গ্রহটি নিজে সূর্যের অপর পার্শ্বে অবস্থিত।

২৯৫ তম দিবস। আমরা প্রবেশ করলাম গ্রহাণু-বেল্টে। এখানে রয়েছে অনেকগুলো উল্টে পড়া শিলাখণ্ড, মহাশূন্যের শৈলশ্রেণী। এদের বেশিরভাগই অনাবিষ্কৃত। দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হল। আমরা যে কোনো সংঘর্ষ এড়াতে আশাবাদী ছিলাম।

৪৭৫ তম দিবস। আমরা নিরাপদে প্রধান গ্রহাণু-বেল্ট থেকে বেরিয়ে এলাম, বিপদোত্তীর্ণ হতে পারায় আমরা স্বস্তি পেলাম।

৫৭০ তম দিবস। আকাশে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে বৃহস্পতি। পৃথিবীর বৃহত্তম দূরবীক্ষণ যন্ত্রটি এতদিন যা পেরেছে, এখন আমরা এর উপর তার চাইতেও সূক্ষ্মতর বর্ণনা দিতে পারছি।

৬১৫ তম দিবস। বৃহস্পতির বিকট আবহাওয়া ব্যবস্থা এবং পরিবর্তনশীল মেঘমালা, আমাদের সামনে মহাশূন্যে ঘূর্ণনশীল হয়ে আমাদেরকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখল। গ্রহটি বিশাল। অন্য সবগুলো গ্রহকে একত্রিত করলে মোট ভর যা হবে, এটির ভর তার দ্বিগুণ। নেই কোনো পর্বতমালা, উপত্যকা, অগ্নিগিরি, নদী, ভূমি এবং বায়ুর মধ্যে নেই কোনো সীমারেখা, শুধু ঘন গ্যাস এবং ভাসমান মেঘের এক বিস্মৃত মহাসমুদ্র—কোনো পৃষ্ঠবিহীন এক জগৎ। বৃহস্পতিতে আমরা সবকিছুকে দেখতে পাই এর আকাশে ভাসমান অবস্থায়।

৬৩০ তম দিবস। বৃহস্পতির আবহাওয়া এখনো চমকপ্রদ। গুরুভার গ্রহটি এর নিজ অক্ষের চারদিকে একবার আবর্তিত হয় দশ ঘণ্টারও কম সময়ে। এর বায়ুমণ্ডলীয় গতি পরিচালিত হয় এর দ্রুত ঘূর্ণন দ্বারা, সূর্যালোক দ্বারা এবং এর অভ্যন্তর হতে নির্গত তাপ দ্বারা।

৬৪০ তম দিবস। মেঘের বিন্যাস ভিন্ন রকমের এবং চমৎকার। এটি আমাদেরকে কিছুটা মনে করিয়ে দেয় ভ্যানগগের স্টারি নাইটকে, বা উইলিয়াম ব্লেক এবং এডভার্ড মানচের চিত্রকর্মকে। কিন্তু কেবল কিছুটা। কোনো শিল্পী কখনো এরূপ কিছু আঁকেনি, কারণ তাদের কেউই আমাদের এই গ্রহটি ত্যাগ করেনি। পৃথিবীর কোনো চিত্রকর এমন অদ্ভুত এবং মনোরম গ্রহ কখনো কল্পনা করেনি।

আমরা অতি নিকট থেকে দেখলাম বৃহস্পতির বহুবর্ণ বেল্ট এবং ব্যান্ডসমূহকে। সাদা ব্যান্ডগুলোকে অ্যামোনিয়া স্ফটিকের উঁচু মেঘ বলে মনে করা হয় ; প্রায় বাদামি বর্ণের বেল্টসমূহ হল বায়ুমণ্ডলের গভীরতর ও উষ্ণতর অঞ্চল। নীল স্থানসমূহকে উপরস্থ মেঘের নিচে গভীর গর্ত বলে প্রতীয়মান হয়, যার ভিতর দিয়ে আমরা দেখতে পাই স্বচ্ছ আকাশকে।

বৃহস্পতির বর্ণ লালাভ-বাদামি হওয়ার কারণটি আমাদের জানা নেই। এটি সম্ভবত ফসফরাস বা সালফারের রসায়নের কারণে। এটি সম্ভবত উজ্জ্বল বর্ণের জটিল জৈব অণুসমূহের কারণে, যেগুলো উৎপন্ন হয় সূর্যালোকের অতিবেগুনি রশ্মি বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডলে মিথেন, অ্যামোনিয়া এবং পানিকে বিশ্লেষণ করায় এবং আণবিক কণাগুলোর পুনর্মিলনের ফলে। সেই ক্ষেত্রে, বৃহস্পতির বর্ণসমূহ আমাদের কাছে সেই সব রাসায়নিক ঘটনার কথাই প্রকাশ করে যেগুলো চার বিলিয়ন বছর পূর্বে পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব ঘটিয়েছিল।

৬৪৭ তম দিবস। বিশাল লাল দাগ। গ্যাসের এক বিশাল কলাম যা উপরের সংলগ্ন মেঘকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল, এতটাই বৃহৎ ছিল যা আধ ডজন পৃথিবীকে ধরে রাখতে পারত। এটি হয়ত একারণে লাল যে, এটি বয়ে নিচ্ছে অধিকতর গভীরে উৎপন্ন বা কেন্দ্রীভূত জটিল অণুসমূহকে। এটি এক মিলিয়ন বছরের পুরনো কোনো ঝড়ের রূপ।

banglainternet.com

৬৫০ তম দিবস। সংঘাত। এক বিস্ময়ের দিন। আমরা সাফল্যের সাথে বৃহস্পতির অস্থিতিশীল বিকিরণ বেল্ট থেকে উত্তীর্ণ হলাম ফোটো পোলারাইমিটার নামক যে একটি মাত্র যন্ত্রের সাহায্যে, সেটি নষ্ট হয়ে গেল। আমরা বলয় সমতলের ক্রসিং সম্পন্ন করলাম যথাযথভাবে এবং বৃহস্পতির নব-আবিষ্কৃত বলয়গুলোর বস্তুকণা ও শিলাখণ্ডসমূহের সাথে কোনো সংঘর্ষ ঘটল না। এবং ছিল অ্যামালথিয়ার বিস্ময়কর প্রতিবিম্বসমূহ, যা ছিল এক ক্ষুদ্র, লাল, আয়তাকার জগৎ যা বিকিরণ বেল্টের কেন্দ্রে অবস্থিত ; বহুবর্ণ আইও ; ইউরোপার সরলরৈখিক দাগসমূহ ; গ্যানিমিডের মাকড়সার জাল সদৃশ বৈশিষ্ট্য ; ক্যালিস্টোর বিশাল বহু-বলয় অববাহিকা। আমরা ক্যালিস্টোর চারদিকে আবর্তন করলাম এবং গ্রহটির জ্ঞাত উপগ্রহগুলোর সর্ববহিঃস্থটি, জুপিটার ১৩-এর কক্ষপথকে অতিক্রম করলাম। আমরা তখন বাইরের দিকে ছুটে যাচ্ছিলাম।

৬৬২ তম দিবস। কণা এবং ক্ষেত্র নির্দেশকগুলো সংকেত দিল যে, আমরা বৃহস্পতির বিকিরণ-বেল্ট ফেলে এসেছি। গ্রহটির মহাকর্ষ বাড়িয়ে দিয়েছে আমাদের গতি। অবশেষে আমরা মুক্তি পেলাম বৃহস্পতির কাছ থেকে এবং আবার ছুটতে লাগলাম মহাশূন্যের সমুদ্রের ভিতর দিয়ে।

৮৭৪ তম দিবস। হারিয়ে গেল ক্যানোপাস নক্ষত্রের পানে নভোযানটির যোগাযোগ—নক্ষত্ররাজির মাঝে যা ছিল একটি নভোযানের জন্য রাডার স্বরূপ। এটি আমাদেরও রাডার, যা মহাশূন্যের অন্ধকারে নভোযানের গতিপথের ক্ষেত্রে অতি গুরুত্বপূর্ণ, এবং যা মহাজাগতিক সাগরের অনাবিষ্কৃত অংশগুলোর মাঝ দিয়ে আমাদের পথ খুঁজে পেতে সাহায্য করে। ক্যানোপাসের প্রয়োজন দেখা দিল। সম্ভবত আলোক-সংবেদী যন্ত্রগুলো আলফা এবং বিটা সেন্টোরিকে ক্যানোপাস জেনে ভুল করল। আহ্বানের আগামী বন্দরটি ছিল, এখন থেকে দুবছর পর ; শনিমণ্ডল।

ভয়েজারের মাধ্যমে প্রাপ্ত মহাজাগতিক পথিকের সব গল্পের মধ্যে আমার পছন্দেরটি হল সবচেয়ে অন্তঃস্থ গ্যালিলীয় উপগ্রহ 'আইও'-র আবিষ্কার সংক্রান্ত। ভয়েজারের পূর্বে আমরা আইও সম্বন্ধে কতকগুলো উদ্ভট ধারণা পোষণ করতাম। আমরা এর পৃষ্ঠ নিয়ে সামান্যই স্থির করতে পারতাম, কিন্তু আমরা জানতাম যে এটি ছিল লাল—প্রগাঢ় লাল, মঙ্গলের চাইতেও লাল, হয়ত সৌর জগতের সবচেয়ে লাল বস্তু। কিছুকাল ধরে এর কিছু পরিবর্তন ঘটছিল অবলোহিত আলোতে এবং হয়ত এর রাডার প্রতিফলন ধর্মে। আমরা এও জানি যে, বৃহস্পতিকে আংশিক ঢেকে রাখা আইওর কক্ষপথে ছিল সালফার, সোডিয়াম, পটাশিয়ামের একটি নল আইও থেকে কোনো একভাবে যেগুলো হারিয়ে গিয়েছিল।

যখন ভয়েজার এগিয়ে গেল এই বিশাল উপগ্রহটির দিকে আমরা দেখতে পেলাম এক অদ্ভুত বহুবর্ণ পৃষ্ঠ, যা সৌর জগতের অন্য যে কোনোটির সাথে

বিসদৃশ। আইও গ্রহাণু বেল্টের নিকটেই অবস্থিত। এটি অবশ্যই এর ইতিহাস জুড়ে পতনশীল শিলা খণ্ডের আঘাতে জর্জরিত হয়েছে। অবশ্যই সৃষ্টি হয়েছে অভিঘাত গহ্বর। তবুও এদের কিছুই দৃষ্টিগোচর হবে না। সুতরাং, আইও-তে এমন কোনো প্রক্রিয়া থেকে থাকবে যা গহ্বরগুলোকে ঘষে নিশ্চিহ্ন করতে বা কিছু দ্বারা পূর্ণ করতে অতিদক্ষ। প্রক্রিয়াটি বায়ুমণ্ডলীয় হতে পারত না, কারণ নিজের দুর্বল মহাকর্ষের কারণে আইও-র বায়ুমণ্ডলের বেশিরভাগই সরে গেছে মহাশূন্যে। এটি ধাবমান পানি দ্বারাও সংঘটিত হয়নি ; আইও-র পৃষ্ঠদেশ অতিশয় ঠাণ্ডা। কিছু স্থান ছিল যেগুলো অগ্নিগিরির জ্বালামুখ সদৃশ। কিন্তু এটি নিশ্চিত হওয়া কঠিন ছিল।

ভয়েজার নভোচারী দলের সদস্য, লিন্ডা মোরাবিটো, যার দায়িত্ব ছিল ভয়েজারকে সঠিকভাবে এর বিচরণপথে ধরে রাখা, নিয়মমাফিক একটি কম্পিউটারকে নির্দেশ দিচ্ছিলেন আইও-র প্রান্তভাগের একটি বিম্বকে বৃদ্ধি করতে, যাতে করে এর পেছনের নক্ষত্রগুলোকে বের করে নিয়ে আসা যায়। আশ্চর্য হয়ে তিনি দেখলেন যে, অন্ধকারে উপগ্রহটির পৃষ্ঠ হতে দাঁড়িয়ে আছে একটি উজ্জ্বল শিখর এবং শীঘ্রই স্থির করলেন যে, শিখরটি নির্দেশ করছিল কোনো একটি সম্ভাব্য অগ্নিগিরির অবস্থান। ভয়েজার আবিষ্কার করেছে পৃথিবীর বাইরে প্রথম সক্রিয় অগ্নিগিরি। এখন আমরা জানি নয়টি বিশাল অগ্নিগিরির কথা, যেগুলো হতে নির্গত হচ্ছে গ্যাস এবং বর্জ্য পদার্থ, এছাড়াও আইও-তে রয়েছে শত শত—হয়ত হাজার হাজার—নিষ্ক্রিয় অগ্নিগিরি। বর্জ্য পদার্থসমূহ গড়িয়ে যাচ্ছে আগ্নেয় পর্বতমালার পাশ দিয়ে, প্রবল ধারায় নিক্ষিপ্ত হচ্ছে বহুবর্ণ ভূ-ভাগে, যেগুলো অভিঘাত গহ্বরগুলোকে ভরে ফেলার জন্য যথেষ্ট। আমরা দেখতে পাচ্ছি এক সতেজ গ্রহ-ভূদৃশ্যাবলি, যার পৃষ্ঠদেশ নতুনভাবে বিন্যস্ত। গ্যালিলিও এবং হাইগেন্স কতই না বিস্মিত হতেন।

আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্বেই আইও-র অগ্নিগিরি সম্বন্ধে অনুমান করতে পেরেছিলেন স্ট্যান্টন পিলি এবং তার সহকর্মীগণ, যারা হিসেব করেছিলেন নিকটস্থ উপগ্রহ ইউরোপা এবং বিশাল গ্রহ বৃহস্পতির সম্মিলিত টানে আইও-র কঠিন অভ্যন্তর ভাগে সৃষ্ট স্রোতকে। তারা দেখলেন যে, আইও-র অভ্যন্তরের শিলাখণ্ডগুলো হয়ত গলে গেছে তেজস্ক্রিয়তা দ্বারা নয়, স্রোতের দ্বারা ; অর্থাৎ আইও-র অভ্যন্তরের বেশিরভাগই হবে তরল। এখন এটিই সম্ভাব্য বলে মনে হয় যে, আইও-র অগ্নিগিরিসমূহ সৃষ্টি করেছে তরল সালফারের এক ভূ-নিম্নস্থ মহাসমুদ্র, যা গলে গিয়েছে এবং কেন্দ্রীভূত হয়েছে পৃষ্ঠদেশের নিকটে। যখন কঠিন সালফারকে পানির স্বাভাবিক স্ফুটনাংকের চাইতে সামান্য অধিক উত্তপ্ত করা হয়, প্রায় ১১৫°C পর্যন্ত, এটি গলে যায় এবং এর বর্ণ পরিবর্তিত হয়। তাপমাত্রা যত বেশি হয়, বর্ণটি ততই গাঢ় হয়। যদি গলিত সালফারকে দ্রুত শীতল করা হয়, তবে এটি এর বর্ণ বজায় রাখতে পারে।

banglainternet.com

আইও-র যে সজ্জা আমরা দেখতে পাই তার সাথে যথেষ্ট সাদৃশ্য বহন করে অগ্নিগিরির জ্বালামুখ থেকে নির্গমনরত গলিত সালফারের নদী, স্রোতধারা এবং বিভিন্ন স্তর : অগ্নিগিরির শীর্ষভাগের নিকটে রয়েছে কালো সালফার, যা উষ্ণতম ; এর নিকটেই রয়েছে নদীসমূহসহ, লাল এবং গোলাপি সালফার ; এবং আরো দূরে বিস্তৃত সমতলসমূহ আচ্ছাদিত রয়েছে হলুদ সালফার দ্বারা। আইও-র পৃষ্ঠদেশ পরিবর্তিত হয় মাস ভিত্তিতে। পৃথিবীতে আবহাওয়া বার্তার মতো নিয়মিত মানচিত্র সরবরাহ করতে হবে। এদের সম্বন্ধে আগামী দিনের আইও অভিযাত্রীদেরকে হতে হবে বুদ্ধিদীপ্ত।

ভয়েজার কর্তৃক আবিষ্কৃত হল যে, আইও-র অত্যন্ত হালকা বায়ুমণ্ডলটি মূলত সালফার ডাই অক্সাইড দ্বারা গঠিত। কিন্তু এই হালকা বায়ুমণ্ডলটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করতে পারে, কারণ এটি বৃহস্পতির তেজস্ক্রিয় বেল্টের শক্তিশালী চার্জিত কণাসমূহ হতে পৃষ্ঠটিকে রক্ষা করতে পারে, যে বেল্টের উপর আইও অবস্থিত। রাতে তাপমাত্রা এত কমে যায় যে, সালফার ডাই অক্সাইড ঘনীভূত হয়ে পরিণত হয় এক ধরনের সাদা হিমায়িত বরফে ; তখন চার্জিত কণাগুলো আঘাত করতে পারে পৃষ্ঠটিকে, এবং রাতগুলো মাটির কিছুটা নিচে কাটানোই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

আইও-র অগ্নিগিরির বিশাল শিখাগুলো এতটাই উপরে উঠে যায় যে, এরা এদের পরমাণুসমূহকে প্রায় প্রবেশ করিয়ে ফেলে বৃহস্পতির চারপাশের শূন্য স্থানে। আইও-র কক্ষপথের অবস্থানে বৃহস্পতির চারপাশে বিশাল বলয় সৃষ্টিকারী যে সকল পরমাণু আছে অগ্নিগিরিগুলো হল তাদের সম্ভাব্য উৎস। এই পরমাণুসমূহ, যেগুলো সর্পিলাকারে এগিয়ে যাচ্ছে বৃহস্পতির দিকে, হয়ত আচ্ছাদিত করে ফেলবে অন্তঃস্থ উপগ্রহ অ্যামালথিয়াকে এবং হয়ত এগুলো এর লালাভ বর্ণের জন্যও দায়ী। এমনকি এটিও সম্ভব যে, আইও থেকে গ্যাসীয় অবস্থায় যে সকল পদার্থ নির্গত হয়, অনেক সংঘর্ষ এবং ঘনীভবনের পর, তারা বৃহস্পতির বলয় ব্যবস্থায় ভূমিকা রাখে।

বৃহস্পতিতে যথেষ্ট সংখ্যক মানুষের উপস্থিতি কল্পনা করা কঠিন হবে— যদিও আমি মনে করি যে, সুদূর ভবিষ্যতে এর বায়ুমণ্ডলে বিশাল আকৃতির বেলুন-নগরীর স্থায়ীভাবে ভেসে বেড়ানোটা হবে একটি প্রাযুক্তিক সম্ভাবনা। আইও বা ইউরোপার নিকট-পার্শ্ব থেকে যেমনটি দৃষ্ট হয়, যে বিশাল এবং পরিবর্তনশীল জগৎ পূর্ণ করে আছে আকাশের বেশির অংশ, ঝুলে আছে উঁচুতে, কখনো হবে না উদয় বা অস্ত, কারণ সৌর জগতের প্রায় সবগুলো উপগ্রহ এর গ্রহের দিকে একটি স্থায়ী পার্শ্ব বজায় রাখে, যেমন চাঁদ করে থাকে পৃথিবীর দিকে। বৃহস্পতির উপগ্রহগুলোর জন্য ভবিষ্যৎ-মানুষের অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে বৃহস্পতি হবে এক অবারিত উদ্দীপনা এবং উত্তেজনার উৎস।

যখন আন্তঃনাক্ষত্রিক গ্যাস এবং ধূলিকণা ঘনীভূত হয়ে সৃষ্টি হল সৌর জগতের, বৃহস্পতি আহরণ করল সেইসব পদার্থের বেশিরভাগকে যেগুলো আন্তঃনাক্ষত্রিক শূন্যে নির্গত এবং সূর্য গঠন করার জন্য ভিতরের দিকে আপতিত হল না। যদি বৃহস্পতি আরো কয়েক ডজন গুণ ভারি হত, এর অভ্যন্তরীণ পদার্থগুলোতে সংঘটিত হত থার্মোনিউক্লিয়ার বিক্রিয়া, এবং বৃহস্পতি হয়ত তার আলো দ্বারা উজ্জ্বল হয়ে উঠত। বৃহত্তম গ্রহটি হল এক ব্যর্থ নক্ষত্র। তথাপি, এর অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা এতটাই বেশি যে, এটি সূর্য থেকে যতটুকু শক্তি শোষণ করে তার দ্বিগুণ পরিমাণ ত্যাগ করে। বর্ণালির অবলোহিত অংশে, বৃহস্পতিকে এমনকি একটি নক্ষত্র বলে বিবেচনা করাই সংগত। যদি একটি দৃশ্যমান আলোতে হয়ে উঠত কোনো নক্ষত্র, তবে আমরা আজ হয়ত বাস করতাম এক দ্বি-সৌর ব্যবস্থায়, আকাশে থাকত দুটি সূর্য, এবং রাত্রি হয়ে উঠত বিরল—আমি বিশ্বাস করি, মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সির অসংখ্য সৌর জগতে এক গতানুগতিক স্থান। আমরা নিঃসন্দেহে বিষয়গুলোকে প্রাকৃতিক এবং মনোমুগ্ধকর বলেই ভাবতাম।

বৃহস্পতির মেঘমালার অনেক নিচে উপরস্থ বায়ুমণ্ডলের স্তরসমূহের ওজন যে চাপ সৃষ্টি করে তা পৃথিবীর যে কোনো স্থানের তুলনায় উচ্চতর, চাপ এতটাই বেশি যে, হাইড্রোজেন পরমাণুসমূহ ভেঙে নির্গত হয় ইলেকট্রন, উৎপন্ন হয় এটি উল্লেখযোগ্য পদার্থ, তরল ধাতব হাইড্রোজেন—এমন এক ভৌত অবস্থা যা পৃথিবীতে কখনো দেখা যায়নি। (এমন আশা করা হয় যে, সাধারণ তাপমাত্রায় ধাতব হাইড্রোজেন একটি সুপার কন্ডাক্টর। পৃথিবীতে যদি এটি উৎপাদন করা যেত তবে তা ইলেকট্রনিক্সের ক্ষেত্রে বিপ্লব সাধন করতে পারত।) বৃহস্পতির অভ্যন্তরে, যেখানে চাপ, ভূ-পৃষ্ঠে বায়ুমণ্ডলীয় চাপের প্রায় তিন মিলিয়ন গুণ, ধাতব হাইড্রোজেনের এক বিশাল অন্ধকার সমুদ্র ছাড়া সেখানে আর কিছু নেই। কিন্তু বৃহস্পতির একেবারে কেন্দ্রে থাকবে শিলা এবং লৌহ পিণ্ড, চাপ-বাইসের মাঝে এক পৃথিবী-সদৃশ জগৎ, বৃহত্তম গ্রহটির কেন্দ্রে যা লুকোনো থাকবে চিরতরে।

বৃহস্পতির তরল ধাতব অভ্যন্তরভাগের তড়িৎ প্রবাহটি হয়ত বা গ্রহটির প্রচণ্ড চৌম্বক ক্ষেত্রের উৎস, যেটি সৌর জগতে বৃহত্তম এবং এই তড়িৎ প্রবাহ আবদ্ধ ইলেকট্রন ও প্রোটনসমূহের সংশ্লিষ্ট বেল্টেরও উৎস। এই চার্জিত কণাসমূহ সূর্য থেকে নির্গত হয় সৌর বায়ুতে এবং গৃহীত ও ত্বরিত হয় বৃহস্পতির চৌম্বক ক্ষেত্র দ্বারা। এদের এক বিশাল অংশ আবদ্ধ হয়ে পড়ে মেঘের অনেক উপরে এবং দৈবক্রমে অধিকতর উপরের বায়ুমণ্ডলীয় অণুর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত না হবার এবং তেজস্ক্রিয় বেল্ট হতে সরে না যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এরা মেরু থেকে মেরু পর্যন্ত যাওয়া-আসা করতে থাকে। আইও বৃহস্পতির এমনি কাছাকাছি এক কক্ষপথে বিচরণ করে যে, এটি এই প্রবল তেজস্ক্রিয়তার ভিতর দিয়ে অতি ক্লেশে অগ্রসর হতে থাকে, সৃষ্টি করে চার্জিত কণার স্রোত, যা পরবর্তীতে উৎপন্ন করে বেতার

banglainternet.com

শক্তির প্রবল নির্গমন। (এরা আইও-র পৃষ্ঠদেশে লাভা নির্গত হওয়ার প্রক্রিয়াতেও হয়ত প্রভাব বিস্তার করে।) আইও-র অবস্থান হিসেবে করে পৃথিবীতে আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেয়ার চাইতেও অধিক বিশ্বস্ততার সাথে বৃহস্পতির বেতার শক্তির উদ্‌গিরণ অনুমান করা সম্ভব।

বৃহস্পতি যে বেতার বিকিরণের একটি উৎস তা দৈবক্রমে আবিষ্কৃত হয় ১৯৫০ এর দশকে, বেতার জ্যোতির্বিদ্যার শৈশবে। বানার্ড বার্ক এবং কেনেথ ফ্রাংকলিন নামক দুই আমেরিকান তরুণ এক নবনির্মিত এবং ওই সময়ের এক অতি সুবেদী বেতার দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা আকাশ পর্যবেক্ষণ করছিলেন। তারা অনুসন্ধান করছিলেন মহাজাগতিক বেতার ব্যাকগ্রাউন্ড—অর্থাৎ সৌর জগতের অনেক বাইরের কোনো বেতার উৎস। সবিস্ময়ে তারা খুঁজে পেলেন একটি শক্তিশালী এবং পূর্বে অনুল্লেখিত উৎস যা কোনো পরিচিত নক্ষত্র, নীহারিকা বা গ্যালাক্সির সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল না। অধিকন্তু, দূরের নক্ষত্রগুলোর সাপেক্ষে এটি ক্রমশ সরে গেল, যে কোনো সুদূর বস্তুর তুলনায় অধিক দ্রুত।* দূরের বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তালিকায় এসবের কোনো ব্যাখ্যা না পেয়ে, একদিন তারা মানমন্দিরের বাইরে গেলেন এবং খালি চোখে তাকালেন আকাশের দিকে, সেখানে অভিনব কিছু ঘটছে কি না তা দেখার জন্য। হতবুদ্ধি হয়ে তারা লক্ষ করলেন যে, ঠিক স্থানটিতেই রয়েছে একটি অতি উজ্জ্বল বস্তু, অনতিবিলম্বেই তারা যার নামকরণ করলেন বৃহস্পতি। এই দৈব আবিষ্কারটি, ঘটনাক্রমে পুরোপুরি বিজ্ঞানের ইতিহাসের বৈশিষ্ট্যসূচক।

ভয়েজার-১ বৃহস্পতির মুখোমুখি হওয়ার পূর্বে প্রতিটি সন্ধ্যায় আমি দেখতে পেতাম যে, বিশাল গ্রহটি আকাশে মিটমিট করছে, যে দৃশ্যটি আমাদের পূর্ব পুরুষেরা উপভোগ করেছে এবং যাতে তারা বিস্মিত হয়েছে এক মিলিয়ন বছর ধরে। এবং 'মুখোমুখি' হওয়ার সন্ধ্যাটিতে, জেপিএল-এ আগত উপাত্তসমূহ পরীক্ষা করতে যাওয়ার সময়, আমি ভাবলাম যে বৃহস্পতি কখনোই সেরকম কিছু হবে না, কখনো আর হবে না আকাশে স্রেফ এক বিন্দু আলো, চিরদিনের জন্য হবে এক অনুসন্ধানের স্থান। বৃহস্পতি এবং উপগ্রহগুলো হল একধরনের ক্ষুদ্র সৌর জগৎ এবং অপরূপ এই জগৎ থেকে আমরা জানব অনেক কিছু।

গঠন এবং আরো অনেক বিবেচনায় শনি গ্রহটি বৃহস্পতির মতো, যদিও অপেক্ষাকৃত ছোটো; প্রতি দশ ঘণ্টায় একবার আবর্তিত হয়ে, এটি প্রদর্শন করে বর্ণিল বিষুবীয় ব্যান্ড, কিন্তু বৃহস্পতির মতো ততটা উল্লেখযোগ্য নয়। বৃহস্পতির তুলনায় এর চৌম্বক ক্ষেত্র এবং বিকিরণ বেল্ট দুর্বলতর এবং এর চতুর্দিকে রয়েছে অতি চমৎকার বলয়সমূহ। এবং চারপাশে রয়েছে এক ডজন বা তারও অধিক সংখ্যক উপগ্রহ।

* যেহেতু আলোর বেগ সসীম। (অষ্টম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)

শনির সবচেয়ে চমকপ্রদ উপগ্রহটির নাম টাইটান, যা সৌর জগতে বৃহত্তম উপগ্রহ এবং একমাত্র উপগ্রহ যেখানে রয়েছে যথেষ্ট বায়ুমণ্ডল। ১৯৮০ সালের নভেম্বরে ভয়েজার-১ টাইটানের মুখোমুখি হওয়ার পূর্বে টাইটান সম্বন্ধে আমাদের ধারণা ছিল অপ্রতুল এবং অপূর্ণ। দ্ব্যর্থহীনভাবে যে একমাত্র গ্যাসটি সেখানে উপস্থিত ছিল, তা জি. পি. ক্যুপার কর্তৃক আবিষ্কৃত মিথেন, CH_4। সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি মিথেনকে অধিকতর জটিল হাইড্রোকার্বন অণুতে এবং হাইড্রোজেন গ্যাসে পরিণত করে। হাইড্রোকার্বনসমূহ থেকে যাবে টাইটানে, এর পৃষ্ঠদেশ আচ্ছাদিত হবে এক হালকা বাদামি আলকাতরার মতো পদার্থের আবরণ দ্বারা, পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভবের উপর সম্পন্ন পরীক্ষণগুলোতে যেরকমটি উৎপন্ন হয় অনেকটা সেরকম। টাইটানের দুর্বল মহাকর্ষের কারণে, হালকা ওজনের হাইড্রোজেন গ্যাস 'বাত্যাতাড়িত' নামের এক শক্তিশালী প্রক্রিয়ায় দ্রুত শূন্যে মিলিয়ে যাওয়ার কথা, যা এর সাথে নিয়ে যাবে মিথেন এবং অন্যান্য বায়ুমণ্ডলীয় উপাদান। কিন্তু টাইটানের রয়েছে এমন এক বায়ুমণ্ডলীয় চাপ যা কমপক্ষে মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলীয় চাপের সমান। বাত্যাতাড়িত হওয়ার প্রক্রিয়াটি সম্ভবত সংঘটিত হয় না। হয়ত রয়েছে কিছু প্রধান এবং এখনো অনাবিষ্কৃত উপাদান—উদাহরণ স্বরূপ, নাইট্রোজেন—যা বায়ুমণ্ডলের গড় আণবিক ওজনকে উচ্চ রাখে এবং বাত্যাতাড়িত হওয়া ঠেকিয়ে রাখে। অথবা হয়ত বাত্যাতাড়িত হওয়ার প্রক্রিয়াটি চলছে, কিন্তু শূন্যে হারিয়ে যাওয়া গ্যাসের স্থান পূরণ হচ্ছে উপগ্রহটির অভ্যন্তর থেকে নির্গত গ্যাস দ্বারা। টাইটানের প্রধান অংশের ঘনত্ব এত কম যে, পানি এবং অন্যান্য বরফের ব্যাপক সরবরাহ থাকতে হবে, হয়ত সাথে থাকবে মিথেন, অন্তঃস্থ তাপক্রিয়ায় যেগুলো এক অজানা হারে নির্গত হচ্ছে পৃষ্ঠদেশে।

যখন আমরা দূরবীক্ষণে, যন্ত্রের মাধ্যমে টাইটানকে পর্যবেক্ষণ করি, আমরা দেখতে পাই সামান্য বোধগম্য এক লালচে চাকতি। কিছু পর্যবেক্ষক সেই চাকতির উপর পরিবর্তনশীল সাদা মেঘের কথা উল্লেখ করেছেন—সম্ভবত মিথেন স্ফটিকের মেঘ। কিন্তু লালচে বর্ণের জন্য কী দায়ী? টাইটান সংক্রান্ত বেশির ভাগ শিক্ষার্থী একমত হয় যে, এর সম্ভাব্য কারণ হল জটিল জৈব যৌগসমূহ। পৃষ্ঠের তাপমাত্রা এবং বায়ুমণ্ডলীয় পুরুত্ব নিয়ে এখনো রয়েছে বিতর্ক। বায়ুমণ্ডলীয় গ্রিন হাউজ ক্রিয়ায় পৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার কিছু ইঙ্গিত রয়েছে। পৃষ্ঠে এবং বায়ুমণ্ডলে প্রচুর পরিমাণ জৈব অণু থাকায়, টাইটান হল সৌর জগতের এক অসাধারণ এবং অনন্য অংশ। আবিষ্কারের ক্ষেত্রে আমাদের অতীত অভিযাত্রাগুলো এটিই নির্দেশ করে যে, এই স্থানটি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের মাঝে বিপ্লব এনে দেবে ভয়েজার এবং অন্যান্য মহাকাশযানগুলোর তথ্যানুসন্ধান মিশনসমূহ। টাইটানের মেঘের মাঝে কোনো ছেদের মধ্য দিয়ে আপনি হয়ত হঠাৎ দেখে ফেলতে পারেন শনি এবং

banglainternet.com

এর বলয়সমূহকে, মধ্যবর্তী বায়ুমণ্ডল দ্বারা চারদিকে ছড়িয়ে পড়া এদের হালকা হলুদ বর্ণকে। যেহেতু সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্বের তুলনায় শনি মণ্ডলের দূরত্ব দশ গুণ বেশি, আমরা যেরকম সূর্যালোকে অভ্যস্ত, শনিতে রয়েছে তার মাত্র শতকরা একভাগ, এবং যথেষ্ট বায়ুমণ্ডলীয় গ্রিন হাউজ ক্রিয়া থাকা সত্ত্বেও তাপমাত্রা পানির হিমাংকের অনেক নিচে। কিন্তু প্রচুর জৈব পদার্থ, সূর্যালোক এবং অগ্নিগিরি উষ্ণ চিহ্নগুলোর কারণে, টাইটানে* প্রাণের সম্ভাবনাকে তাৎক্ষণিক বাতিল করে দেয়া যায় না। সেই অতি ভিন্নরকম পরিবেশে প্রাণ-রূপটি অবশ্যই পৃথিবীর প্রাণ-রূপের তুলনায় হবে সম্পূর্ণ ভিন্নরকমের। টাইটানে প্রাণের অস্তিত্বের পক্ষে বা বিপক্ষে তেমন শক্তিশালী কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এটি স্রেফ সম্ভাব্যতার পর্যায়ে। টাইটানের পৃষ্ঠদেশে যন্ত্রপাতিসহ নভোযান অবতরণ না করলে আমাদের পক্ষে এই প্রশ্নের উত্তর দেয়া সম্ভব নয় বলেই মনে হয়।

শনির বলয়সমূহ গঠনকারী প্রতিটি উপাদানকে পরীক্ষা করতে হলে আমাদেরকে এগুলো দেখতে হবে নিকট থেকে, কারণ কণাগুলো ক্ষুদ্র—তুষার গোলক, বরফের টুকরা এবং ক্ষুদ্র বনসাই হিমবাহ, যেগুলো চওড়ায় প্রায় এক মিটার। আমরা জানি যে, এরা পানির বরফ দ্বারা গঠিত, কারণ বলয়গুলো থেকে প্রতিফলিত সূর্যালোকের বর্ণালি ধর্মসমূহ গবেষণাগার পরিমাপে বরফ থেকে প্রতিফলিত বর্ণালির সাথে সাদৃশ্য বহন করে। কোনো নভোযান থেকে কণাগুলোকে স্পষ্টভাবে দেখতে হলে, আমাদের দ্রুতি অবশ্যই কমিয়ে ফেলতে হবে, যাতে আমরা এদের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারি, যারা শনির চারদিকে ৪৫০০০ মাইল/ ঘণ্টা দ্রুতিতে চলছে ; অর্থাৎ আমাদেরকে থাকতে হবে শনির কক্ষপথে, চলতে হবে কণাগুলোর সমান দ্রুতিতে। কেবল তখনই আমরা এদেরকে আলাদা আলাদাভাবে দেখতে পাই, কোনো আচ্ছাদন বা ডোরার মতো নয়।

* ১৬৫৫ সালে হাইগেন্‌স আবিষ্কার করেন টাইটান এবং তার মতামত ছিল, 'এখন আমরা যে কেউ কি তাকাতে পারি উপরের দিকে এবং এই ব্যবস্থাসমূহকে [বৃহস্পতি এবং শনির] একত্রে তুলনা করতে পারি, আমাদের ক্ষুদ্র ও করুণার উদ্রেককারী পৃথিবীর তুলনায় এই গ্রহদ্বয়ের বিশাল আকৃতি এবং অসাধারণ সহচরদের দেখে বিস্ময়-বিহ্বল না হয়েই ? অথবা তারা কি নিজেদেরকে এটি ভাবতে বাধ্য যে, মহান 'স্রষ্টা' তার সকল 'পশু' এবং 'গাছপালা'-কে এখানে স্থাপন করেছেন, কেবল এই 'স্থান'টিকে সাজিয়ে তুলেছেন এবং অলংকৃত করেছেন, এবং অন্যসব 'গ্রহ'কে বিরান এবং বসতিহীন করে রেখেছেন, যারা হয়ত তাকে শ্রদ্ধা ও উপাসনা করে ; অথবা নভোলোকের সেই বিপুল বস্তুরাজি কি মিটমিট করে, এবং আমাদের কেউ কেউ কি তাদেরকে করবে পর্যবেক্ষণ ? যেহেতু, শনি গ্রহটি সূর্যের চারদিকে প্রতি ত্রিশ বছরে মাত্র একবার আবর্তন করে, তাই শনি এবং এর উপগ্রহগুলোতে ঋতুর দৈর্ঘ্যসমূহ পৃথিবীর তুলনায় অনেক দীর্ঘতর। তাই হাইগেন্‌স শনির উপগ্রহগুলোর অনুমিত অধিবাসীদের নিয়ে লিখলেন, 'এটিই সম্ভাব্য যে তাদের জীবনযাত্রা আমাদের তুলনায় হবে খুবই ভিন্ন রকমের, যাদের শীতগুলো এতটা ক্লান্তিকর।'

শনির চারদিকে একটি বলয় ব্যবস্থার বদলে কেন থাকল না একটি বৃহৎ উপগ্রহ ? একটি বলয়-কণা শনির যত সন্নিকটে, কক্ষপথে এর দ্রুতি তত বেশি (এটি গ্রহটির চারদিকে তত দ্রুত আবর্তিত হচ্ছে—কেপলারের তৃতীয় সূত্র) ; অন্তঃস্থ কণাগুলো অতিদ্রুত অতিক্রম করে যাচ্ছে বহিঃস্থগুলোকে (যেমনটি আমরা দেখি যে, 'অতিক্রম করার' লেনসমূহ সর্বদা বামে থাকে)। যদিও সমগ্র অংশটি গ্রহটির চারদিকে আবর্তিত হচ্ছে ২০ কিলোমিটার/সেকেন্ড বেগে, দুটি পাশাপাশি কণার মধ্যে আপেক্ষিক বেগ খুবই কম, প্রতি মিনিটে মাত্র কয়েক সেন্টিমিটার। এই আপেক্ষিক বেগের কারণে কণাগুলো মহাকর্ষের কারণে কখনো পরস্পরের সাথে লেগে যেতে পারে না। এরা যখনই চেষ্টা করে কক্ষপথে তাদের সামান্য ভিন্নতর দ্রুতি এদেরকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। যদি বলয়টি শনির এতটা কাছাকাছি না থাকত, তবে এই প্রভাবটি এতটা শক্তিশালী হত না, এবং কণাসমূহ একত্রিত হতে পারত, উৎপন্ন করতে পারত তুষারগোলক এবং শেষপর্যন্ত পরিণত হত উপগ্রহে। কাজেই এটি হয়ত কোনো আকস্মিক যোগাযোগ নয় যে, শনির বলয়সমূহের বাইরে উপগ্রহগুলোর এমন এক ব্যবস্থা রয়েছে, যাদের আকৃতি কয়েক শত কিলোমিটার প্রশস্ততা থেকে টাইটানের মতো বৃহৎ হতে পারে, যেটি প্রায় মঙ্গলের সমান একটি উপগ্রহ। সকল উপগ্রহ এবং গ্রহের পদার্থগুলো হয়ত প্রাথমিকভাবে বণ্টিত হয়েছিল বলয় রূপেই, যেগুলো পরবর্তীতে ঘনীভূত এবং একীভূত হয়ে সৃষ্টি করেছে এখনকার উপগ্রহ এবং গ্রহসমূহ।

বৃহস্পতির মতো শনির চৌম্বক ক্ষেত্রও সৌর বায়ুর চার্জিত কণাগুলোকে ধরে রাখে এবং ত্বরণযুক্ত করে। যখন কোনো চার্জিত কণা একটি চৌম্বক মেরু থেকে অন্যটিতে ফিরে যায়, একে অবশ্যই শনির বিষুবীয় তল অতিক্রম করতে হবে। পথে যদি কোনো বলয়-কণা থাকে, প্রোটন বা ইলেকট্রন সেই ক্ষুদ্র তুষার-গোলক দ্বারা শোষিত হয়। এর ফলে, উভয় গ্রহের ক্ষেত্রে, বলয়সমূহ ত্যাগ করে বিকিরণ বেল্টগুলোকে, যেগুলো কেবলমাত্র কণা-বলয়সমূহের ভিতরে এবং বাইরে বিদ্যমান। বৃহস্পতি বা শনির একটি নিকট-গ্রহ একইভাবে গোগ্রাসে গিলে ফেলবে বিকিরণ বেল্টের কণাসমূহকে, এবং প্রকৃতপক্ষে শনির একটি নতুন উপগ্রহ ঠিক এভাবেই আবিষ্কৃত হয়েছিল : পাইওনিয়ার-১১ বিকিরণ বেল্টসমূহে খুঁজে পেল অপ্রত্যাশিত ফাঁক যা সম্পন্ন হয়েছিল পূর্বে অজানা এক উপগ্রহের মাধ্যমে চার্জিত কণা শুষে নেয়ার ফলে।

সৌর বায়ু শনির কক্ষপথের অনেক বাইরে বহিঃসৌর জগতে প্রবাহিত হয়। যখন ভয়েজার পৌছবে ইউরেনাসে এবং নেপচুন ও প্লুটোর কক্ষ পথে, তখনো যদি এর যন্ত্রপাতিসমূহ সক্রিয় থাকে, এরা এর উপস্থিতি নিশ্চিতভাবেই শনাক্ত করতে পারবে, গ্রহসমূহের মধ্যবর্তী স্থানের বায়ু, সূর্যের বায়ু মণ্ডলের উপরের অংশ ধাবিত

banglainternet.com

হবে বাইরের নক্ষত্রলোকের দিকে। সূর্য থেকে প্লুটোর দূরত্বের তুলনায় প্রায় দুই বা তিন গুণ দূরত্বে, আন্তঃনাক্ষত্রিক প্রোটন এবং ইলেকট্রনগুলোর চাপ সেখানে সৌর বায়ু কর্তৃক সৃষ্ট অতি সামান্য চাপের চাইতে অধিক হয়। হেলিওপস নামে অভিহিত এই স্থানটি হল সূর্য-সাম্রাজ্যের শেষ সীমানার একটি সংজ্ঞা। কিন্তু ভয়েজার মহাকাশযানটি ছুটতেই থাকবে, একবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কোনো এক সময়ে এটি অতিক্রম করে যাবে হেলিওপস অঞ্চলটিকে, উড়ে যাবে শূন্যের মহাসমুদ্র দিয়ে, কখনো প্রবেশ করবে না অন্যকোনো সৌর জগতে, এর নিয়তি নির্ধারিত আছে নাক্ষত্রিক দ্বীপগুলো হতে দূরে অনন্ত পথ পরিভ্রমণ এবং এখন থেকে কয়েক শত মিলিয়ন বছরের মধ্যে মিল্কি ওয়ের গুরুভার কেন্দ্রের চারদিকে এর প্রথম প্রদক্ষিণ সম্পন্ন করার মাঝে। আমরা যাত্রা শুরু করেছি মহাকাব্যিক অভিযানসমূহ নিয়ে।

সপ্তম অধ্যায়
রাত্রির শিরদাঁড়া

পারস্যের রাজা হওয়ার চাইতে আমি একটি কারণকেই অনুধাবন করতে চাইব।
—অ্যাবডেরার ডেমোক্রিটাস

দেবত্ব সম্বন্ধে মানুষের ধারণার উপর যদি কোনো বিশ্বস্ত বর্ণনা দেয়া যেত, তবে সে এটি জেনে থাকিত হত যে, 'দেবতাবৃন্দ' শব্দটির বেশির ভাগ অংশ ব্যবহৃত হয়েছে, সে যে ফলাফলসমূহ প্রত্যক্ষ করেছে তাদের অবরুদ্ধ, সুদূর, অজানা কারণসমূহ প্রকাশ করতে ; সে এই শব্দটি প্রয়োগ করে তখনই যখন প্রাকৃতিক উৎসগুলো, জ্ঞাত কারণগুলো আড়াল হয়ে পড়ে ; যখনই সে এই কারণগুলোর সাথে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলে, অথবা যখনই তার মন আর অনুসরণ করতে পারে না কার্য পরম্পরাকে, সে সমাধান করে সমস্যাটির, ক্ষান্তি দেয় তার গবেষণা কর্মে, একে ছেড়ে দেয় তার দেবতাদের দায়ভারে... । কাজেই সে যখন কোনো ঘটনার উৎপত্তিকে তার দেবতাদের উদ্দেশ্যে আরোপ করে, সে কি প্রকৃতপক্ষে তার মনের অন্ধকারে বিকল্পের অধিক কিছু করে, এমন এক শব্দ যার সাথে সে পরিচিত এক শ্রদ্ধাসঞ্জাত ভয়সহ ?
—পল হেনরিক দায়েত্রিচ, ব্যারন ভন হলবাক্
সিস্টেম দ্য লা ন্যাচার, লন্ডন, ১৭৭০।

আমি যখন খুব ছোটো ছিলাম, তখন আমি নিউ ইয়র্ক নগরীর ব্রুকলিনের বেনসনহার্স্ট সেকশনে বাস করতাম। আমি আমার নিকট প্রতিবেশী, প্রতিটি এপার্টমেন্ট বিল্ডিং, কবুতরের খাঁচা, বাড়ির পেছনের আঙিনা, সামনের গাড়ি রাখার স্থান, খালি জায়গা, কারুকার্যময় রেলিং, কয়লার ঢালু পথগুলোকে অন্তরঙ্গভাবে চিনতাম। এছাড়াও চিনতাম চাইনিজ হ্যান্ডবল খেলার দেয়াল, যার মধ্যে লুইস স্টিলওয়েল নামক একটি থিয়েটারের ইটের বহির্ভাগ ছিল উঁচু মানের। আমি চিনতাম কোথায় বাস করত অনেকেই : ব্রুনো এবং দিনো, রোনাল্ড এবং হার্ভে, স্যান্ডি, বার্নি, ড্যানি, জ্যাকি এবং মাইরা। কিন্তু কয়েকটি ব্লক পরেই কর্কশ অটোমোবাইল ট্রাফিক এবং ৮৬ তম স্ট্রিটের এলিভেটেড রেলওয়ের উত্তর পার্শ্বে ছিল এক অদ্ভুত অজানা অঞ্চল, আমার বিচরণ সীমার বাইরে। আমি জানতাম এটি হয়ত সবার জন্য মঙ্গল গ্রহ।

এমনকি শীতে একটু তাড়াতাড়ি ঘুমোতে গেলে আপনি মাঝে মাঝে দেখতে পাবেন নক্ষত্রগুলোকে। আমি এই সুদূর এবং মিটমিট করতে থাকা তারাগুলোর

banglainternet.com

পানে তাকিয়ে থাকতাম, এবং এগুলো কী তা ভেবে বিস্মিত হতাম। আমি আমার চেয়ে বড়ো ছেলেমেয়েদেরকে এবং প্রাপ্ত বয়স্কদেরকে জিজ্ঞাসা করলে তারা উত্তরে কেবল বলত, 'এরা হল আকাশে আলোর মতো।' আমি জানতাম যে এরা আকাশের আলো। কিন্তু এরা কী ছিল ? কেবলমাত্র ক্ষুদ্র ভাসমান বাতি ? কিসের জন্য ? আমি এদের জন্য একধরনের দুঃখ অনুভব করতাম : এক গতানুগতিক স্থান যার বৈশিষ্ট্য কোনো একভাবে আমার কৌতূহলী সমবয়সীদের কাছে অপ্রকাশিত থেকে গিয়েছিল। কোনো গভীরতর উত্তর বাকি থেকে গিয়েছিল।

আমি একটু বড়ো হওয়ার পর পরই আমার মা-বাবা আমাকে দিল আমার প্রথম লাইব্রেরি কার্ড। আমার মনে আছে, লাইব্রেরিটি ছিল ৮৫ তম স্ট্রিটে, একটি জন-বিরল স্থানে। সাথে সাথেই আমি লাইব্রেরিয়ানের কাছে তারকাদের উপর কিছু চাইলাম। তিনি নিয়ে এলেন একটি ছবির বই যাতে ছিল ক্লার্ক গেবেল এবং জিন হারলো নামক পুরুষ এবং নারীর ছবি। আমি অভিযোগ করলাম এবং তখন কোনো অস্পষ্ট কারণে, তিনি মৃদু হাসলেন এবং অন্য একটি বই নিয়ে এলেন—সঠিক রকমের বই। আমি শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় এটি খুললাম এবং কাঙ্ক্ষিত উত্তরটি না পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পড়তে থাকলাম। এটি বলল যে, নক্ষত্ররা হল সূর্য, তবে অতি দূরে অবস্থিত। সূর্যও একটি নক্ষত্র, তবে এর অবস্থান নিকটতর।

কল্পনা করুন যে আপনি তুলে নিলেন সূর্যটিকে এবং একে এতটাই দূরে সরিয়ে নিলেন যে এটি হয়ে উঠল মিটমিট করতে থাকা এক ক্ষুদ্র আলোক-বিন্দু। আপনাকে এটি কত দূরে নিয়ে যেতে হবে ? আমি কৌণিক আকৃতি সম্বন্ধে অনবহিত ছিলাম। আমি আলোক সঞ্চালনের বিপরীত বর্গীয় সূত্র সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলাম। নক্ষত্রগুলোর দূরত্ব মাপার জন্য আমার কাছে ভৌতিক কোনো উপায় ছিল না। কিন্তু আমি জানতাম যে, যদি এরা নক্ষত্র হয়ে থাকে তবে এদেরকে অবশ্যই অবস্থিত হতে হবে অতি দূরে—৮৫ তম স্ট্রিট থেকে আরো দূরে, ম্যানহাটন থেকে আরো দূরে, হয়ত নিউ জার্সি থেকেও আরো দূরে। আমি যতটুকু অনুমান করেছিলাম বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডটি তার চাইতে অনেক বড়ো।

পরবর্তীতে আমি পড়লাম আরো একটি বিস্ময়কর ঘটনা। ব্রুকলিনকে ধারণকারী এই পৃথিবী একটি গ্রহ, এবং এটি সূর্যের চারদিকে আবর্তিত হয়। আছে অন্য আরো গ্রহ। এরাও সূর্যের চারদিকে আবর্তিত হয় ; কিছু সূর্যের কাছাকাছি, অন্যগুলো অপেক্ষাকৃত দূরে। কিন্তু গ্রহগুলো সূর্যের মতো নিজ আলো দ্বারা আলোকিত হয় না। এরা সূর্যের আলোকে শুধুমাত্র প্রতিফলিত করে। যদি আপনি অনেক দূরে থাকতেন তবে আপনি আদৌ দেখতে পেতেন না পৃথিবী এবং অন্য গ্রহগুলোকে ; এরা হয়ে উঠত কেবল কতগুলো অস্পষ্ট আলোক-বিন্দু, হারিয়ে যেত সূর্যের উজ্জ্বল আলোর মাঝে। আমি ভাবলাম তাহলে এটি খুবই যুক্তিগ্রাহ্য হবে যে, অন্য নক্ষত্রগুলোরও অবশ্যই থাকবে গ্রহ, যেগুলোকে আমরা এখনো শনাক্ত করতে

করতে পারিনি এবং অন্য গ্রহগুলোর কিছু কিছুতে থাকবে প্রাণের অস্তিত্ব (কেন নয় ?), আমরা যেরূপ দেখে থাকি, যেমন ব্রুকলিনের জীবন, তার চাইতে হয়ত ভিন্নরকম। তাই, আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে, আমি হব একজন জ্যোতির্বিদ, শিখব নক্ষত্র এবং গ্রহদের সম্পর্কে এবং যদি সম্ভব হয় তবে আমি এসব স্থানে যাব।

এটি আমার চরম সৌভাগ্য যে, আমার মা-বাবা ও কিছু শিক্ষক আমার এই অদ্ভুত উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে উৎসাহিত করেছেন এবং আমি বাস করতাম এমন এক কালে যখন মানব-ইতিহাসে আমরা প্রকৃতই প্রথমবারের মতো ভ্রমণ করছি অন্যান্য গ্রহে এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এক গভীর তথ্যানুসন্ধান পরিচালনা করছি। যদি আমার জন্ম হত আরো অনেক পূর্বে, তবে আমার অনুরাগ যতই গভীর হত না কেন, আমি অনুধাবন করতে পারতাম না যে, নক্ষত্র এবং গ্রহগুলো কী। আমি জানতে পারতাম না যে, রয়েছে আরো সূর্য এবং আরো পৃথিবী। এটি হল অন্যতম প্রধান এক রহস্য, যা প্রকৃতিকে নিয়ে এক মিলিয়ন বছর ধরে আমাদের পূর্বপুরুষদের ধৈর্যশীল পর্যবেক্ষণ এবং সাহসী চিন্তাভাবনার মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে।

নক্ষত্রগুলো কী ? এই প্রশ্নগুলো একটি শিশুর হাসির মতোই প্রাকৃতিক। আমরা তাদেরকে সর্বদাই জিজ্ঞাসা করেছি। আমাদের কালের সাথে পার্থক্য হল এই যে, অবশেষে আমরা কিছু প্রশ্নের উত্তর জানতে পেরেছি। সেই উত্তরগুলো কী হবে তা অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে একটি তাৎক্ষণিক উপায় এনে দিয়েছে বই এবং লাইব্রেরিসমূহ। জীববিজ্ঞানে রিক্যাপিচুলেশন নামক যথার্থ প্রয়োগযোগ্যতার একটি নিয়ম আছে: আমাদের স্বতন্ত্র ভ্রূণ সংক্রান্ত বিকাশে আমরা প্রজাতির বিবর্তন-ইতিহাসের গোড়ায় ফিরে যাই। আমি মনে করি, এমন একধরনের পুনরাবৃত্তি আছে যা আমাদের ব্যক্তিক বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের ক্ষেত্রেও ক্রিয়াশীল হয়। আমরা অবচেতনভাবেই ফিরে যাই আমাদের পূর্ব পুরুষদের চিন্তার মাঝে। বিজ্ঞান-পূর্ব একটি কালকে কল্পনা করুন, লাইব্রেরি-পূর্ব একটি কালকে কল্পনা করুন। কল্পনা করুন, শত সহস্র বছর পূর্বের কথা। তখন আমরা কেবল সভ্য হয়ে উঠছি, কেবল কৌতূহলী হয়ে উঠছি, কেবল জড়িয়ে পড়ছি সামাজিক এবং যৌন বিষয়সমূহ নিয়ে। কিন্তু তখনো করা হয়নি পরীক্ষণসমূহ, তখনো সম্পন্ন হয়নি আবিষ্কারসমূহ। এটি ছিল হোমো জেনাসের শৈশব। কল্পনা করুন সেই সময়টিকে যখন প্রথম আবিষ্কৃত হল আগুন। তখন মানব জীবন কেমন ছিল ? নক্ষত্রগুলো নিয়ে তখন তারা কী ভাবত ? কখনো কখনো আমি আমার কল্পলোকে এমন কাউকে কল্পনা করি যে ভাবত এমনটি :

> আমরা খাদ্য হিসেব গ্রহণ করি ক্ষুদ্র রসালো ফল-মূল। বাদাম এবং পত্র-পল্লব। এবং মৃত পশু পাখি। কিছু পশু-পাখিকে আমরা খুঁজে বের করি। এর কিছু সংখ্যাকে হত্যা করি। আমরা জানি কোন্ খাদ্যগুলো উত্তম এবং কোন্গুলো বিপজ্জনক। কিছু খাদ্য আছে যেগুলো গ্রহণ করলে আমরা আক্রান্ত হয়ে পড়ব এগুলো খাওয়ার শাস্তি স্বরূপ। আমরা মন্দ কোনো কিছু করতে চাইনি। কিন্তু ফক্সগ্লোব এবং হেমলক্ তোমাকে হত্যা

banglainternet.com

করে ফেলতে পারে। আমরা আমাদের সন্তান এবং বন্ধুদেরকে ভালোবাসি। আমরা তাদেরকে এরূপ খাদ্যের ব্যাপারে সতর্ক করে দিই।

যখন আমরা পশু শিকার করি, তখন আমরাও মারা পড়তে পারি। আমরা পশুর দাঁতে বিদ্ধ হতে পারি। অথবা পদদলিত হতে পারি। অথবা ভক্ষণের শিকার হতে পারি। পশুগুলো এদের জীবন মৃত্যু নিয়ে আমাদের জন্য কী অর্থ বহন করে : এরা কিরূপ আচরণ করে, এরা কিরূপ পদ-চিহ্ন রেখে যায়, বাচ্চা উৎপাদনের উদ্দেশ্যে কখন এরা যৌনক্রিয়ায় রত হয় এবং কখন এরা বাচ্চা দেয়, কখন এরা চারণ করে। আমাদেরকে অবশ্যই এসব বিষয় জানতে হবে। আমরা এসব বলি আমাদের সন্তানদেরকে, তারা বলবে তাদের সন্তানদেরকে।

আমরা নির্ভর করি পশু-পাখির উপর। আমরা এদেরকে অনুসরণ করি—বিশেষত শীতে, যখন খাওয়ার মতো থাকে না তেমন কোনো তরুলতা। আমরা হলাম বিক্ষিপ্তভাবে ঘুরে বেড়ানো শিকারি এবং সমাগমকারী। আমরা আমাদেরকে 'শিকারিদল' বলে সম্বোধন করি। যখন আমরা পশুপাখির চামড়া পরিধান করি, তখন আমরা অনুভব করি পশুপাখির শক্তি। আমরা লাফিয়ে উঠি গজলাহরিণের সাথে : আমরা শিকার করি বন্য শূকর। আমাদের এবং পশুদের মাঝে রয়েছে একটি বন্ধন। আমরা পশুরদেরকে শিকার এবং ভক্ষণ করি। তারা শিকার এবং ভক্ষণ করে আমাদেরকে। আমরা একে অপরের অংশ।

আমরা যন্ত্রপাতি তৈরি করি এবং বেঁচে থাকি। আমাদের মাঝে কেউ কেউ টুকরা করা, ফালি ফালি করা, ধার দেয়া এবং ঘষার কাজে এমনকি পাথর খুঁজতেও দক্ষ। কিছু পাথরকে পেশিতন্তুর সাহায্যে বেঁধে ফেলা হয় একটি কাঠের হাতলের সাথে এবং তৈরি করা হয় কুড়াল। কুড়াল দ্বারা আমরা আঘাত করি গাছপালা এবং পশুপাখিকে। অন্য পাথরগুলোকে বাঁধা হয় লম্বা লাঠির সাথে। যদি আমরা ধীরস্থির ও সতর্ক থাকি, তবে আমরা কখনো কখনো চলে আসতে পারি কোনো পশুর কাছাকাছি এবং একে বিদ্ধ করে ফেলতে পারি বর্শা দ্বারা।

মাংস নষ্ট হয়ে যায়। কখনো কখনো আমরা থাকি ক্ষুধার্ত এবং কোনো কিছু লক্ষ করার চেষ্টা করি না। কখনো কখনো আমরা স্বাদকে আড়াল করার জন্য খারাপ মাংসের সাথে মেশাই নানা ঔষধি। যে সকল খাদ্য নষ্ট হয়ে যাবে না তাদেরকে আমরা ভাঁজ করে রাখি পশুর চামড়াতে। অথবা বড়ো পাতায়। অথবা বড়ো বাদামের খোলসে। খাদ্য পাশে রাখা এবং একে সাথে বয়ে নিয়ে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। যদি আমরা এই খাদ্য খুব তাড়াতাড়ি খেয়ে উঠি, তবে আমাদের কেউ হয়ত আগামীতে অনাহারে থাকবে। তাই আমাদেরকে অবশ্যই একে অপরকে সাহায্য করতে হয়। এজন্য এবং আরো অনেক কারণে আমাদের রয়েছে কিছু নিয়ম-কানুন। প্রত্যেককে সেই নিয়মগুলো অবশ্যই মেনে চলতে হয়। আমাদের সর্বদাই ছিল নিয়ম-কানুন। নিয়মসমূহ পবিত্র।

একদিন ঝড় এল, সাথে প্রচণ্ড বিদ্যুৎ চমক, বজ্র এবং বৃষ্টিপাত। ছোটোরা ভয় পায় ঝড়কে। কখনো আমিও। ঝড়ের রহস্য অনুন্মোচিত। বজ্র গভীর এবং তীব্র ; বিদ্যুৎ চমক সংক্ষিপ্ত এবং উজ্জ্বল। হয়ত শক্তিশালী কেউ হতে পারে অতিশয় ক্রুদ্ধ। আমি মনে করি, এটি অবশ্যই আকাশের কেউ।

ঝড়ের পর নিকটস্থ বনে সৃষ্টি হল কম্পমান আলোক এবং পুড়ে যাওয়ার শব্দ। আমরা দেখতে গেলাম। সেখানে ছিল এক উজ্জ্বল, উত্তপ্ত, উর্ধ্বমুখী বস্তু, যার বর্ণ ছিল হলুদ এবং লাল। আমরা এর পূর্বে, এরকম বস্তু কখনো দেখিনি। এখন আমরা এটিকে 'অগ্নিশিখা' বলি। এর রয়েছে এক বিশেষ গন্ধ। এক অর্থে এটি জীবিত। এটি খাদ্য গ্রহণ করে। এটি খেয়ে ফেলে তরুলতা এবং বৃক্ষের কাণ্ড, এবং যদি আপনি সুযোগ দেন, তবে পুরো বৃক্ষটিকেও। এটি শক্তিশালী। কিন্তু এটি ততটা সচেতন নয়। সব খাদ্য ফুরিয়ে গেলে এটি মৃত্যু বরণ করে। পথে কোনো খাদ্য না থাকলে এটি একটি বৃক্ষ হতে অন্য একটি বৃক্ষের দিকে সামান্যও অগ্রসর হবে না। খাদ্য ছাড়া এটি হাঁটতে পারে না। কিন্তু যেখানে আছে যথেষ্ট খাদ্য, সেখানে এটি জন্ম লাভ করে এবং সৃষ্টি করে অনেক শিশু-অগ্নিশিখা।

আমাদের একজনের ছিল এক সাহসী এবং ভয়ংকর চিন্তা : অগ্নিশিখাটিকে নিয়ন্ত্রণে আনা, কিছুটা খাদ্য যোগানো, এবং একে আমাদের বন্ধু বানানো। আমরা খুঁজে পেলাম শুষ্ক কাঠের কিছু দীর্ঘ শাখা। অগ্নিশিখা এদেরকে ভক্ষণ করছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে। আমরা অবশেষে সেগুলোকে সরিয়ে ফেলতে পারলাম যেগুলোতে কোনো অগ্নিশিখা ছিল না। যদি আপনি কোনো ক্ষুদ্র অগ্নিশিখার সাথে দ্রুত দৌড়ান, তবে এটি ধ্বংস হয়ে যায়। এদের সন্তানেরা দুর্বল। আমরা দৌড়াশাম না। আমরা হাঁটলাম, চিৎকার করে শুভেচ্ছা জানালাম। 'শেষ হয়ে যাও না', আমরা অগ্নিশিখাকে বললাম। অন্য শিকারিদল তাকালো চক্ষু বড়ো করে।

এরপর থেকে আমরা এটিকে আমাদের সাথে নিয়ে চলি। আমাদের রয়েছে একটি মাতৃ অগ্নিশিখা, অন্য অগ্নিশিখাকে বহিমান রাখার জন্য, যাতে এটি অনাহারে* মারা না যায়। অগ্নিশিখা হল এক বিস্ময়, এবং এটি উপযোগীও ; শক্তিশালী কোনো

* অগ্নিকে একটি জীবন্ত বস্তু মনে করার ধারণাটিকে সংরক্ষন করতে হবে সযত্নে, একটি 'আদিম' ভাবনা হিসেবে বাতিল করে দিতে পারি না। অনেক আধুনিক সভ্যতার মূলেই এটির উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। প্রাচীন গ্রিস এবং রোমের প্রতিটি বাড়িতে এবং প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণদের মাঝে একটি চুল্লি এবং অগ্নির যত্ন নেয়ার জন্য বিশেষ নিয়মের প্রচলন ছিল। রাতে তাপ প্রবাহ বন্ধ করার জন্য কয়লাগুলোকে ছাই দ্বারা ঢেকে দেয়া হত ; সকালে গাছের ছোটো ছোটো ডালপালা দ্বারা অগ্নিশিখাকে আবার প্রজ্বলিত করা হত। চুল্লিতে অগ্নি শিখার মৃত্যুকে পরিবারের মৃত্যুর সমার্থক বলে গণ্য করা হত। তিনটি সংস্কৃতিতেই, চুল্লির প্রথাটিকে পূর্বসূরিদের পূজার সাথে সংশ্লিষ্ট করা হত। এটিই হল চিরন্তন শিখার মূল, যেই প্রতীকটি এখনো পৃথিবীময় ধর্মীয়, স্মারক, রাজনৈতিক এবং ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠানসমূহে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

banglainternet.com

কিছুর কাছ থেকে নিশ্চিতভাবেই এক আশীর্বাদ। তারা ঝড়ের সাথে সংশ্লিষ্টদের মতোই ক্রোধান্বিত ?

ঠাণ্ডা রাতগুলোতে অগ্নিশিখাসমূহ আমাদেরকে উষ্ণ রাখে। এটি আমাদেরকে দেয় আলো। যখন চাঁদ থাকে নতুন তখন এটি অন্ধকারে সৃষ্টি করে গর্ত। আগামীকালের শিকারের জন্য আমরা রাত্রিতে স্থির করতে পারি বর্শা। এবং যদি আমরা ক্লান্ত না হয়ে পড়ি, তবে আমরা অন্ধকারেও একে অপরকে দেখতে পারি এবং কথা বলতে পারি পরস্পরের সাথে। আছে আরো একটি চমৎকার ব্যাপার !—আগুন পশুদেরকে দূরে সরিয়ে রাখে। আমরা আক্রান্ত হতে পারি রাতে। কখনো কখনো হায়েনা এবং নেকড়ের মতো ছোটো জন্তুও আমাদেরকে ভক্ষণ করে ফেলে। এখন বিষয়টি অন্যরকম। এখন অগ্নিশিখা পেছনে তাড়িয়ে দেয় জন্তুগুলোকে। আমরা এদেরকে দেখতে পাই অন্ধকারে মৃদু চিৎকাররত অবস্থায়, তখন এরা শিকারের উদ্দেশ্যে ঘুর ঘুর করছে, অগ্নিশিখার আলোয় এদের চোখ জ্বল-জ্বল করছে। অগ্নিশিখা দেখে এরা হয়ে উঠে সন্ত্রস্ত। কিন্তু আমরা একে ভয় পাই না। অগ্নিশিখা আমাদেরই। আমরা অগ্নিশিখার যত্ন নিই। অগ্নিশিখাও আমাদেরকে সাহায্য করে।

আকাশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটি আমাদেরকে আড়াল করে রাখে। এটি আমাদের সাথে কথা বলে। অগ্নিশিখা পাওয়ার পূর্বে, আমরা শুয়ে পড়তাম অন্ধকারে এবং তাকাতাম উপরে সকল আলোক-বিন্দুতে। কিছু বিন্দু একত্রিত হয়ে আকাশে সৃষ্টি করত একটি ছবি। আমাদের কোনো একজন অন্যদের তুলনায় অধিকতর উত্তমভাবে ছবিগুলো দেখতে পারত। সে আমাদেরকে শেখাত নক্ষত্রদের ছবি এবং এদেরকে কী নামে সম্বোধন করা হয়, সেই ব্যাপারে। গভীর রাতে আমরা বসে পড়তাম গোল হয়ে এবং আকাশের ছবিগুলো নিয়ে মেতে উঠতাম গল্পে : সিংহ, কুকুর, ভল্লুক, শিকারিদল। আরো অনেক অদ্ভুত বস্তু। এরা কি আকাশের সেই প্রবল শক্তিশালীদের ছবি, যারা ক্রুদ্ধ অবস্থায় সৃষ্টি করে ঝড় ?

আকাশ মূলত অপরিবর্তনশীল। সেখানে একই নক্ষত্রের ছবি দেখা যায় বছরের পর বছর ধরে। চাঁদটি শূন্য থেকে চিকন রূপালি রূপ থেকে পরিণত হয় গোলাকার বলে এবং অতঃপর আবার মিলিয়ে যায় শূন্যে। যখন চাঁদের পরিবর্তন ঘটে তখন নারীর ঘটে ঋতুস্রাব। কিছু কিছু গোত্রে চাঁদের বৃদ্ধি এবং ক্ষয়ের বিশেষ কিছু সময়ে যৌন ক্রিয়ার বিরুদ্ধে রয়েছে নিয়মকানুন। কিছু কিছু গোত্র চাঁদের দিনগুলোকে বা নারীর ঋতুস্রাবের দিনগুলোকে শিঙের হাড়ে আঁচড় কেটে চিহ্নিত করে রাখে। তখন তারা সামনের বিষয়গুলো নিয়ে পরিকল্পনা করতে পারে এবং মেনে চলে নিয়ম-কানুন। নিয়মসমূহ সর্বদাই পবিত্র।

নক্ষত্রগুলো থাকে অনেক দূরে। যখন আমরা কোনো পাহাড়ে বা বৃক্ষে আরোহণ করি তখনো তারা নিকটতর হয় না। এবং আমাদের এবং নক্ষত্রদের মাঝে চলে আসে মেঘমালা : নক্ষত্রদেরকে অবশ্যই থাকতে হবে মেঘের পেছনে। যখন চাঁদটি ধীরে

চলতে থাকে তখন এটি অতিক্রম করে নক্ষত্রদের সামনে দিয়ে। পরবর্তীতে দেখা যায় যে, চাঁদটি নক্ষত্রদের কোনো ক্ষতি করেনি। চাঁদটি নক্ষত্রদেরকে খেয়ে ফেলে না। নক্ষত্রদেরকে অবশ্যই থাকতে হবে চাঁদের পেছনে। এরা মিটমিট করে। এক অদ্ভুত, শীতল, সাদা সুদূর আলো। এরকম রয়েছে অনেকগুলো। সারা আকাশময়। কিন্তু কেবল রাতে। আমি বিস্মিত হই, এরা কী।

অগ্নিশিখা আবিষ্কারের পর আমি নক্ষত্রদের কথা ভেবে বিস্মিত হয়ে বসেছিলাম ক্যাম্প ফায়ারের পাশে। ধীরে ধীরে একটি ভাবনা এল : আমি ভাবলাম, নক্ষত্ররাও অগ্নিশিখা, এরপর মাথায় এল আরো একটি চিন্তা : নক্ষত্ররাও হল ক্যাম্প ফায়ার যা অন্য শিকারিদল প্রজ্বলিত করে রাতে। ক্যাম্প ফায়ারের তুলনায় নক্ষত্ররা দেয় অপেক্ষাকৃত কম আলো। কাজেই নক্ষত্ররা হল অনেক দূরের ক্যাম্প ফায়ার। 'কিন্তু', তারা আমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'আকাশে কীভাবে ক্যাম্প ফায়ার থাকবে ? সেই সব অগ্নিশিখার চারপাশের ক্যাম্প ফায়ার এবং শিকারি দল কেন আমাদের পদপ্রান্তে পতিত হয় না ? অদ্ভুত গোত্রটি কেন আকাশ হতে পতিত হয় না ?'

এগুলো চমৎকার প্রশ্ন। এগুলো আমাকে যন্ত্রণা দেয়। কখনো কখনো আমি আকাশটিকে ভাবি একটি বিশাল ডিমের খোসা বা একটি বিশাল বাদামের খোসার অর্ধাংশ। আমি মনে করি যে, সেই সব সুদূর তাঁবু—আগুনের চারপাশের মানুষেরা নিচে তাকায় আমাদের দিকে—এছাড়াও তাদের কাছে মনে হয়—এবং তারা বলে যে, আমরা রয়েছি তাদের আকাশে, এবং বিস্মিত হয় এই ভেবে যে, কেন আমরা তাদের উপর পতিত হচ্ছি না, আমি কী বোঝাতে চাচ্ছি, যদি আপনি তা অনুধাবন করতে পারেন। কিন্তু শিকারিদল বলে যে, 'নিচ নিচই এবং উপর উপরই।' এটিও একটি চমৎকার উত্তর।

আমাদের মাঝে অন্য এক জনের ছিল আরো একটি ভাবনা। তার ভাবনা এই যে, রাত্রি হল এক কালো বর্ণের বিশাল পশু-চামড়া, যা নিক্ষেপ করা হয়েছে উপরে আকাশ জুড়ে। সেই চামড়াটিতে আছে ছিদ্র। আমরা তাকাই ছিদ্রগুলোর মধ্য দিয়ে। এবং আমরা দেখতে পাই অগ্নিশিখা। তার ভাবনা শুধু এই নয় যে, যেখানে আমরা নক্ষত্র দেখতে পাই কেবল সেই অল্প কয়েকটি স্থানেই রয়েছে অগ্নিশিখা। সে ভাবল যে, সর্বত্রই রয়েছে অগ্নিশিখা। সে ভাবল যে, অগ্নিশিখা আচ্ছাদিত করে রাখে পুরো আকাশটিকে। কিন্তু চামড়াটি আড়াল করে রাখে অগ্নিশিখাকে। কেবলমাত্র যে স্থানগুলোতে ছিদ্র রয়েছে সেগুলো ব্যতীত।

কিছু নক্ষত্র ঘুরে বেড়ায়। পশুদের মতো আমরাও শিকার করি। আমাদের মতো যদি অনেক মাস ধরে আপনি নিবিড়ভাবে লক্ষ রাখেন, আপনি তাদেরকে ছুটন্ত অবস্থায় দেখতে পাবেন। এরা সংখ্যায় কেবল পাঁচটি, এক হাতের আঙুলের মতো। এরা নক্ষত্ররাজির ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে ঘুরে বেড়ায়। যদি ক্যাম্প ফায়ারের ভাবনাটি সত্য হয়, তবে সেই নক্ষত্রগুলো হবে বিক্ষিপ্তভাবে ভ্রমণরত শিকারিদলের

banglainternet.com

মতো, যারা বহন করে বিশাল আগুন। কিন্তু আমি বুঝতে পারি না, বিক্ষিপ্তভাবে ভ্রমণরত নক্ষত্রগুলো কীভাবে একটি চামড়ার ছিদ্র হতে পারে। আপনি যদি কোনো কোনো ছিদ্র তৈরি করেন তবে এটি হয়েই গেছে। একটি ছিদ্র কেবল একটি ছিদ্রই। ছিদ্রগুলো ঘুরে বেড়ায় না। আবার আমি অগ্নিশিখাময় কোনো আকাশ দ্বারা পরিবৃত হতে চাই না। যদি চামড়াটি পড়ে যায়, রাতের আকাশ হয়ে উঠবে উজ্জ্বল—খুবই উজ্জ্বল—সর্বত্রই অগ্নিশিখা দেখার মতো। আমি মনে করি অগ্নিশিখাময় কোনো আকাশ আমাদের সবাইকে গ্রাস করবে। হয়ত আকাশে রয়েছে দুই রকমের শক্তিশালী কোনো কিছু। অমঙ্গলের শক্তি, যা চায় অগ্নিশিখা আমাদেরকে গ্রাস করুক। মঙ্গলের শক্তি, যা অগ্নিশিখাকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য ধরে রাখে চামড়াটিকে। আমাদেরকে অবশ্যই এমন একটি উপায় বের করতে হবে যাতে করে মঙ্গলের শক্তির প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানো যায়।

আমি জানি না, নক্ষত্রগুলো আকাশের ক্যাম্প ফায়ার নাকি এরা আকাশের সেই সব ছিদ্র যেগুলোর ভিতর দিয়ে শক্তির অগ্নিশিখা তাকায় আমাদের দিকে। কখনো আমি ভাবি একরকম। কখনো বা অন্যরকম। হঠাৎ কখনো আমি ভাবি, এগুলো কোনো ক্যাম্প ফায়ার বা ছিদ্র নয় অন্য কিছু, যা আমার পক্ষে উপলব্ধি করা খুব কঠিন।

আপনার ঘাড়কে স্থাপন করুন একটি কাঠের গুঁড়ির উপর। আপনার মাথা থাকবে পেছনে। তখন আপনি কেবল আকাশটিকেই দেখতে পারেন। পাহাড়, বৃক্ষ, শিকারিদল বা ক্যাম্প ফায়ার—কোনো কিছুকেই নয়। কেবলই আকাশ। কখনো কখনো আমার মনে হয় যেন পড়ে যাব আকাশের মাঝে। যদি নক্ষত্রগুলো হয় ক্যাম্প ফায়ার, তবে আমি অন্য শিকারিদলকে দেখতে চাইব,—যারা বিক্ষিপ্তভাবে ঘুরে বেড়ায়। তখন আমার পড়ে যেতে আপত্তি থাকবে না। কিন্তু নক্ষত্রগুলো যদি হয় চামড়ার মাঝে ছিদ্রের মতো কোনো কিছু, তখন আমি ভয় পাব। আমি কোনো ছিদ্রের মধ্য দিয়ে শক্তির অগ্নিশিখার মাঝে পড়তে চাই না।

আমি চাই, আমি যেন সত্যকেই জানি। আমি অজ্ঞতাকে পছন্দ করি না।

আমি মনে করি না যে, কোনো শিকারিদল বা দলবদ্ধ অন্যকোনো মানুষের মধ্যে খুব বেশি জনের নক্ষত্র নিয়ে এরূপ ধারণা ছিল। হয়ত, অনেক কালের মাঝে গুটি কয়েকজন এরূপ চিন্তা করত, কিন্তু এই সবগুলো চিন্তা একজনের মাঝে বিরাজ করত না। তথাপি, এরূপ গোত্রগুলোর মাঝে অভিজাত ধারণা যথেষ্টই প্রচলিত ছিল। উদাহরণ স্বরূপ, বাত্সোয়ানার কালাহারি মরুভূমির কুং বুশমেনের মিল্কি ওয়ে সম্বন্ধে একটি ব্যাখ্যা ছিল, যা তাদের অক্ষাংশে প্রায়ই আকাশে দৃশ্যমান ছিল। তারা একে বলত 'রাত্রির শিরদাঁড়া', যেন আকাশ ছিল এক বিশাল জন্তু, যার অভ্যন্তরে আমরা বসবাস করি। তাদের ব্যাখ্যা মিল্কি ওয়েকে উপযোগী এবং

বোধগম্য করে তোলে। কুং গণ বিশ্বাস করত যে, মিল্কি ওয়ে ধারণ করে রাত্রিকে ; আর তা যদি মিল্কি ওয়ের কারণে না হয়ে থাকত, তবে অন্ধকারের টুকরোগুলো ভেঙে পড়ত আমাদের পদ প্রান্তে। এটি একটি চমৎকার ধারণা।

অপার্থিব ক্যাম্প ফায়ার বা গ্যালাক্সির শিরদাঁড়া সংক্রান্ত রূপকগুলো বেশির ভাগ মানবীয় সংস্কৃতিতে শেষপর্যন্ত প্রতিস্থাপিত হল অন্য একটি ধারণা দ্বারা : আকাশের শক্তিমান সৃষ্টিগুলো উন্নীত হল দেবতায়। তারা যে সকল মহাজাগতিক কাজ সম্পন্ন করবে বলে আশা করা হয়েছিল, সে অনুযায়ী তাদের নাম, সম্পর্ক, এবং বিশেষ দায়িত্ব নির্ধারিত হল। প্রতিটি মানবীয় বিষয়ের জন্য ছিলেন একজন করে দেবতা। দেবতারাই পরিচালনা করতেন প্রকৃতিকে। তাদের সরাসরি হস্তক্ষেপ ছাড়া কিছুই ঘটতে পারত না। যদি তারা খুশি হতেন ; তবে পাওয়া যেত প্রচুর খাদ্য শস্য, এবং মানবকুল হত সুখী। কিন্তু কোনো কিছু যদি দেবতাদেরকে অসন্তুষ্ট করত,—এবং কখনো যদি এর সামান্যই ঘটত—তবে এর পরিণতি হত ভয়াবহ : খরা, ঝড়, যুদ্ধ, ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরি, মহামারি। দেবতাদেরকে রাখতে হত প্রসন্ন, এবং পুরোহিত ও ভবিষ্যৎদ্রষ্টাদের এক বিশাল দল জেগে উঠল দেবতাদের ক্রোধকে প্রশমিত করার জন্য। কিন্তু দেবতাগণ খেয়ালি ছিলেন বলে, আপনি নিশ্চিত হতে পারতেন না যে, তারা কী করবেন। প্রকৃতি ছিল এক রহস্য। পৃথিবীকে অনুধাবন করা ছিল কঠিন।

ইজিয়ান দ্বীপপুঞ্জের স্যামোসে অবস্থিত হেরায়নের কিছু অবশেষ এখনো রয়ে গেছে, যা প্রাচীন পৃথিবীর অন্যতম আশ্চর্য, হেরাকে উৎসর্গীকৃত এক বিশাল মন্দির, যিনি তার কাজ শুরু করেছিলেন আকাশের দেবীরূপে। তিনি ছিলেন স্যামোসের পৃষ্ঠপোষক দৈবচরিত্র, সেই একই দায়িত্বে নিয়োজিত যেমনটি অ্যাথেনা করেছিলেন এথেন্সে। আরো অনেক পরে তিনি বিয়ে করেন জিউসকে, যিনি ছিলেন অলিম্পীয় দেবতাদের মধ্যে প্রধান। পুরনো কাহিনীগুলো থেকে আমরা জানতে পারি যে, তারা মধুচন্দ্রিমা করেন স্যামোসে। গ্রিক ধর্ম ব্যাখ্যা করল যে, রাতের আকাশে বিকীর্ণ আলোর ব্যান্ড হল হেরার দুগ্ধ, যা স্বর্গের ওপারে তার স্তন থেকে নির্গত হত, একটি প্রবাদ যা পাশ্চাত্যের অধিবাসিগণ কর্তৃক এখনো ব্যবহৃত হয় এমন একটি বাগ্‌ধারার উৎস—মিল্কি ওয়ে। হয়ত এটি মূলত উপস্থাপন করত এক গুরুত্বপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টিকে যে, আকাশ প্রতিপালন করে পৃথিবীকে ; যদি তা-ই হয়ে থাকে, তবে মনে হয় সেই অর্থ বিস্মৃত হয়েছে অনেক সহস্র বছর পূর্বে।

আমরা, আমাদের প্রায় সকলেই, সেই সব জনগোষ্ঠী হতে এসেছি যারা অননুমেয় এবং উগ্রমেজাজি দেবতাদের নিয়ে বিভিন্ন কাহিনী আবিষ্কার করার মাধ্যমে সাড়া দিয়েছিল অস্তিত্বের বিপদসমূহের প্রতি। কোনো কিছু উপলব্ধি করার প্রতি মানবিক তাড়না দীর্ঘকাল ধরে প্রতিহত হল সহজ ধর্মীয় ব্যাখ্যা দ্বারা, যেমনটি ঘটেছিল প্রাচীন গ্রিসে হোমারের কালে, যেখানে ছিল আকাশ, মর্ত, বজ্রঝড়,

banglainternet.com

মহাসাগর, পাতালপুরী অগ্নি, সময়, প্রেম এবং যুদ্ধের দেবতাবৃন্দ ; যেখানে প্রতিটি বৃক্ষ এবং তৃণভূমির ছিল এর নিজস্ব ড্রায়াড এবং মেইনাড।

হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ নিপীড়িত হচ্ছে—আমাদের কেউ কেউ এখনো যেমনটি হচ্ছে—এই মতামতটি দ্বারা যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হল এক পুতুল নাচের পুতুল, যার সুতা টানছেন অদৃশ্য এবং দুর্জ্ঞেয় এক ঈশ্বর বা দেবতাবৃন্দ। তখন, ২৫০০ বছর পূর্বে, আয়োনিয়াতে সম্পন্ন হল এক গৌরবময় জাগরণ : স্যামোস এবং নিকটস্থ ব্যস্ত পূর্ব ইজিয়ান সমুদ্রের* দ্বীপ এবং খাঁড়িসমূহে বিকশিত গ্রিক কলোনিগুলোতে। হঠাৎ পাওয়া গেল এমন সব মানুষ যারা বিশ্বাস করত যে, সবকিছুই পরমাণু দ্বারা সৃষ্ট ; অর্থাৎ মানব জাতি এবং অন্যান্য পশু পাখি জন্ম লাভ করেছে সরলতর কোনো রূপ থেকে ; রোগের কারণ নয় কোনো অশুভ শক্তি বা দেবতা ; পৃথিবী শুধু এক গ্রহ যা আবর্তিত হয় সূর্যের দিকে। এবং নক্ষত্রগুলোর অবস্থান অতি দূরে।

এই বিপ্লবটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে মুক্ত করল ক্যাওসের হাত থেকে। প্রাচীন গ্রিকগণ বিশ্বাস করত যে, প্রথম সৃষ্টি হল ক্যাওস, যার সাদৃশ্য পাওয়া যায় 'জেনেসিস'-এর 'নিরাকার' নামক একই প্রসঙ্গের সাথে। সৃষ্টি হল ক্যাওস এবং সে মিলিত হল নিশাদেবীর সাথে, এবং তাদের সন্তানদের মাধ্যমে এল সকল দেবতা এবং মানুষ।। ক্যাওস থেকে সৃষ্ট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ধারণাটি যথার্থভাবেই সাদৃশ্য বহন করে গ্রিকদের সেই বিশ্বাসের সাথে যে, এক অননুমেয় প্রকৃতি পরিচালিত হয় খেয়ালি দেবতাগণ দ্বারা। কিন্তু খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে আয়োনিয়াতে বিকাশ লাভ করল এক নতুন ধারণা, মানব জাতির জন্য এক অন্যতম বিস্ময়কর ধারণা। প্রাচীন আয়োনিয়রা মতামত দিল যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে জানা সম্ভব, কারণ এটি এক অন্তঃস্থ শৃঙ্খলা প্রদর্শন করে : প্রকৃতিতে রয়েছে নিয়মানুবর্তিতা, যার মাধ্যমে এর রহস্যগুলোকে উন্মোচিত করা সম্ভব। প্রকৃতি পুরোপুরি অননুমেয় নয় ; সে অবশ্যই কিছু নিয়ম মেনে চলতে বাধ্য। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এই সুশৃঙ্খল এবং প্রশংসার্হ চরিত্রটিকেই বলা হল 'কসমস'।

কিন্তু কেন আয়োনিয়া, কেন এই সাধারণ এবং গ্রাম্য ভূ-প্রকৃতিতে, পূর্ব ভূমধ্য সাগরীয় এই সুদূর দ্বীপ ও খাঁড়িসমূহে ?

ভারত বা মিশর, ব্যাবিলনিয়া, চীন বা মেসোমেরিকার বিখ্যাত নগরীগুলোতে কেন নয় ? চীনের ছিল অনেক সহস্র বছরের পুরনো এক জ্যোতির্তাত্ত্বিক ঐতিহ্য ; এটি উদ্ভাবন করেছিল কাগজ, মুদ্রণশিল্প, রকেট, ঘড়ি, সিল্ক, পোর্সেলিন, এবং সমুদ্র-গামী নৌযানসমূহ। কিছু ইতিহাসবেত্তা বলেন যে, এতদ্‌সত্ত্বেও এটি ছিল খুবই প্রথা-পরায়ণ এক জাতি, নতুন কিছুর প্রবর্তনে যারা ছিল খুবই অনিচ্ছুক। কেন নয় ভারত, যাদের রয়েছে এক অতি সমৃদ্ধ, গাণিতিকভাবে উর্বর এক সংস্কৃতি ?

* সন্দেহের মাত্রা আরো বেড়ে যায় এজন্যে যে, আয়োনিয়া আয়োনীয় সমুদ্র অবস্থিত নয় ; এটির নামকরণ করে আয়োনীয় সমুদ্র-উপকূলে উপনিবেশ স্থাপনকারীরা।

কারণ, কিছু কিছু ইতিহাস বেত্তার মতামত ছিল এই যে, জন্ম-মৃত্যু আর আত্মা ও জগৎসমূহ অনন্ত চক্রে আবদ্ধ এবং অসীম কাল ধরে বর্তমান এক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতি এর এতই অপরিবর্তনীয় আগ্রহ ছিল যে, সেখানে একেবারেই নতুন কিছুর আবির্ভাব ঘটা সম্ভব ছিল না। কেন নয় মায়া এবং অ্যাজটেক সমাজসমূহ, যারা জ্যোতির্বিদ্যায় ছিল সিদ্ধহস্ত, এবং ভারতীয়দের মতো আচ্ছন্ন ছিল বিশাল সংখ্যা নিয়ে ? কারণ, কিছু ঐতিহাসিক ঘোষণা করেন যে, যান্ত্রিক আবিষ্কারের প্রতি তাদের আগ্রহ এবং প্রণোদনার ঘাটতি ছিল। মায়া এবং অ্যাজটেক সভ্যতার মানুষেরা—ছেলেমেয়েদের খেলনা ব্যতীত, এমনকি চাকাও উদ্ভাবন করেনি।

আয়োনীয়দের কিছু সুবিধা ছিল। আয়োনিয়া ছিল এক দ্বীপ-রাজ্য। এমনকি অসম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতাও সৃষ্টি করে বৈচিত্র্য। অনেকগুলো ভিন্ন ভিন্ন দ্বীপের কারণে, ছিল বিচিত্র রাজনৈতিক ব্যবস্থা। কোনো একক কেন্দ্রীয় শক্তি সবগুলো দ্বীপে আরোপ করতে পারত না কোনো সামাজিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক প্রথা। সম্ভব হয়ে উঠেছিল মুক্ত অনুসন্ধান। কুসংস্কারের কোনো রাজনৈতিক প্রয়োজন ছিল না। অন্যান্য সংস্কৃতির সাথে বিসদৃশভাবে, আয়োনীয়রা ছিল সভ্যতাগুলোর মিলন-মেলায়, কিন্তু এককেন্দ্রিকভাবে নয়। ফিনিশীয় বর্ণমালা আয়োনিয়াতেই প্রথম অভিযোজিত হল গ্রিকদের ব্যবহারিক প্রয়োজনে এবং সম্ভব হয়ে উঠল ব্যাপক ভিত্তিক সাক্ষরতা। লিখন হয়ে থাকল না পুরোহিত এবং অনুলেখকদের কোনো একচ্ছত্র বিষয়। অনেকের চিন্তাই হয়ে উঠল বিবেচনা এবং বিতর্কের অঙ্গীভূত। রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল বণিকদের হস্তগত, যারা সক্রিয়ভাবে উৎসাহিত করল প্রযুক্তিকে, যার উপর তাদের উন্নতি নির্ভর করত। পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় এই অঞ্চলটিতেই মিশর ও মেসোপোটেমিয়ার অভিজাত সংস্কৃতি এবং আফ্রিকান, এশীয় ও ইয়োরোপীয় সভ্যতাসমূহের মিলন ঘটল ; কুসংস্কার, ভাষা, ধারণা এবং দেবতাদের নিয়ে প্রবল ও মুখোমুখি সংঘাতের মাধ্যমে ঘটল সংকরীভবন। একই বিষয়ের শ্রেষ্ঠত্ব দাবিকারী একাধিক দেবতার মুখোমুখি হলে আপনি কী করবেন ? ব্যাবিলনীয় মারদুক এবং গ্রিক জিউসের প্রত্যেককেই বিবেচনা করা হত নভোমণ্ডলের প্রভু এবং দেবতাকুলশ্রেষ্ঠ। আপনি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন যে, মারদুক এবং জিউস একই ছিলেন। যেহেতু তাদের বৈশিষ্ট্য ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের, তাই আপনি ভাবতে পারেন যে, এদের একজন স্রেফ পুরোহিতগণের সৃষ্টি। কিন্তু একজন যদি হয়ে থাকে, কেন উভয়ই নয় ?

তাই, সূত্রপাত ঘটল এক অসাধারণ ধারণার, এমন এক উপলব্ধির যে, দেবতা-প্রকল্প ছাড়াই বিশ্বকে জানার কোনো উপায় থাকতে পারে ; অর্থাৎ থাকতে পারে নীতিমালা, বল, প্রকৃতির সূত্রাবলি, যেগুলোর মাধ্যমে বিশ্বকে অনুধাবন করা যেত এই গুণাবলিতে বিশ্বাস না করেই যে, সব কিছুই জিউসের উদ্ভাবন।

আমি মনে করি, যদি আর কিছুটা সময় পেত, তবে চীন, ভারত ও মেসোমেরিকাও বিজ্ঞানকে উপলব্ধি করতে পারত। বিভিন্ন সংস্কৃতির উদ্ভব ঘটে না

banglainternet.com

নিয়মিত ঘটনা প্রবাহের মতো এবং এরা বিকশিত হয় না সুষম ধাপ মেনে। এদের উদ্ভব ঘটে বিভিন্ন সময়ে এবং বিকাশ ঘটে বিভিন্ন হারে। বৈজ্ঞানিক বিশ্ব-বীক্ষা এতটা কার্যকরি, এতটা ব্যাখ্যা-জাত এবং সংশ্লিষ্ট কালে আমাদের মস্তিষ্কের সবচাইতে অগ্রসর অংশগুলোর সাথে এতটা ঐকতানিকভাবে অনুরণিত হয় যে, আমি মনে করি, প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর প্রতিটি সংস্কৃতিই তার নিজস্ব পদ্ধতিতে আবিষ্কার করতে পারত বিজ্ঞানকে। কোনো একটি সংস্কৃতিকে প্রথম হতেই হত। আয়োনিয়াতে উদ্ভব ঘটল বিজ্ঞানের।

মানুষের চিন্তাজগতে এই বিপ্লবটির সূত্রপাত ঘটল খ্রিষ্টপূর্ব ৬০০ থেকে ৪০০ সালের মাঝে। এই বিপ্লবের চাবিটি ছিল হাত। আয়োনীয় চিন্তাবিদদের কেউ কেউ ছিলেন নাবিক, কৃষক এবং তাঁতি। তারা অভ্যস্ত ছিলেন প্রণোদনায়, অন্যান্য জাতির পুরোহিত এবং অনুলেখকদের মতো নয়, যারা বাস করতেন বিলাসিতায় এবং অনিচ্ছুক ছিলেন নিজেদের হাতকে নোংরা করতে। তারা প্রত্যাখ্যান করলেন কুসংস্কারকে, এবং তারা কাজ করলেন বিস্ময়কর রকমের। কী ঘটেছিল, তার উপর আমরা অনেক ক্ষেত্রেই পেয়ে থাকি আংশিক বা পরিবর্তিত বর্ণনা। তখন যে সকল রূপক ব্যবহার করা হত, সেগুলো আজ আমাদের কাছে হয়ত অস্পষ্ট। এই নতুন অন্তর্দৃষ্টিকে অবদমিত করার জন্য কয়েক শতাব্দী পরে প্রায় নিশ্চিতভাবে প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল। এই বিপ্লবে অগ্রগণ্য চরিত্র ছিলেন গ্রিসের কিছু মানুষ, যারা আজ আমাদের কাছে প্রায় অপরিচিত, কিন্তু আমাদের সভ্যতা এবং আমাদের মানবিকতার বিকাশে যারা ছিলেন পথিকৃৎ।

প্রথম আয়োনীয় বিজ্ঞানী ছিলেন মিলিটাসের নাগরিক থেলেস, যা ছিল স্যামোস দ্বীপের এক জল-প্রণালির অপর পাড়ে এশিয়ার এক নগরী। তিনি ভ্রমণ করেন মিশরে এবং ব্যাবিলনের জ্ঞানের সাথে পরিচিত হন। এটি বলা হয়ে থাকে যে, তিনি সূর্য-গ্রহণ সম্বন্ধে ধারণা করতে পেরেছিলেন। তিনি শিখেছিলেন কীভাবে একটি পিরামিডের ছায়ার দৈর্ঘ্য থেকে এর উচ্চতা এবং দিগন্তের উপর সূর্যের উৎপন্ন কোনো পরিমাপ করা যায়, এমন এক পদ্ধতি যা আজ প্রয়োগ করা হয় চাঁদের পাহাড়গুলোর উচ্চতা নির্ণয় করার ক্ষেত্রে। তিন শতাব্দী পর ইউক্লিড যে ধরনের জ্যামিতিক উপপাদ্য উল্লেখ করেন তা প্রথম প্রমাণ করেন থেলেস—উদাহরণ স্বরূপ, এই স্বীকার্যটি যে, কোনো সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের ভূমিস্থ কোণগুলো পরস্পর সমান। বুদ্ধিবৃত্তিক প্রচেষ্টার এক সুস্পষ্ট নিরবচ্ছিন্নতা রয়েছে থেলেস থেকে ইউক্লিডে, ইউক্লিড থেকে ১৬৬৩ সালে স্টুরব্রিজ মেলায় আইজাক নিউটনের 'Elements of Geometry' ক্রয়ের মধ্যে, এমন এক ঘটনা যা অতি দ্রুত বয়ে আনল আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি।

থেলেস জগৎকে অনুধাবনের চেষ্টা করলেন দেবতাদের হস্তক্ষেপের প্রভাব ব্যতীত। ব্যাবিলনীয়দের মতো তিনি বিশ্বাস করতেন যে, জগৎ একদা ছিল কেবলই

জলভূমি। স্থলভূমির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে, ব্যাবিলনীয়রা যোগ করল যে পানির উপরিপৃষ্ঠে মারদুক স্থাপন করলেন একটি মাদুর এবং এর উপর দিলেন ধুলো-বালি।" থেলেস একই দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ করলেন, কিন্তু, বেঞ্জামিন ফ্যারিংটনের মতে, 'মারদুককে বাদ দিয়ে।' হ্যাঁ, একদা সব কিছুই ছিল পানি, কিন্তু এক প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় মহাসমুদ্র থেকে সৃষ্টি হল পৃথিবী—তিনি ভাবলেন, নীল নদের ব-দ্বীপে স্রোতবাহিত কাদামাটি দ্বারা যেমনটি ঘটেছিল তেমনি। প্রকৃতপক্ষে, তিনি ভেবেছিলেন যে, সকল বস্তুর অন্তর্নিহিত সাধারণ মূলনীতি ছিল পানি, যেমনটি আজকের দিনে আমরা বলে থাকি ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন বা কোয়ার্ক হল সকল বস্তুর সাধারণ উপাদান। থেলেসের উপসংহার সঠিক ছিল কি না তা তার দৃষ্টিভঙ্গির মতো গুরুত্বপূর্ণ ছিল না : জগৎ সৃষ্টি হয়নি দেবতাগণ কর্তৃক, এটি ছিল প্রকৃতিতে আন্তঃক্রিয়াশীল বস্তুগত বলসমূহের ফলাফল। থেলেস ব্যাবিলন এবং মিশর থেকে নিয়ে এলেন জ্যোতির্বিদ্যা ও জ্যামিতির নতুন বিজ্ঞানের বীজ, সেই বিজ্ঞান যা অংকুরিত ও বিকশিত হতে পারত আয়োনিয়ার মতো উর্বর ভূমিতে।

থেলেসের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে খুব সামান্যই জানা যায়, কিন্তু একটি স্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায় এরিস্টটলের 'পলিটিক্স'-এ :

> [থেলেস] অপমানিত হয়েছিলেন তার দারিদ্র্যের কারণে, যা হয়ত দেখিয়েছিল যে, দর্শনের কোনো ব্যবহারিক প্রয়োগ নেই। এই কাহিনী মতে, তিনি তার দক্ষতার মাধ্যমে [নভোমণ্ডলকে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে] যখন কেবল শীতকাল তখনই জানতে পেরেছিলেন যে আগামী বছর জলপাইয়ের ব্যাপক ফলন ফলবে ; তাই অল্প টাকা থাকায় তিনি কিওস এবং মিলেটাসের জলপাই-কলগুলো ব্যবহার করার জন্য সঞ্চয় করতে থাকলেন, অন্য কেউ পাওয়ার পূর্বেই কম মূল্যে তিনি এগুলো ভাড়া নিয়ে নিলেন। যখন ফসল কাটার সময় হল, হঠাৎ এদের চাহিদা বেড়ে গেল, তিনি তার ইচ্ছা মতো মূল্যে এগুলো ব্যবহার করলেন এবং যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করলেন। এভাবে তিনি বিশ্বকে দেখালেন যে, ইচ্ছে করলেই দার্শনিকগণ ধনী হতে পারেন, কিন্তু তাদের আকাঙ্ক্ষা ভিন্ন ধরনের।

---

* এমন কিছু প্রমাণ আছে যে, পূর্ববর্তী আদি সুমেরীয় সৃষ্টি-পুরাসমূহ মূলত ছিল প্রকৃতিভাত্ত্বিক, পরবর্তীতে যেগুলো সংকলিত হল খ্রিষ্টপূর্ব ১০০০ সালের দিকে "Enuma elish" ('যখন উঁচুতে', কবিতাটির প্রথম শব্দমালা)-এ ; কিন্তু তখন থেকে প্রকৃতি প্রতিস্থাপিত হল দেবতাগণ দ্বারা, এবং পুরাণ উপস্থাপন করল ধর্মতত্ত্ব, পৃথিবীর কোনো সৃষ্টিতত্ত্ব নয়।
"Enuma elish" হল জাপানি এবং আইনু পুরাণের ইঙ্গিতবহ, যেখানে মূলত এক কর্দমাক্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একটি পাখির ডানার আঘাতে পিষ্ট হয় এবং পানি থেকে পৃথক হয়ে যায় ভূমি। একটি ফিজিয় সৃষ্টি পুরাণ বর্ণনা করে যে, 'রকুমাউতু সৃষ্টি করেন ভূমি। তিনি তার বিশাল মুঠোতে করে সমুদ্রের তলদেশ থেকে উপরে তুলে আনেন এবং বিভিন্ন স্থানে একে স্তূপের আকারে স্তূপীকৃত করেন। এই হল ফিজি দ্বীপপুঞ্জ।' দ্বীপবাসী এবং সমুদ্রগামী মানুষদের জন্য পানি থেকে ভূমির বিচ্ছিন্নকরণ একটি অতি স্বাভাবিক ধারণা।

banglainternet.com

একজন প্রাজ্ঞ রাজনীতিবিদ হিসেবেও তিনি বিখ্যাত ছিলেন, সাফল্যের সাথে মিলিসিয়ানদেরকে প্ররোচিত করেন লিডিয়ার রাজা ক্রিসাসের শোষণকে প্রতিহত করার জন্য এবং লিডীয়দের বিরোধিতা করার জন্য আয়োনিয়ার সবগুলো দ্বীপের একটি ফেডারেশন গঠনের প্ররোচনা দিয়ে ব্যর্থ হন।

থেলেসের বন্ধু এবং সহকর্মী গ্রিলিটাসের নাগরিক অ্যানাক্সিম্যান্ডার ছিলেন আমাদের জ্ঞাত অন্যতম প্রথম ব্যক্তি যিনি কোনো পরীক্ষণ সম্পন্ন করেছিলেন। একটি উল্লম্ব লাঠির চলমান ছায়া পরীক্ষা করে তিনি সঠিকভাবে নির্ণয় করেছিলেন বছর এবং ঋতুর দৈর্ঘ্য। যুগের পর যুগ ধরে মানুষ লাঠিকে ব্যবহার করেছে মুগুর এবং বর্শা হিসেবে, অ্যানাক্সিম্যান্ডার একে ব্যবহার করলেন সময় পরিমাপের ক্ষেত্রে। গ্রিসে তিনিই প্রথম তৈরি করলেন একটি সূর্য-ঘড়ি, জ্ঞাত পৃথিবীর একটি মানচিত্র এবং একটি নভোমণ্ডলীয় গ্লোব যা নির্দেশ করল নক্ষত্ররাজির বিন্যাস। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, সূর্য, চাঁদ এবং নক্ষত্রগুলো আকাশের চলমান গর্তগুলোর ভিতর দিয়ে দৃশ্যমান আগুন দ্বারা তৈরি যা সম্ভবত এক প্রাচীনতর ধারণা। তিনি ধারণ করতেন এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিটি যে, পৃথিবী স্বর্গ থেকে ঝুলিয়ে দেয়া বা ঠেস দেয়া কোনো কিছু নয়, এটি নিজেই নিজেকে ধরে রাখে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রে ; কারণ এটি 'নভোমণ্ডলীয় গোলক'-এর উপরস্থ সকল স্থান হতে সমদূরবর্তী, এমন কোনো বল নেই যা একে স্থানান্তরিত করতে পারে।

তিনি মতামত দেন যে আমরা জন্মের সময় এতটা অসহায় থাকি যে, প্রথম মানবশিশুগুলো যদি তাদের নিজ দায়িত্বে পৃথিবীতে থাকত তবে তারা তৎক্ষণাৎ মৃত্যু বরণ করত। এটি থেকে অ্যানাক্সিম্যান্ডার সিদ্ধান্ত নিলেন যে, মানব জাতির উদ্ভব ঘটেছিল অন্যান্য প্রাণী থেকে অধিকতর আত্মনির্ভর নব জাতকদের সাথে : তিনি প্রস্তাব করলেন কাদায় প্রাণের তাৎক্ষণিক উদ্ভবের কথা, প্রথম প্রাণী হল মেরুদণ্ডে আচ্ছাদিত মাছ। বংশবৃদ্ধির পরম্পরায় এদের কিছু নতুন প্রজন্ম ত্যাগ করল পানি এবং চলে এল ডাঙায়, যেখানে তারা একটি হতে অন্যটিতে আন্তঃপরিবৃত্তির মাধ্যমে বিবর্তিত হল অন্য প্রাণীতে। তিনি বিশ্বাস করতেন অসংখ্য জগতে, যাদের সবগুলোই ছিল বসতিময় এবং সেসব প্রাণীর সকলেই মুখোমুখি হত বিলুপ্তি এবং পুনরুৎপাদনের। সেইন্ট অগাস্টিন, অতি অনুতপ্তভাবে যোগ করে যেমন বলেন, 'তিনি থেলেসের চাইতে সামান্য বেশিও করলেন না, এই সব অন্তহীন কাজের কারণকে স্বর্গীয় মনের সাথে সংস্রবহীন রাখলেন।'

৫৪০ খ্রিষ্টপূর্ব বা এর কাছাকাছি সময়ে, স্যামোস দ্বীপে ক্ষমতায় এলেন পলিক্রেটিস নামক এক স্বৈরশাসক। তিনি সম্ভবত শুরু করেছিলেন একজন রেস্তোরাঁ মালিক হিসেবে এবং অতঃপর জড়িয়ে পড়েন আন্তর্জাতিক জলদস্যুবৃত্তিতে। পলিক্রেটিস ছিলেন শিল্পকলা, বিজ্ঞান এবং প্রকৌশলের একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক। কিন্তু তিনি তার নিজ জনগণের উপর অত্যাচার চালাতেন ; তিনি তার প্রতিবেশীদের

উপর চাপিয়ে দিতেন যুদ্ধ ; স্বাভাবিকভাবেই তিনি ভয় পেতেন বহিরাক্রমণকে। তাই তিনি তার রাজধানীকে ঘিরে ফেললেন এক বিশাল দেয়াল দ্বারা, দৈর্ঘ্যে প্রায় ছয় কিলোমিটার, যার অবশেষটুকু আজও রয়ে গেছে। দূরবর্তী এক ঝরনা থেকে দুর্গগুলোর ভিতর দিয়ে পানি নেয়ার জন্য তিনি একটি বিশাল সুড়ঙ্গ তৈরি করতে আদেশ করলেন। এটি এক কিলোমিটার লম্বা এবং ভেদ করেছে একটি পর্বতকে। প্রতি প্রান্ত হতে একটি করে নালা কাটা হল এবং এগুলো মিলিত হল ঠিক মাঝখানে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হতে সময় লাগাল প্রায় পনেরো বছর, যা আজকের দিনের পুর কৌশলের জন্য এক উইলস্বরূপ, এবং আয়োনীয়দের অসাধারণ ব্যবহারিক সামর্থ্যের এক নির্দেশন। কিন্তু এই উদ্যোগের অপর একটি এবং অপেক্ষাকৃত অশুভ একটি বিষয়ও রয়েছে—এটি অংশত তৈরি হয়েছিল শৃঙ্খলিত ক্রীতদাসদের দ্বারা, যাদের বেশিরভাগকে ধরে আনা হয়েছিল পলিক্রেটিসের জলদস্যু জাহাজগুলো দ্বারা।

এটি ছিল থিওডোরাসের কাল, সে সময়ের শ্রেষ্ঠ প্রকৌশলী, গ্রিকদের মাঝে যাকে চাবি, রুলার, কাঠমিস্ত্রিদের স্কয়ার, লেভেল, লেদ, ব্রোঞ্জ কাস্টিং এবং কেন্দ্রীয় তাপায়নের উদ্ভাবকের কৃতিত্ব দেয়া হয়। এই মানুষটির নামে কেন নেই কোনো স্মৃতিসৌধ ? যারা প্রকৃতির সূত্রগুলো নিয়ে স্বপ্ন দেখতেন এবং অনুমান করতেন, কথা বলতেন প্রযুক্তিবিদ এবং প্রকৌশলীদের সাথে। তারা প্রায়ই হন একই মানুষ। তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক—সব কিছু একই ছিল।

প্রায় একই সময়ে, নিকটবর্তী দ্বীপ কস-এ, হিপোক্রেটিস প্রতিষ্ঠা করছিলেন চিকিৎসাবিদ্যা সংক্রান্ত তার বিখ্যাত ঐতিহ্যসমূহকে, হিপোক্রেটিক প্রতিজ্ঞার কারণে এখন যাকে সামান্যই মনে রাখা হয়। এটি ছিল এক ব্যবহারিক এবং কার্যকরি চিকিৎসা-স্কুল, হিপোক্রেটিস চেয়েছিলেন যার ভিত্তি হবে সমসাময়িক পদার্থবিদ্যা এবং রসায়নের* সমতুল্য। কিন্তু এর তাত্ত্বিক দিকটিও ছিল। হিপোক্রেটিস তার 'বিষয়—প্রাচীন চিকিৎসা বিদ্যা' গ্রন্থে বললেন : 'মানুষ মৃগী রোগকে মনে করত স্বর্গীয়, স্রেফ এই কারণে যে তারা একে উপলব্ধি করতে পারে না। কিন্তু যা কিছু বোধগম্য নয় তার সব কিছুকেই তারা যদি স্বর্গীয় বলত, তবে কেন স্বর্গীয় বস্তুসমূহের কোনো শেষ থাকবে না।'

যথাসময়ে আয়োনীয় প্রভাব এবং পরীক্ষণ-পদ্ধতি ছড়িয়ে পড়ল গ্রিসের মূল ভূখণ্ডে, ইটালিতে, সিসিলিতে। একদা এমন একটি সময় ছিল যখন খুব কম লোকই বায়ুতে বিশ্বাস করত। তারা অবশ্যই শ্বাস-প্রশ্বাস সম্বন্ধে জানত, এবং তারা বায়ুকে ভাবত দেবতাদের শ্বাস-প্রশ্বাস রূপে। কিন্তু একটি স্থির, বস্তুগত কিন্তু অদৃশ্য পদার্থ

* এবং জ্যোতিষতত্ত্ব তখন একটি বিজ্ঞান হিসেবে ব্যাপকভাবে গৃহীত ছিল। একটি উদ্ধৃতিতে হিপোক্রেটিস লিখলেন, 'প্রত্যেককে অবশ্যই নক্ষত্রগুলোর আবির্ভাব সম্বন্ধে সাবধান থাকতে হবে, বিশেষত ভগ্ন তারা (সাইরিয়াস), আর্কটারাস, এবং প্লিয়াডিসের তিরোধান সম্বন্ধে।'

banglainternet.com

হিসেবে বায়ুর ধারণাটি ছিল অকল্পনীয়। বায়ু সংক্রান্ত প্রথম নথিকৃত পরীক্ষণটি সম্পন্ন হয়েছিল এম্পিডোকিল্‌স নামক একজন চিকিৎসক* কর্তৃক, যার নাম ছড়িয়ে পড়েছিল খ্রিষ্টপূর্ব ৪৫০ সালের দিকে। কিছু বর্ণনা দাবি করে যে, তিনি নিজেকে দেবতারূপে উপস্থাপন করেছিলেন। কিন্তু হয়ত শুধুমাত্র তার চাতুর্যের কারণেই লোকে তাকে দেবতা ভেবেছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, আলো অতি দ্রুত গতিশীল, কিন্তু অসীমভাবে দ্রুত নয়। তিনি ভেবেছিলেন যে, একদা পৃথিবীতে ছিল বিচিত্র রকমের প্রাণী, কিন্তু সেই সকল প্রজাতির অনেকগুলো 'অবশ্যই তাদের প্রকরণ উৎপাদনে ও তা অব্যাহত রাখতে ব্যর্থ হয়। তাই যে সকল প্রজাতি টিকে থাকল তাদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রে, অস্তিত্বের প্রথম থেকেই একে রক্ষা করল কৌশল, সাহস বা গতি।' পরিবেশের সাথে বিভিন্ন প্রাণীসত্তার অসাধারণ অভিযোজন ক্ষমতা ব্যাখ্যা করার এই প্রচেষ্টায়, অ্যানাক্সিম্যান্ডার ও ডেমোক্রিটাসের মতো এম্পিডোকিল্‌স পরিষ্কারভাবে পূর্বানুমান করতে পেরেছিলেন প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বিবর্তন সম্পর্কিত ডারউইনের মহতী ধারণাটিকে।

এম্পিডোকিল্‌স তার পরীক্ষণটি সম্পন্ন করেছিলেন তথাকথিত 'ক্লেপসাইড্রা' বা 'পানি চোর', নামক বহু শতাব্দী ধরে মানুষ কর্তৃক ব্যবহৃত এক গৃহস্থালি পদ্ধতিতে, যা প্রয়োগ করা হত রান্না ঘরের হাতা হিসেবে। উপরে খোলা সরু অংশ এবং নিচে সূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত একটি পিতলের গোলককে পানিতে ডুবিয়ে পূর্ণ করা হল। উপরের সরু অংশটিকে অনাচ্ছাদিত রেখে আপনি একে টেনে তুলে আনেন, তবে এক ক্ষুদ্র ঝরনা সৃষ্টি করে পানি পড়ে যাবে ছিদ্রগুলো দিয়ে। কিন্তু হাতের তালু দ্বারা উপরের সরু অংশটিকে ঢেকে যদি আপনি যথাযথভাবে টেনে তোলেন এটিকে, তবে আপনি আপনার হাতের তালু সরানোর পূর্ব পর্যন্ত গোলকটিতে পানি থেকে যাবে। উপরের সরু অংশটিকে আচ্ছাদিত করে যদি আপনি একে পূর্ণ করতে চেষ্টা করেন তবে কিছুই ঘটবে না। পানির গতিপথে অবশ্যই কোনো পদার্থ রয়েছে। আমরা এরূপ পদার্থকে দেখতে পাই না। এটি কী হতে পারে ? এম্পিডোকিল্‌স মতামত দিলেন যে, এটি কেবল বায়ুই হতে পারে। আমরা দেখতে পাই না এমন একটি পদার্থ যা চাপ সৃষ্টি করে, যদি উপরের সরু অংশ থেকে আমি আমার আঙুলগুলো না সরানোর মতো বোকা হই তবে এটি একটি পাত্রকে পানি-পূর্ণ করার জন্য আমার বাসনাকে হতাশ করে তোলে। এম্পিডোকিল্‌স আবিষ্কার করলেন অদৃশ্যকে। তিনি ভাবলেন, বায়ু অবশ্যই এমনি সূক্ষ্মভাবে বিভাজিত এক পদার্থ যে, একে দেখা যায় না।

কথিত আছে যে, এম্পিডোকিল্‌স মোক্ষ লাভের উদ্দেশ্যে ইটনার বিশাল অগ্নিগিরির শীর্ষ ক্যালডেরার উত্তপ্ত লাভাতে লাফিয়ে পড়ে মৃত্যু বরণ করেন। কিন্তু

* পরীক্ষণটি সম্পন্ন হয়েছিল রক্ত-সঞ্চালনের একটি পুরোপুরি ভুল তত্ত্বের সমর্থনে, কিন্তু প্রকৃতিকে গভীরভাবে অনুসন্ধানের জন্য কোনো পরীক্ষণ সম্পন্ন করার ধারণাটি একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবন।

আমি কখনো কখনো কল্পনা করি যে, পরীক্ষণমূলক ভূ-পদার্থ বিজ্ঞানের এক সাহসী এবং পৃথিকৃৎ অভিযানকালে তিনি স্রেফ পা ফসকে পড়ে গিয়েছিলেন।

পরমাণুর অস্তিত্ব সংক্রান্ত এই ইঙ্গিতটি, এই ফুৎকারটি আরো অনেক দূরে এগিয়ে নিলেন ডেমোক্রিটাস, যিনি ছিলেন উত্তর-গ্রিসের আবডেরা নামক আয়োনীয় বসতির বাসিন্দা। আবডেরা ছিল এক ধরনের কৌতুক-শহর। ৪৩০ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দে আপনি যদি আবডেরার কাউকে কোনো গল্প বলতেন তবে তা অবধারিতভাবে হাস্যরসের সৃষ্টি করত। এক অর্থে এটি ছিল সেকালের ব্রুকলিন। ডেমোক্রিটাসের জন্য সারাটা জীবন ছিল উপভোগ এবং অনুধাবনের জন্য ; অনুধাবন এবং উপভোগ ছিল সমার্থক। তিনি বলেছিলেন যে, 'নিরানন্দ জীবন সরাইখানাহীন কোনো দীর্ঘ রাস্তার মতোই।' ডেমোক্রিটাস যদিও এসেছিলেন আবডেরা হতে, কিন্তু তিনি কোনো মেকি চরিত্র ছিলেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, মহাশূন্য হতে বিকীর্ণ পদার্থসমূহ দ্বারা তৎক্ষণাৎ সৃষ্টি হয়েছিল অনেকগুলো জগৎ, অতঃপর বিবর্তিত হল এবং ধ্বংস হল। এমন একটি সময়ে যখন কেউ জানত না অভিঘাত গহ্বর সম্বন্ধে, ডেমোক্রিটাস ভাবতেন যে মাঝে মাঝে সেই জগৎগুলো সংঘর্ষে লিপ্ত হয় ; তিনি বিশ্বাস করতেন যে, কিছু জগৎ বিক্ষিপ্তভাবে বিচরণ করে মহাশূন্যের অন্ধকারের মধ্য দিয়ে, অন্যগুলোর থাকে কিছু সূর্য এবং চন্দ্র, কিছু জগৎ বসতিময়, আর অন্যদের নেই কোনো গাছ-পালা বা পশুপাখি বা এমনকি পানি ; অর্থাৎ প্রাণের সরলতম রূপটি জেগে উঠল এক ধরনের আদিম কাদা হতে। তিনি ভেবেছিলেন যে ধারণা—যেমন আমি মনে করি আমার হাতে রয়েছে একটি কলম, যুক্তিটি—পুরোপুরিভাবে একটি ভৌত এবং যান্ত্রিক প্রক্রিয়া ; অর্থাৎ চিন্তা এবং অনুধাবন হল বস্তুসমূহের গুণ যেগুলো যথেষ্ট সূক্ষ্ম এবং জটিলভাবে উপস্থাপিত হয়, দেবতাদের দ্বারা বস্তুসমূহের মাঝে সঞ্চারিত, আত্মার মাধ্যমে নয়।

ডেমোক্রিটাস আবিষ্কার করেন 'অ্যাটম' শব্দটি, যা 'অবিভাজ্য'-এর গ্রিক রূপ। অ্যাটম অর্থাৎ পরমাণু হল ক্ষুদ্রতম কণা, যাকে আরো বিভাজিত করতে গেলে আমাদের প্রচেষ্টাগুলো চিরকাল ব্যর্থ হয়েছে। তিনি বলেন যে, সবকিছুই হল জটিলভাবে বিন্যস্ত পরমাণুসমূহের সমাবেশ। এমনকি আমরাও। তিনি বললেন, 'পরমাণুগুলো এবং শূন্যতা ব্যতীত কোনো কিছুই অস্তিত্বশীল নয়।'

ডেমোক্রিটাস বললেন যে, যখন আমরা আপেল কাটি তখন ছুরিটি পরমাণুসমূহের মধ্যবর্তী শূন্য স্থানের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে। যদি কোনো শূন্য স্থান না থাকত তবে ছুরিটি অভেদনযোগ্য পরমাণুসমূহের মুখোমুখি হত, এবং আপেলটিকে কাটা যেত না। ধরুন, একটি কোন (cone) হতে একটি ফালি কাটার পর আমরা দুটি টুকরার প্রস্থচ্ছেদগুলোকে তুলনা করলাম। এদের ক্ষেত্রফলগুলো কি সমান হবে ? ডেমোক্রিটাস বললেন, না। কোনের ঢাল ফালিটির একদিকের প্রস্থচ্ছেদকে অন্য দিকের তুলনায় সামান্য কম করে ফেলে। যদি দুটি ক্ষেত্রফল ঠিক ঠিক সমান হত

banglainternet.com

Please Download next part . . . from Banglainternet.com